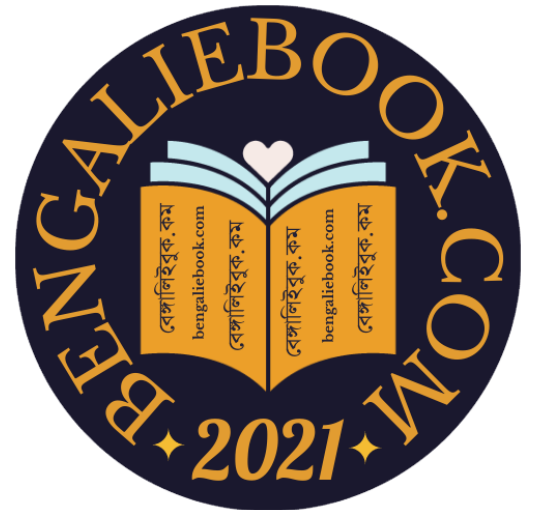


ঔমী বীকশানন্দ্র বীণী ও রূচনা

ঔগনযোগ

ঔমী বীকশানন্দ্র



সূচিপত্র

১. মায়া	3
২. মানুষের যথার্থ স্বরূপ (১)	2 3
৩. মানুষের যথার্থ স্বরূপ (২)	4 4
৪. মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ	6 9
৫. মায়া ও মুক্তি	8 3
৬. ব্রহ্ম ও জগৎ	9 7
৭. জগৎ(১)	1 1 4
৮. জগৎ(২)	1 2 6
৯. অমৃতত্ব	1 4 2
১০. বহুত্বে একত্ব	1 5 5
১১. সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন	1 7 4
১২. অপরোক্ষানুভূতি	1 8 8
১৩. আত্মার মুক্তস্বভাব	2 1 4
১৪. কর্মজীবনে বেদান্ত (প্রথম প্রস্তাব)	2 3 0
১৫. কর্মজীবনে বেদান্ত (দ্বিতীয় প্রস্তাব)	2 4 9

১৬. কর্মজীবনে বেদান্ত (তৃতীয় প্রস্তাব)	2 7 0
১৭. কর্মজীবনে বেদান্ত (চতুর্থ প্রস্তাব)	2 8 4

১. মায়া

মায়া

(লগুনে প্রদত্ত বক্তৃতা)

‘মায়া’ কথাটি আপনারা প্রায় সকলেই শুনিয়েছেন। সাধারণতঃ কল্পনা বা কুহক বা এইরূপ কোন অর্থে মায়া-শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। মায়াবাদ-রূপ অন্যতম স্তম্ভের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া মায়ার যথার্থ তাৎপর্য বুঝা আবশ্যিক। মায়াবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা হৃদয়ঙ্গম না হইবার আশঙ্কা আছে, এজন্য আপনারা কিঞ্চিৎ ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৈদিক সাহিত্যে কুহক অর্থেই মায়া-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই মায়া-শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। কিন্তু তখন প্রকৃত মায়াবাদের অভ্যুদয় হয় নায়। বেদে আমরা এইরূপ বাক্য দেখিতে পাই, ‘ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপ ঈয়তে’-ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মায়া-শব্দ ইন্দ্রজাল বা অনুরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলে মায়া-শব্দ ঐরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। অতঃপর কিছুদিনের জন্য মায়া-শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এই অবকাশে ঐ শব্দ-প্রতিপাদ্য ভাব ক্রমশই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, প্রশ্ন করা হইতেছে, ‘আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারি না কেন?’ ইহার এইরূপ গভীরভাবব্যঞ্জক উত্তর পাওয়া যায়, ‘আমরা জল্পক, ইন্দ্রিয়সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি’-‘নীহারেণ প্রাবৃত্তা জল্প্যা চাসুতৃপ উকথশাসচরংতি!’^১ এস্থলে মায়া-শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু উহাতে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইতেছে-আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ, তাহা সত্য এবং আমাদের মধ্যে কুজ্জটিকাবৎ বর্তমান।

অনেক পরবর্তী কালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে ‘মায়া’-শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে ইহার প্রভূত রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহার সহিত নূতন অর্থ সংযোজিত হইয়াছে। নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনরালোচিত হইয়াছে; অবশেষে মায়া-বিষয়ক ধারণা একটি নির্দিষ্ট ভাব পাইয়াছে। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি, ‘মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ।’-মায়া কেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।

১ ঋগ্বেদ-১০ম মণ্ডল, ৮২ সূক্ত, ৭ম ঋক্

মহাত্মা শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ এই মায়া-শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মায়া-শব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে পরিণত হইয়াছিল এবং ‘মায়া’ কথাটি এইরূপ অর্থেই এখন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দু যখন বলেন, ‘জগৎ মায়াময়’, তখন সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদিত হয় যে, জগৎ কল্পনামাত্র। বৌদ্ধ দার্শনিকদের এইরূপ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে; কারণ এক শ্রেণীর দার্শনিক বাহ্যজগতের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার শেষ পরিপূর্ণরূপ বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ বা কোন মতবাদ নহে। আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র।

আপনাদিগকে পূর্বে বলিয়াছি, বেদ যাঁহাদের হৃদয়নিঃসৃত, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি মূলতত্ত্বের অনুধাবন ও আবিষ্কারেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা যেন এই-সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সেজন্য অপেক্ষাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর গভীরতম প্রদেশে উপনীত হইতেই ব্যগ্র ছিলেন। এই জগতের অতীত কিছুই যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহারা যেন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানে আলোচিত বিশেষ সিদ্ধান্তগুলি অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও উহাদের মূলতত্ত্বগুলির সহিত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের কোন প্রভেদ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর

(ether)বা আকাশ-বিষয়ক অভিনব তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্ট ভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইহা মূলতত্ত্বেই পর্যবসিত ছিল। তাঁহারা এই আকাশতত্ত্বের কার্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় শক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশমাত্র, সেই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ত্ব বেদে-উহার ব্রাহ্মণাংশেই পাওয়া যায়। সংহিতার একটি দীর্ঘ মন্ত্রে সকল জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি প্রাণের প্রশংসা আছে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হয়তো জানিয়া আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মটানুযায়ী এই পৃথিবীতে যে ভাবে জীব-সৃষ্টি হইল, তাহা বৈদিক দর্শনেও পাওয়া যায়। আপনারা সকলেই নিশ্চয় জানেন যে, জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে-এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসে-কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের স্থির বিশ্বাস।

১ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতিমাত্র, উহাদের বাস্তব সত্তা নাই-এই মতকেই বিজ্ঞানবাদ বা Idealism বলে।

২ জগৎ আমাদের মনের অনুভূতিমাত্র নহে উহার বাস্তব সত্তা আছে-নাই-এই মতকে বাস্তববাদ বা Realism বলে।

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা সাধারণ তত্ত্বসকল বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন। বাহ্য জগৎ হইতে এই বিশ্ব-রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে যথাসম্ভব উত্তর তাঁহারা পাইয়াছিলেন। আর তাঁহারা ঐরূপে যে-সকল মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে যখন জগৎ-রহস্যের প্রকৃত মীমাংসা হইল না, তখন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রমানসকল উহার মীমাংসায় যে অধিকতর সহায়তা করিবে না, ইহা বলা বাহুল্য। যদি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বিস্তারিত অনুশীলন দ্বারা আমরা সত্যের অভিমুখে অধিক অগ্রসর হইতে পারিব না। যদি এই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ত্ব বিশ্বতত্ত্ব-নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক ; কারণ তাহা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে

কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবেনা। আমি বলিতে চাই তত্ত্বানুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় এবং কখন কখন তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এমন অনেক ব্যাপক সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যেগুলি আজও সম্পূর্ণ নূতন; এবং তাঁহাদের গ্রন্থে এইরূপ অনেক মতবাদ আছে, যেগুলি বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আজও মতবাদরূপে চিন্তা করিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশ-তত্ত্বে উপনীত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আরও তাহার উচ্চে অধিকতর সূক্ষ্ম আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কিছুই মীমাংসা হইল না। এই-সকল তত্ত্ব রহস্যের উত্তরদানে অক্ষম।

ব্যর্থ জগদ্বিষয়ক জ্ঞান যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ রহস্যের উত্তর দিতে পারিবে না। মনে হয় যেন কিছুটা জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সহস্র বৎসর আরও অপেক্ষা করা যাউক, ইহার মীমাংসা হইবে। বেদান্তবাদী মনের সসীমতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন, অতএব উত্তর দেন, ‘না, সীমার বহিরে যাইবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা দেশ-কাল নিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি না।’ যেরূপ কেহই স্বকীয় সত্তা অতিক্রম করিতে সক্ষম নহেন, সেইরূপ দেশ ও কালের নিয়ম যে-সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। দেশ-কাল-নিমিত্ত-সম্বন্ধীয় রহস্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা বিফল, যেহেতু এরূপ চেষ্টা করিতে গেলে এই তিনেরই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভব? জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহা হইলে কি বলা যায়? ‘এই জগতের অস্তিত্ব নাই।’ এ কথা বলার অর্থ কি? ইহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, ইহাই অর্থ। আমার, তোমার ও অপর সকলের মনের সম্বন্ধে ইহার আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা এই জগৎকে যে রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদি আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় অধিক থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আরও কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলে ইহা আরও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত অতএব ইহার বাস্তব সত্তা নাই-সেই অপরিবর্তনীয় অচল অনন্ত সত্তা ইহার নাই। কিন্তু ইহাকে অস্তিত্বশূন্যও বলা যাইতে পারে না; কারণ ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই আমাদের কাজ করিতে হইতেছে। ইহা সৎ ও অসতের মিশ্রণ।

সুস্পষ্টতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন জ্বলকার্য পর্যন্ত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎরূপ বিরুদ্ধভাবের সংমিশ্রণ। আমাদের জ্ঞানলাভ-বিষয়েও এই বিরুদ্ধভাব বর্তমান। এইরূপ মনে হয়, যেন মানুষ জিজ্ঞাসু হইলেই সমগ্র জ্ঞানলাভে সক্ষম হইবে; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর না হইতেই এরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পায়, যাহা অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত। তাহার সমস্ত কার্য একটি বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং সেই বৃত্তসীমা তাহার পক্ষে লঙ্ঘন করা সম্ভব নহে। তাহার অন্তরতম ও প্রিয়তম রহস্যসকল তাহাকে দিবারাত্র উন্মোচিত করিতেছে, মীমাংসার জন্য তাহাকে প্রতিদিন আহ্বান

করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে সে অক্ষম; কারন নিজ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার নাই। তথাপি বাসনা তাহার অন্তরে গভীর-ভাবের নিহিত; কিন্তু এই-সকল উন্মোচনা দমন করাই যে মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগত আছি।

আমাদের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের কাছে স্বার্থপর হইতে বলিতেছে। অপরদিকে এক অমানুষী শক্তি বলিতেছে যে, শুধু নিস্বার্থতাই মঙ্গলকর। প্রত্যেক বালক জন্ম হইতেই আশাবাদী; সে সুখের স্বপ্নই দেখে। যৌবনে সে অধিকতর আশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয় বা অপমান বলিয়া কিছু আছে- কোন যুবকের পক্ষে ইহা বিশ্বাস করা কাঠিন্য। বৃদ্ধাবস্থা আসিল-জীবন ধ্বংসরাসিতে পরিনত হইল, সুখস্বপ্ন আকাশে বিলীন হইল; বৃদ্ধ নিরাশাবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে আমরা প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশাশূন্য ও উদ্বেগহীনের মতো এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধাবিত হইতেছি এ সম্বন্ধে ‘ললিতবিস্তরে’ লিখিত বুদ্ধচরিতের একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গিত মনে পড়ে। এইরূপ বর্ণিত আছেঃ বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি রাজবাটীর বিলাসিতায় আত্মবিস্মৃত হওয়ায় তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য দেবকন্যাগণ একটি সঙ্গিত গাহিয়াছিলেন। সে সঙ্গিতের মর্মার্থ এই-‘আমরা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্তন হইতেছি-নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।’ এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না-অবিরত চলিয়াছে। এখন উপায় কি? যাঁহার অল্পপানের প্রাচুর্য আছে, তিনি

আশাবাদী হইয়া বলেন, ‘ভীতি-উৎপাদক দুঃখের কথা কহিও না। সংসারের দুঃখ ও ক্লেশের কথা শুনাইও না।’ তাঁহার নিকট গিয়া বলো-‘সকলেই মঙ্গল।’ তিনি বলেন, ‘সত্যই আমি নিরাপদে আছি ; এই দেখ, কেমন সুন্দর অটালিকায় বাস করিতেছি! আমার শীতের ভয় নাই, অগ্নির অভাব নাই! অতএব আমার সম্মুখে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না।’ কিন্তু অপরদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে! যাও, তাহাদিগকে শিখাও যে সমস্তই মঙ্গল। কিন্তু ঐ যে একজন এ জীবনে ভীষণ ক্লেশ পাইয়াছে, সে তো সুখের সৌন্দর্যের মঙ্গলের কথা শুনিবে না। সে বলিতেছে, ‘সকলকেই ভয় দেখাও ; আমি যখন কাঁদিতেছি, তখন অপরে কেন হাসিবে? আমি সকলেই আমার সহিত কাঁদাইব ;

কারণ আমি দুঃখ-পীড়িত, সকলেই দুঃখ-পীড়িত হউক-ইহাতেই আমার শান্তি।’ এইরূপে আমরা আশাবাদ হইতে নিরাশাবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার-সমগ্র সংসারেই মৃত্যুর মুখে যাইতেছে ; সকলেই মরিতেছে। আমাদের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপ, সমাজসংস্কার, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য, জ্ঞান-মৃত্যুই সকলের শেষ গতি। একমাত্র ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি হইতেছে, যাইতেছে ; সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে-গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধুলির মতো চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছে। অনাদি কালই এইরূপ চলিতেছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপি মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে-সকলেই মৃত্যুর পথে ধাবমান। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম আসক্তি রহিয়াছে। জানি না, কেন আমরা এ জীবনের প্রতি আসক্ত, কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইহাই মায়া।

জননী সন্তানকে সযত্নে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি আসক্ত। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়তো কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপি পুত্রের প্রতি আসক্ত। যখন তাঁহার বিচারশক্তি জাগরিত হয়, তখন তিনি পুত্রকে স্নেহের আবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি কিন্তু জানেন না, ইহা স্নেহ নহে-এক অজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার করিয়াছে।

তিনি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া।

আমরা সকলেই কল্পিত সুবর্ণলোমের^১ অন্তর্গত ছুটিয়া চলিয়াছি, প্রত্যেকেরই মনে হয়, আমিই ইহা পাইব ; জ্ঞানবান ব্যক্তিমাতেই বুঝিতে পারেন, এই সুবর্ণলোম লাভের সম্ভাবনা তাঁহার হয়তো বিশ লক্ষের মধ্যে এক। তথাপি প্রত্যেকেই উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন ; ইহাই মায়া।

ইহসংসারে মৃত্যু দিবারাত্র সগর্বে বিচরন করিতেছে ; আমাদের বিশ্বাস-আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করা হয় : এই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কি? রাজা উত্তর দিয়াছিলেন, ‘প্রত্যহই চারিদিকে মানুষ মরিতেছে, তথাপি মানুষ মনে করে, সে কখনই মরিবে না।’ ইহাই মায়া।

১ Golden Fleece : গ্রীকপুরানে ইহা Argonautic Expedition নামে খ্যাত।

আমাদের বুদ্ধি জ্ঞান ও জীবনের প্রতি ঘটনার মধ্যে সর্বত্রই এই বিষম বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে। একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া জাতি-বিশেষের দোষসমূহ প্রতিকার করিবার জন্য যত্নবান হইলেন; প্রতিকারের পূর্বেই অপর দিকে অন্য সহস্রপ্রকার দোষ দেখা দিল। এ যেন পতনোন্মুখ অট্টালিকার মতো, এক স্থানে জীর্ণসংস্কার করিতে করিতে অপরদিকে ভাঙন ধরে। ভারতীয় নারীগণের বাধ্যতামূলক বৈধব্য-জনিত দুঃখ প্রতিকারের জন্য আমাদের সংস্কারকগণ প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্যে বিবাহ না হওয়াই প্রধান দোষ। একস্থানে কুমারীদের সাহায্য করিতে হইবে, তাহারা দুঃখ পাইতেছে ; অন্য স্থানে বিধবাদের সাহায্য করিতে হইবে, তাহারা কষ্ট পাইতেছে। দেহের পুরাতন বাতব্যাধির মতো মাথা হইতে তাড়িত হইয়া ইহা শরীরের অন্য স্থান আশ্রয় করিতেছে; আবার সেখান হইতে পাদদেশ আক্রমণ করিতেছে। সংস্কারক আসিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন-বিদ্যা ধন কৃষি কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, তাহারা এইগুলি সকলের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে কেহ কেহ এক হিসাবে কতকটা সুখী

হইল বটে, কিন্তু জ্ঞানানুশীলন যতই বেশী লাগিল, শারীরিক সুখ ততই হয়তো অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এখন সুখের জ্ঞান হইতেই যে দুঃখের জ্ঞান আসিতেছে! কোন পথে যাইব? আমরা যে সামান্য সুখ ভোগ করিতেছি, অন্য কোথাও সেই পরিমান দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাই নিয়ম। যুবকেরা হয়তো ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘদিন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া।

দিবারাত্র এই-সকল ব্যপার ঘটিতেছে, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কারণ প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্থাপিতই হইতে পারে না; যাহা ঘটিতেছে তাহার না আছে ‘কেন’, না আছে ‘কি ভাবে’ ; আমরা শুধু জানি ইহা ঘটিতেছে, আমরা

আর কিছুই করিতে পারি না। আমরা ইহাকে এক মুহূর্তও স্থির রাখিতে পারি না-প্রতি মুহূর্তে ইহা আমাদের হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় কি ভাবে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিব-আমরা যে কখন কখন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়াছি পরোপকারের চেষ্টা করিয়াছি সেইগুলি স্মরণ করিয়া ভাবিতে পারি-কেন, ঐ কাজগুলি তো আমরা বুঝিয়া-সুঝিয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সে গুলি না করিয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়াই ঐরূপ করিয়াছিলাম। আমাকে এই স্থানে দাঁড়াইয়া বক্তৃত দিতে হইতেছে আর আপনাদিগকে বসিয়া উহা শ্রবণ করিতে হইতেছে- ইহাও আমরা না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই করিতেছি। আপনারা গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, হয়তো কেহ ইহা হইতে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিবেন, অপরে হয়তো মনে করিবেন লোকটা অনর্থক বকিতেছে। আমি বাড়ি যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃত দিয়াছি। ইহাই মায়া।

অতএব এই সংসারগতি-বর্ননার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা শুনিয়া ভয় পায়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগের প্রতিকার হইবে না। কুকুর দ্বারা অনুসৃত হইয়া শশক যেরূপ মাটিতে মাথা লুকাইয়া নিজেকে

নিরাপদ মনে করে, আমরা আশাবাদী বা নিরাশাবাদী হইয়া অবিকল সেই শশকের মতো কাজ করিতেছি। ইহা রোগ মুক্তির ঔষধ নহে।

অপর পক্ষে-ইহজীবনে প্রাচুর্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগিগণ এই মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করেন। এদেশে-ইংলণ্ডে নিরাশাবাদী হওয়া কঠিন। সকলেই আমাকে বলিতেছেন-জগতে কাজ কি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে! জগত কি রূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাঁহারা নিজেদের জীবনকেই তাঁহাদের জগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উঠিতেছে-খ্রীষ্টধর্মই পৃথিবী-মধ্যে একমাত্র ধর্ম কারন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিমাত্রই সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু এইরূপ উক্তি স্ববিরোধী। যেহেতু অখ্রীষ্টান জাতিদের দুর্ভাগ্যই খ্রীষ্টান-জাতির সৌভাগ্যের কারণ। শোষণযোগ্য কতকগুলি জাতি যে চাই। সমস্ত পৃথিবী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইলে, শিকার স্বরূপ অখ্রীষ্টান জাতির অস্তিত্ব না থাকিলে খ্রীষ্টানজাতিগুলিই দরিদ্র হইয়া যাইবে। সুতরাং এ যুক্তি নিজেকেই খণ্ডন করিয়াছে। উদ্ভিজ্জ পশ্বাদির খাদ্য, মনুষ্য পশ্বাদির ভোক্তা, এবং

সর্বাপেক্ষা গর্হিত ব্যাপার- মনুষ্য পরস্পরের, দুর্বল বলবানের ভক্ষ হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সর্বত্রই বিদ্যমান। ইহাই মায়া।

এ রহস্যের তুমি কী মীমাংসা কর? আমরা প্রত্যহই অভিনব যুক্তি শুনিয়া থাকি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। স্বীকার করিয়া লইলাম এরূপ সম্ভব, কিন্তু এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল উৎপন্ন হইবার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি ব্যতীত শুধু মঙ্গলের মধ্য দিয়া কি মঙ্গল সাধিত হয় না? মানবজাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুখী হইবে, কিন্তু এখন কেন এই ভয়ানক দুঃখ যন্ত্রনা! ইহার মীমাংসা নাই। ইহাই মায়া।

এরূপ শোনা যায়, দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটি বিশেষত্ব; সংসার হইতে ক্রমাগত এইরূপ দোষভাগ পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাহাদের প্রাচুর্য আছে, যাহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, যাহাদিগকে তথাকথিত ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে

হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের দাস্তিকতা বাড়াইতে পারে। সত্যই ইহা তাহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকর ও শান্তিপ্রদ। সাধারণ লোকেরা যন্ত্রনা ভোগ করুক-তাহাদের ক্ষতি কি? সাধারণ লোকেরা মারা যায়-সেজন্য তাহাদের কি? বেশ কথা, কিন্তু এ যুক্তি আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা দোষাবহ এ কথা স্বীকার করা যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান, এবং অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গল-ভাগ এইরূপে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়া একেবারে নিঃশেষিত হইবে, তখন কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ বলা অতি সহজ। কিন্তু অমঙ্গল যে ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়? অমঙ্গল কি ক্রমশঃ বাড়িতেছে না? একজন অরণ্যবাসী মানুষ, যে মনোবৃত্তি-পরিচালনায় অনভিজ্ঞ-একখানি পুস্তকপাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে তাহা শোনে নাই, আজ তাহাকে ক্ষতবিক্ষত কর, কাল সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। শাণিত অস্ত্র তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিয়া আনো, তথাপি সে শীঘ্রই

১ Darwin's Theory of Evolution

আরোগ্যলাভ করিবে; কিন্তু পথ চলিতে একটু আঁচড় লাগিলেই আমরা মরিয়া যাই। শিল্পযন্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতি ও ক্রমবিকাশ হইতেছে; কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে; একজন ধনশালী হইতেছে, একইকালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে, দলকে দল মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হইতেছে। এইভাবেই চলিয়াছে। পশুমানবের অনুভূতি ইন্দ্রিয়েই আবদ্ধ; যদি সে প্রচুর আহার না পায়, কিংবা যদি তাহার শারীরিক অসুস্থতা ঘটে, সে দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ইন্দ্রিয়েই তাহার সুখ-দুঃখের আরম্ভ ও শেষ। যখন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখের পরিধিও সমপরিমাণে বর্ধিত হয়। অরণ্যবাসী মানুষ ঈর্ষা জানে না, বিচারালয় জানে না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্তৃক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশাচিক মানব-প্রকৃতি-সম্ভূত যে ভীষণ

শাসনযন্ত্র প্রত্যেকটি মানুষের মনের গোপন কথাও জানিয়া লইতে চায়, তাহা দ্বারা সে দিবারাত্র শাসিত হইতে জানে না। সে জানে না-ভ্রান্ত গর্বিত মানুষ কিরূপে পশু অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিকস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমরা যখনই স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে উঠিতে থাকি, আমাদের সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত দুঃখানুভবের শক্তি ও বিকশিত হয়। স্নায়ুমণ্ডল সূক্ষ্মতর হইয়া অধিক যন্ত্রনা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। শক্তিও বিকশিত হয়। সকল সমাজেই ইহা অহরহঃ দেখা যাইতেছে যে,মূর্খ সাধারণ মানুষ তিরস্কৃত হইলে বেশী দুঃখ অনুভব করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশয্য হইলে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক কিন্তু একটি কথার তিরস্কারও সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল এত সূক্ষ্ম হইয়াছে! তাঁহার সুখানুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার দুঃখও বাড়িয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের-ক্রমবিকাশবাদীদের মত ইহার দ্বারা বিশেষ প্রমাণিত হয় না। আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বৃদ্ধি পায়, যন্ত্রনাভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্ধিত হইয়া থাকে। কখন কখন আমার মনে হয়, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদি সমযুক্তান্তর শ্রেণীর^১ নিয়মে অগ্রসর হয়, অপর দিকে অসুখী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেণীর^২ নিয়মে বর্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানুষ সমাজ সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানি, যতই আমরা উন্নত হইব, ততই আমাদের সুখদুঃখের অনুভবশক্তি তীব্র হইবে। ইহাই মায়া।

১ A.P. (Arithmetical Progression): ২, ৪, ৬, ৮, ১০...

২ G.P. (Geometrical Progression): ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২...

অতএব আমরা দেখিতেছি, মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত মতবাদবিশেষ নহে,- সংসারের ঘটনা যেভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তাহারই বর্ণনামাত্র। বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি ; সর্বত্র এই ভয়ানক বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি। যেখানে মঙ্গল সেইখানেই অমঙ্গল। যেখানে অমঙ্গল সেইখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন সেইখানেই ছায়ার মতো মৃত্যু তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকে কাঁদিতে হইবে ; যে কাঁদিতেছে, সে হাসিবে। এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য এমন স্থান

কল্পনা করিতে পারি যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে অমঙ্গল থাকিবে না। সেখানে আমরা কেবল হসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যখন এই সকল-কারণ সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান, তখন এরূপ সংঘটন স্বতই অসম্ভব। যেখানে আমাদের হাঙ্গামার শক্তি আছে, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেখানে সুখোৎপাদক শক্তি বর্তমান, দুঃখজনক শক্তিও সেইখানে লুক্কায়িত।

অতএব বেদান্তদর্শন আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী নহে। বেদান্ত এই দুই মতবাদ প্রচার করিতেছে ; ঘটনা সকল যে ভাবে বর্তমান, বেদান্ত সেভাবে সেগুলি গ্রহণ করিতেছে ; অর্থাৎ বেদান্তমতে এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ ; একটিকে বর্ধিত কর, অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে। কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ ধারণাই স্ববিরোধী। কিন্তু এরূপ বিশ্লেষণ দ্বারা বেদান্ত এই একটি মহারহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন যে মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পৃথক্ সত্তা নহে। এই সংসারে এমন একটি বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা আজ শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কাল তাহাই আবার অশুভ বোধ হইতে পারে। একই বস্তু, যাহা একজনকে দুঃখী করিতেছে তাহাই আবার অপরের সুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, তাহাই আবার অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উপাদেয় আহার রন্ধন করিতে পারে।

যে স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা দুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, সুখবোধ ও তাহারই দ্বারা অন্তরে নীত হয়। অমঙ্গল-নিবারণের একমাত্র উপায় মঙ্গল-নিবারণ; উপায়ান্তর নাই, ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে হইলে জীবনও বারণ করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও দুঃখহীন সুখ স্ববিরোধী বাক্য, কোনটিকেই একা পাওয়া যায় না। দুই-ই একই বস্তুর বিকাশ। গতকাল যাহা শুভদায়ক মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা করি না। যখন আমরা অতীত জীবন পর্যালোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শসকল আলোচনা করি, তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করি। এক সময়ে তেজস্বী অশ্বযুগল চালনা করাই আমার জীবনের আদর্শ ছিল। এখন এ রূপ চিন্তা করি না। শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, মিষ্টান্ন-বিশেষ

প্রস্তুত করিতে পারিলে আমি খুব সুখী হইব। অন্য সময়ে মনে হইত, স্ত্রীপুত্র ও প্রচুর টাকাকড়ি হইলেই যথার্থ সুখী হইব। এখন এগুলিকে ছেলেমানুষি মনে করিয়া হাসিয়া থাকি।

বেদান্ত বলেন, এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন আমরা পিছনের দিকে তাকাইব, এবং যে সকল ভাবাদর্শের জন্য আমরা ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে ভয় পাইতেছি, সেগুলিকে আমরা বিদ্রূপ করিব। সকলেই নিজ দেহ বাঁচাইয়া রাখিতে ব্যগ্র, কেহই ইহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ যত কাল ইচ্ছা ততকাল রক্ষাকরিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব, আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন এ কথা স্মরণ করিয়া করিয়া আমরা হাসিয়া উঠিব। অতএব যদি আমাদের বর্তমান অবস্থা সত্যও নয়, অসত্যও নয় উভয়ের সংমিশ্রণ-দুঃখও নয়, সুখও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণ-এইরূপ বিষমবিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়, তবে বেদান্তের আবশ্যিকতা কি? অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মমতগুলিরই বা প্রয়োজন কি? সর্বোপরি শুভকর্ম করিবারই বা কি প্রয়োজন? এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়। লোকে জিজ্ঞাসা করিবে- যদি অশুভ ছাড়া শুভ হয় না, যদি সুখ উৎপন্ন করিতে হইলে সর্বদা দুঃখও উৎপন্ন হয়, তবে এ সকলের আবশ্যিকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যায়-প্রথমতঃ দুঃখ লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম করিতেই হইবে, কারণ নিজেকে সুখী করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে, শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, ইহার যথার্থতা বুঝিয়া থাকি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক কিছু সত্বর, জড়বুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারেন। জড়বুদ্ধি লোক উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প যন্ত্রণা পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ আমাদের কর্তব্য করিয়া যাইতে হইবে, কারণ সুখদুঃখময় বিপরীতভাবপূর্ণ জীবনের বাহিরে যাইবার ইহাই একমাত্র পথ। সুখ ও দুঃখ-উভয় শক্তিই জগৎকে আমাদের জন্য জীবন্ত রাখিবে, যতদিন না আমরা স্বপ্ন হইতে জাগরিত হই এবং এই মাটির পুতুল গড়া পরিত্যাগ করি। আমাদের এ শিক্ষালাভ করিতে হইবে; আর ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে।

‘অনন্তই সান্ত হইয়াছেন’-জার্মানিতে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর দর্শন-শাস্ত্র-প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংল্যাণ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই-সকল দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়-অনন্তস্বরূপ^১ নিজেকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একদিন অনন্ত নিজেকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং আমরা অনন্ত, বিকাশ অভিব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করেন : সান্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এ সিদ্ধান্তের ন্যায়ানুগত মূলভিত্তি কি? নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়াই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এস্থলে সকলেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকে স্বতই সীমাবদ্ধ হইতে হইবে; অতএব সসীমের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব। ইহা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ বা অনন্ত সত্তা নিজেকে সান্তরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন এই উদ্যোগ অসম্ভব বুঝিয়া তাহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্মের আরম্ভ। বৈরাগ্যই ধর্মের সূচনা। আজকাল বৈরাগ্য-বিষয়ে কথা বলা বড় অপপ্রীতিকর। আমেরিকায় আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আসিয়া বৈরাগ্যবিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলণ্ডের দার্শনিকগণও হয়তো এইরূপই বলিবেন। কিন্তু বৈরাগ্যই সত্য এবং ধর্মলাভের একমাত্র পথ। চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি অন্য পথ খুঁজিয়া পাও; কখনই পাইবে না। এমন সময় আসিবে, যখন অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিবে, এই দীর্ঘ বিষাদময় স্বপ্নদর্শন হইতে জাগ্রত হইবে; শিশু খেলা ছাড়িয়া জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইবে, বুঝিবে :

১ Hegel's Absolute Mind

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্বেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।^১

-কাম্যবস্তুর উপভোগ বাসনার কখনও নিবৃত্তি হয়না, ঘৃতাঙ্কুর দ্বারা অগ্নির মতো বাসনা বরং বাড়িতেই থাকে। এইরূপ কি ইন্দ্রিয়বিলাস, কি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাজনিত আনন্দ, কি মানবাত্মার উপভোগ্য সর্ববিধ সুখ-সবই শূন্য, সকলই মায়ার অন্তর্গত। সকলই এই সংসারজালের অন্তর্গত, আমরা উহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। আমরা মায়াজালের মধ্যে অনন্তকাল ছুটাছুটি করিতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না; এবং যখনই এক কণা সুখ পাইবার চেষ্টা করিব, তখনই রাশি রাশি দুঃখ আমাদের চাপিয়া ধরিবে। কি ভয়ানক অবস্থা! যখন আমি ব্যাপারটি ভাবিতে চেষ্টা করি, আমার নিঃসংশয় অনুভূতি হয়, ইহাই মায়াবাদ -সকলই মায়া; এই বাক্যই ইহার একমাত্র এবং সর্বাপেক্ষা ভালো ব্যাখ্যা। এ সংসারে কি দুঃখরাশিই না বর্তমান! যদি আপনারা বিবিধ জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, বুঝিতে পারিবেন যে, এক জাতি তাহার দোষভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপর জাতি অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কেহই কৃতকার্য হয় নাই। যদি দোষগুলি ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া একদিকে নিবদ্ধ করা যায়, অপর দিকে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার গতিই এইরূপ। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কতকটা সতীত্ব-ধর্মের আদর্শ উচ্চে স্থাপন করিবার জন্য বাল্যবিবাহ দ্বারা তাহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিকে অধঃপাতিত করিয়াছে। কিন্তু এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুজাতিকে পবিত্রতায় ভূষিত করিয়াছে। কি চাও? যদি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমাধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা হইলে এই বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের শরীর দুর্বল করিতে হইবে। অপর-দিকে ইংলণ্ডে তোমাদের অবস্থাই কি খুব ভাল? কখনই নয়। কারণ পবিত্রতাই জাতির জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে লক্ষ্য কর নাই যে, অপবিত্রতার মধ্য দিয়াই জাতির মৃত্যুচিহ্ন দেখা দেয়? -যখন যৌন অপবিত্রতা কোন জাতির মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই বুঝিতে হইবে উহার বিনাশ আসন্ন। এই-সকল দুঃখজনক সমস্যার মীমাংসা কোথায়? যদি পিতা-মাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা হইলে এই দোষ অনেকটা নিবারণিত হয়। ভারতের কন্যাগণ যতটা ভাবপ্রবণ তদপেক্ষা অধিক কার্যকুশল। তাহাদের জীবনে কাব্য খুবই কম। কিন্তু যদি

লোকে নিজেরাই স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করে, তাহাতেও অধিক সুখ হয় না। ভারতীয় নারীগণ সাধারণতঃ বেশ সুখী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ খুব বেশী হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রে-যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিদ্যমান, সেখানে অসুখী পরিবার ও দুঃখকর বিবাহের সংখ্যা অনেক। আমি যে-কোন সভায় গিয়াছি, সেখানেই শুনিয়াছি-সভায় উপস্থিত এক-তৃতীয়াংশ নারী তাহাদের পতিপুত্রকে দূর করিয়া দিয়াছে। এইরূপই সর্বত্র। ইহাতে কি প্রকাশ পাইতেছে? প্রকাশ পাইতেছে যে, এই-সকল আদর্শ দ্বারা অধিকতর সুখ অর্জিত হয় নাই। আমরা সকলেই সুখের জন্য আপ্রান চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু সুখ পাইতে না পাইতেই অন্যদিকে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে।

১ বিষ্ণুপুরাণ- ৪/ ১০/ ৯

তবে কি আমরা শুভ কর্ম করিব না? করিব বইকি-পূর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহের সহিত আমরাই কাজ করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান আমাদের উৎকট বাড়াবাড়ি ও ধর্মান্ধতা দূর করিবে। ইংরেজ আর উত্তেজিত হইয়া হিন্দুকে ‘ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার করে!’-এই বলিয়া অভিশাপ দিবে না। সে বিভিন্ন জাতির রীতিনীতি মান্য করিতে শিখিবে। ধর্মান্ধতা অল্প হইবে এবং কাজ বেশী হইবে। ধর্মান্ধ লোকেরা কাজ করিতে পারে না। তাহারা শক্তির তিন-চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয় করে। ধীর প্রশান্তচিত্ত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কাজ করেন ; অতএব এই জ্ঞান দ্বারা কাজ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অবস্থা এইরূপই জানিয়া তিতিক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। দুঃখ ও অমঙ্গল আমাদের কাজে ভারসাম্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না এবং ছায়ার পিছনে ধাবিত করিবে না। সুতরাং সংসারগতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। ধরা যাক, সকল মানুষই

দোষশূন্য হইবে, তারপর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং পূর্ববৎ সব অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে ; উদ্ভিদদিগেরও গতি ঐরূপ। কিন্তু কেবল একটা জিনিস সুনিশ্চিত-এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, উহার জলবিন্দুগুলির প্রত্যেকটি অনন্ত বারিধিবক্ষে বিলীন হইবে। অতএব সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ হাস্য ও ক্রন্দনের সহিত জীবন যে সেই অনন্ত সামুদ্রাভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত

হইতেছে, ইহা নিশ্চিত।-তুমি আমি, জীব উদ্ভিদ ও সামান্য জীবানুপর্যন্ত, যে যেখানে রহিয়াছে, সকলেই সেই অনন্ত জীবন সমুদ্রে উপনীত হইবে, মুক্তি বা ঈশ্বর লাভ করিবে ; ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ ।

পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত আশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবল অমঙ্গলময়-এইরূপ মত বেদান্ত ব্যক্ত করে না। বেদান্ত বলিতেছে, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই মূল্য সমান। ইহারা এইরূপে পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। সংসার এইরূপ জানিয়া সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম কর। কি জন্য কর্ম করিব? যদি সংসারের অবস্থা এইরূপ, আমরা কি করিব? অজ্ঞেয়বাদী হই না কেন, আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীরাও জানেন, এ রহস্যের মীমাংসা নাই ; বেদান্তের ভাষায় বলিতে গেলে-এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সমুদ্র হইয়া জীবন ভোগ কর। এখানেও একটি অতি মহাভ্রম রহিয়াছে। তুমি যে-জীবন দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছ, সেই জীবন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কিরূপ? জীবন বলিতে তুমি কি কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ জীবনই বুঝ? ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমরা পশু হইতে সামান্যই ভিন্ন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এ-স্থানে উপস্থিত এমন কেহ নাই, যাঁহার জীবন কেবল ইন্দ্রিয়েই আবদ্ধ। অতএব আমাদের বর্তমান জীবন বলিতে ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আরও কিছু বেশী বুঝায়। আমাদের সুখদুঃখের অনুভব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাশক্তিও তো আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ ; আর সেই উচ্চআদর্শ ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার কঠোর চেষ্টাও কি আমাদের জীবনের উপাদান নহে? অজ্ঞেয়বাদীদের মতে জীবন যেভাবে আছে, সেইভাবেই উহাকে ভোগ করা কর্তব্য। কিন্তু জীবন বলিলে সর্বোপরি আদর্শ-অন্বেষণের-পূর্ণতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায়। আমাদের এই আদর্শ লাভ করিতেই হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং জগৎ যেভাবে প্রতীয়মান হয়, সেভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদী জীবনের আদর্শভাগ বর্জন করিয়া বাকীটুকু স্বর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। এই আদর্শ লাভ করা অসম্ভব জানিয়া তিনি ইহার অন্বেষণই পরিত্যাগ করেন। ইহাই স্বভাব, ইহাই জগৎ; ইহাই মায়া।

১ Spencer's Agnosticism

বেদান্তমতে ইহাই প্রকৃতি। কিন্তু কি দেবোপাসনা প্রতীকোপাসনা বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বনপূর্বক আচরিত ধর্ম, অথবা দেবতা পিশাচ প্রেতের গল্প, সাধু ঋষি মহাত্মা বা অবতারের চরিতকথার সাহায্যে অনুষ্ঠিত অপরিণত বা উন্নত ধর্মমতগুলির উদ্দেশ্য একই। সকল ধর্মই ইহাকে-এই প্রকৃতির বন্ধনকে অতিক্রম করিবার অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছে। এক কথায় সকলেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ বুঝিয়াছে, সে বন্দী। সে যাহা হইতে ইচ্ছা করে, সে তাহা নয়। যে সময়ে-যে মুহূর্তে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তাহাকে সেখানে হইয়াছে, তখনই সে অনুভব করিয়াছে-সে বন্দী। সে আরও বুঝিয়াছে, এই সীমামূল্যবান হইয়া তাহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহ যেখানে যাইতে পারে না, সেখানে যাইতে চাহিতেছেন। দুর্দান্ত, নৃশংস, আত্মীয়-স্বজনের গৃহসন্নিধানে গোপনে অবস্থিত, হত্যাপ্রিয় ও তীব্র সুরাপ্রিয়, মৃত পিতৃপুরুষ বা অন্য ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী অতি নিম্ন ধর্মমতগুলিতে আমরা সেই একই প্রকার মুক্তির ভাব দেখিতে পাই। যাঁহারা দেবতার উপাসনা ভালোবাসেন, তাঁহারা সেই সকল দেবতার মধ্যে নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা দেখিতে পান-গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও দেবতারা প্রাচীরের মধ্য দিয়া আসিতে পারেন ; প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই মুক্তির ভাব ক্রমেই বর্ধিত হইয়া অবশেষে সগুন ঈশ্বরের আদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর প্রকৃতির পারে, ঈশ্বর মায়াতীত-ইহাই সেই আদর্শের কেন্দ্রগত ভাব।

আমি যেন শুনিতেছি, সম্মুখে কোন কণ্ঠস্বর উত্থিত হইতেছে, যেন অনুভব করিতেছি-ভারতের সেই প্রাচীন আচার্যগণ অরণ্যশ্রমে এই-সকল প্রশ্ন বিচার

করিতেছেন। বৃদ্ধ ও পবিত্র শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু একটি যুবক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে : হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি ; যিনি অন্ধকারের পারে, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়। ১

শৃংখলিত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ য়ে ধামানি দিব্যানি তস্তুঃ।।

*

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পশ্চা বিদ্যতেহয়নায়।।

উপনিষদ্ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি যে, মায়া আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং উহা অতি ভয়ঙ্কর। তথাপি মায়ার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইবে। যিনি বলেন, ‘এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, সমস্ত জল যখন সমুদ্রে চলিয়া যাইবে তখন নদী পার হইব’, তিনি যেমন সফল হন, আর যিনি বলেন, ‘পৃথিবী পূর্ণমঙ্গলময় হইলে পর কাজ করিব এবং জীবন উপভোগ করিব’, তিনিও সেইরূপ সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। মায়ার অনুকূলে পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধে গমনই পথ-এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রকৃতির সহায়ক হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রতিযোগী হইয়াই জন্মিয়াছি। আমরা বন্ধনের কর্তা হইয়াও নিজদিগকে বন্ধ করিতেছি। এই বাড়ি কোথা হইতে আসিল? প্রকৃতি ইহা দেয় নাই। প্রকৃতি বলিতেছে-‘যাও, বনে গিয়া বাস কর।’ মানব বলিতেছে-‘আমি বাটি নির্মাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব।’ সে তাহাই করিতেছে। তথা কথিত প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত অবিরাম সংগ্রামই মানবজাতির ইতিহাস এবং মানবই অবশেষে জয়ী হয়। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখ, সেখানেও সেই সংগ্রাম চলিয়াছে, ইহা পশু-মানব ও আধ্যাত্মিক-মানবের সংগ্রাম, আলোক ও অন্ধকারের সংগ্রাম; মানুষ এখানেও বিজেতা। প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানুষ আপনার মুক্তির পথ করিয়া লয়।

১ শ্বেতাশ্বতর উপ. ২/৫ ও ৩/৮

অতএব আমরা দেখিতেছি, এই মায়া অতিক্রম করিয়া বৈদান্তিক দার্শনিকগণ এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে; যদি আমরা সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারি, আমরাও মায়ার পারে যাইব। ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু বেদান্তমতে ইহা ধর্মের আরম্ভমাত্র, শেষ নহে। যিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, যিনি মায়াধীশ, মায়া বা প্রকৃতির অধীশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ ঈশ্বরের জ্ঞান এই বেদান্তভাবের শেষ কথা নহে। এই জ্ঞান ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। অবশেষে বৈদান্তিক দেখেন, যাঁহাকে বাহিরে বোধ হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই ছিলেন। যিনি সীমার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মুক্ত-স্বরূপ।

২. মানুষের যথার্থ স্বরূপ (১)

মানুষের যথার্থ স্বরূপ

[লগনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

মানুষ এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এতটা আসক্ত যে, সহজে সে উহা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু এই বাহ্য জগতকে যতদূর সত্য বা সার বলিয়া বোধ হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন একটি সময় আসে যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়- জগৎ কি সত্য? যে ব্যক্তি তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও সময় পায় না, যাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তই কোন না কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাহারও নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকেও বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়- জগৎ কি সত্য? এই প্রশ্নেই ধর্মের আরম্ভ এবং ইহার উত্তরেই ধর্মের পরিসমাপ্তি। এমন কি প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসেরও পূর্বে, সুদূর অতীত কালে, সভ্যতার অস্ফুট উষাকালেও-সেই রহস্যময় পৌরাণিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে : ‘জগৎ কি সত্য?’

কবিত্বময় কঠোপনিষদের প্রারম্ভে আমরা এই প্রশ্ন দেখিতে পাইঃ কেহ বলেন, ‘মানুষ মরিয়া গেলে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না’ ; আবার

কেহ বলেন, ‘না, তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে’। ইহার মধ্যে কোনটি সত্য?১

এ প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। যাবতীয় দর্শন ও ধর্ম প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নেরই বিভিন্ন প্রকার উত্তরে পরিপূর্ণ। ‘এর পরে কি? প্রকৃত সত্য কি?’-অনেকে আবার এই প্রশ্নকে, প্রাণের এই অশান্ত জিজ্ঞাসাকে থামাইয়া দিতে-দাবাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া কিছু থাকিবে, ততদিন এই দাবাইয়া দিবার চেষ্টা সর্বদা বিফল হইবে। আমরা মুখে খুব সহজে বলিতে পারি-জগতের অতীত সত্তার

অন্বেষণ করিব না, বর্তমান মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ রাখিব ; ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর চিন্তা করিব না বলিয়া খুব চেষ্টা করিতে পারি, আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহিরের সবকিছু আমাদের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিতে পারে, সমুদয় জগৎ মিলিয়া বর্তমানের ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে দৃষ্টি- প্রসারণে বাধা দিতে পারে, কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে, ততদিন এই প্রশ্ন বারংবার জিজ্ঞাসিত হইবেঃ আমরা এই যে-সকল বস্তুকে সত্যের সত্য, সারের সার বলিয়া ঐগুলির প্রতি আসক্ত, মৃত্যুই কি ইহাদের চরম পরিণাম? জগৎ তো এক মুহূর্তেই ধ্বংস হইয়া কোথায় চলিয়া যায়! গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ পর্বত, নিম্নে অতল গহ্বর-যেন মুখব্যাদান গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই পাহাড়ের ধারে দাঁড়াইয়া যত কঠোর অন্তঃকরণই হউক, নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে আর জিজ্ঞাসা করিবে ‘এ সব কি সত্য?’ কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি সারা জীবন ধরিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়া একটু একটু করিয়া যে আশার সৌধ নির্মান করিলেন, এক মুহূর্তে তাহা উড়িয়া গেল। এ গুলি কি সত্য? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে। কালক্রমে এই প্রশ্নের শক্তি হ্রাস পাইবে না, বরং কালস্রোতে যতই উহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই উহা হৃদয়ের উপর গভীর বেগে আঘাত করিবে।

দ্বিতীয় কথা হইতেছে-মানুষের সুখী হইবার ইচ্ছা। আপনাকে সুখী করিবার জন্য মানুষ সব কিছুর পশ্চাতে ধাবিত হয়-ইন্দ্রিয়ের পিছনে পিছনে ছুটিয়া উন্মত্তের ন্যায় বহির্জগতের কাজ করিয়া যায়। যে যুবক জীবন-সংগ্রামে

কৃতকার্য হইয়াছে, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে এই জগৎ সত্য-সব কিছু তাহার সত্য বলিয়া মনে হয়। হয়তো সেই যখন বৃদ্ধ হইবে, ভাগ্য-দ্বারা বারংবার বঞ্চিত হইয়া হয়তো সেই ব্যক্তিই জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবে, ‘সবই অদৃষ্ট।’ সে এতদিনে দেখিতে পাইল-বাসনা পূর্ণ হয় না। সে যেখানেই যায়, সেখানেই দেখে এক বজ্রদৃঢ় প্রাচীর, তাহা অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধ্য তাহার নাই। প্রতিটি ইন্দ্রিয়কর্ম প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়। সবই ক্ষণস্থায়ী। সুখ-দুঃখ, বিলাস-বিভব ক্ষমতা-দারিদ্র্য- এমন কি জীবন পর্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

এই সমস্যার দুইটি সিদ্ধান্ত আছে। একটি-শূন্যবাদীদের মতো বিশ্বাস কর যে, সবই শূন্য, আমরা কিছুই জানি না, আমরা ভূত-ভবিষ্যৎ, এমন কি বর্তমান সম্বন্ধেও কিছুই জানিতে পারি না। কারণ, যে ভূত-ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিয়া কেবল বর্তমান স্বীকার করিয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিতে চাহে, সে বাতুল। তাহা হইলে সে পিতামাতাকে অস্বীকার করিয়াও সন্তানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে। ইহাও যুক্তিসঙ্গত হইয়া পড়ে। ভূত-ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিলে বর্তমানও অস্বীকার করিতে হইবে। এই এক সিদ্ধান্ত-ইহা শূন্যবাদীর মত। কিন্তু আমি এমন লোক কখনও দেখিনাই, যে এক মিনিটের জন্য শূন্যবাদী হইতে পারে; মুখে ইহা বলা অবশ্য খুব সহজ।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই-এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর অন্বেষণ কর, সত্যের অন্বেষণ কর, এই নিত্যপরিবর্তনশীল নশ্বর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, অন্বেষণ কর। এই দেহ, যাহা কতকগুলি জড় পদার্থের অণুর সমষ্টিমাত্র, ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে? মানব-মনের ইতিহাসে বরাবর এই তত্ত্বের অনুসন্ধান হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই মানবের মনে এই তত্ত্বের অস্ফুট আলোক প্রতিভাত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, তখন হইতেই মানুষ স্থলদেহের অতীত অন্য একটি দেহের জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা অনেকাংশে ঐ দেহেরই মতো বটে, কিন্তু স্থলদেহ অপেক্ষা পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ-শরীরের ধ্বংস হইলেও উহার ধ্বংস হইবে না। আমরা ঋগ্বেদের সূক্তে মৃতশরীর-দহনকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশে নিম্নলিখিত স্তব দেখিতে পাইঃ ‘হে অগ্নি, তুমি ইহাকে তোমার হাতে ধরিয়া মৃদুভাবে লইয়া যাও-ইহার শরীর সর্বাঙ্গসুন্দর জ্যোতির্ময় কর; ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে মৃত্যু নাই।’

১ য়েয়ম্ প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। কঠ উপ. ১।১।২০

দেখিবে, সকল ধর্মেই এই একই প্রকার ভাব বিদ্যমান, এবং তাহার সহিত আমরা আর একটি তত্ত্বও পাইয়া থাকি। আশ্চর্যের বিষয়, সকল ধর্মই সমস্বরে ঘোষণা করেন, মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিল, এখন তাহার অবনতি হইয়াছে-এ ভাব তাঁহারা রূপকের ভাষায়, কিংবা দর্শনের সুস্পষ্ট ভাষায়, যেভাবেই প্রকাশ করুন না কেন তাঁহারা সকলেই

কিন্তু ঐ এক তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরান হইতেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অবনত হইয়া পড়িয়াছে। যাহুদীদের শাস্ত্র বাইবেলের পুরাতন ভাগে আদমের পতনের যে-গল্প আছে, ইহাই তাহার সারাংশ। হিন্দুশাস্ত্রে এই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সত্যযুগ বলিয়া যে-যুগের বর্ণনা করিয়াছেন-যখন মানুষের ইচ্ছামৃত্যু ছিল, তখন মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীর রক্ষা করিতে পারিত, তখন লোকের মন শুদ্ধ ও সংযত ছিল, তাহাতেও এই সর্বজনীন সত্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, তখন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা দুঃখ ছিল না, আর বর্তমান যুগ সেই উন্নত অবস্থারই অবনতভাব। এই বর্ণনার সহিত আমরা সর্বত্রই জলপ্লাবনের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই জলপ্লাবনের গল্পেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল ধর্মই বর্তমান যুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অবশেষে জলপ্লাবনে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইয়া গেল। আবার উন্নতি আরম্ভ হইল। মানুষ আবার উহার সেই পবিত্র অবস্থা লাভ করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

আপনারা সকলেই ওল্ড টেস্টামেন্টের জলপ্লাবনের গল্প জানেন। ঐ একই প্রকার গল্প প্রাচীন বাবিল, মিশর, চীন এবং হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে জলপ্লাবনের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

মহর্ষি মনু একদিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া বলিল, ‘আমাকে আশ্রয় দিন।’ মনু তৎক্ষণাৎ উহাকে সন্নিহিত একটি জলপাত্রে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কি চাও?’ মৎস্যটি বলিল, এক বৃহৎ মৎস্য আমাকে অনুসরণ করিতেছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।’ মনু উহাকে গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাতঃকালে দেখেন, মৎস্য ঐ

পাত্রপ্রমাণ হইয়াছে। সে বলিল, ‘আমি এ পাত্রে আর থাকিতে পারি না।’ মনু তখন তাহাকে এক চৌবাচ্চায় রাখিলেন। পরদিন সে ঐ চৌবাচ্চার সমান হইয়া বলিল, ‘আমি এখানেও থাকিতে পারিতেছি না।’ তখন মনু তাহাকে নদীতে স্থাপন করিলেন। প্রাতে যখন

দেখিলেন, মৎস্যের কলেবর নদী ভরিয়া ফেলিয়াছে, তখন তিনি উহাকে সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। তখন মৎস্য বলিতে লাগিল, ‘মনু, আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা। জলপ্লাবন দ্বারা জগৎ ধ্বংস করিব; তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আমি এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি। তুমি একখানি সুবৃহৎ নৌকা নির্মাণ করিয়া উহাতে সর্বপ্রকার প্রাণী এক এক জোড়া করিয়া রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপরিবারে উহাতে প্রবেশ কর। সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে জলের মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে, তাহাতে নৌকা বাঁধিবে। পরে জল কমিয়া গেলে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া প্রজাবৃদ্ধি করিও।’ এইরূপে ভগবানের কথা অনুসারে জলপ্লাবন হইল এবং মনু নিজ পরিবার এবং সর্বপ্রকার জন্তুর এক এক জোড়া এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিলেন এবং প্লাবনের অবসানে তিনি ঐ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া জগতে প্রজা উৎপন্ন করিতে লাগিলেন- আর আমরা মনুর বংশধর বলিয়া মানব নামে অভিহিত। ১

এখন দেখ, মানবভাষা সেই অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টামাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস- এই - সকল গল্প আর কিছু নয়, একটি ছোট বালক- অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দরাশিই যাহার একমাত্র ভাষা- সে যেন সেই ভাষায় গভীরতম দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে; শিশুর উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় অথবা অন্য কোনরূপ উপায় নাই। উচ্চতম দার্শনিকের এবং শিশুর ভাষায় কোন প্রকার গত ভেদ নাই, শুধু মাত্রাগত ভেদ আছে। আজকাল বিশুদ্ধ প্রণালীবদ্ধ গণিতের মতো সঠিক কাটাছাঁটা ভাষা, আর প্রাচীনদিগের অস্ফুট রহস্যময় পৌরাণিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার উচ্চতা- নিম্নতা। এই সকল গল্পের পিছনে একটি মহৎ সত্য আছে, প্রাচীনেরা উহা যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

অনেক সময় এই সকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পের ভিতরে মহামূল্যবান সত্য থাকে, আর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের সুন্দর মার্জিত ভাষার ভিতরে অনেক সময় শুধু অসার জিনিস পাওয়া যায়। অতএব পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা আবৃত বলিয়া এবং

আধুনিক কালের অমুক মহাশয় কি তমুক মহাশয়ার মনে লাগে না বলিয়া প্রাচীন সব জিনিসই একেবারে ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

‘অমুক ঋষি বা মহাপুরুষ বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বাস কর’-এইরূপ বলাতে যদি ধর্মগুলি উপহাসের যোগ্য হয়, তবে আধুনিকগণ অধিকতর উপহাসের যোগ্য। এখনকার কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ধৃতি করে, সে হাস্যস্পদ হয় ; কিন্তু হাফলি, টিঙাল বা ডারুইনের নাম করিলেই লোকে সে কথা একেবারে নির্বিচারে গলাধঃকরণ করে। হাফলি এই কথা বলিয়াছেন’- অনেকের পক্ষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট! আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে! আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার ; আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক ভাব আসিত ; আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার- অতি ঘৃণিত ধন, নাম-যশ বা ক্ষমতার উপাসনা। ইহাই প্রভেদ।

এখন পূর্বোক্ত পৌরাণিক গল্পগুলি সম্বন্ধে আবার আলোচনা করা যাউক। সকল গল্পের ভিতরেই এই একটি প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক কালের গবেষকগণ বোধ হয় যেন এই সিদ্ধান্ত একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ মনে করেন, তাঁহারা যেন এই সিদ্ধান্ত একেবারে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের(molluse) ক্রমবিকাশ-মাত্র, অতএব পূর্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমন্বয় করিতে সমর্থ। ভারতীয় পুরাণ-মতে সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবার পড়ে, পড়িয়া আবার উঠে, আবার পড়ে-এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। প্রত্যেক গতিই

চক্রাকারে হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলেও দেখা যাইবে, সহজ সরল ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ উৎপন্ন হইতে পারে না। ক্রমবিকাশ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে

ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদই বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে পরিমান শক্তি প্রয়োগ কর, উহা হইতে সেই পরিমান শক্তিই পাইতে পারো। অসৎ (কিছু-না) হইতে সৎ (কিছু) কখন হইতে পারে না। যদি মানব, পূর্ণ মানব, বুদ্ধ-মানব খ্রীষ্ট-মানব ক্ষুদ্র মাংসল জন্তু বিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ জন্তুকেও ক্রমসঙ্কুচিতবুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে ঐ মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? অসৎ হইতে তো কখন সৎ-এর উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি। যে-শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিনত হয়, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহা কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল; এবং যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মোলাস্ক বা প্রোটোপ্লাজম পর্যন্ত গিয়া উহাকেই আদিকারণ স্থির করিয়া থাকো, তবে ইহা নিশ্চিত যে উহাতেও ঐ শক্তি কোন না কোনরূপে অবস্থিত ছিল।

আজ কাল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছেঃ জড়পদার্থের সমষ্টি এই দেহই কি আত্মা চিন্তা প্রভৃতি বলিয়া কথিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথবা চিন্তাশক্তিই দেহের কারণ? অবশ্য জগতের সকল ধর্মই বলেন, চিন্তা বলিয়া পরিচিত শক্তিই শরীরকে ব্যক্ত করে- ইহার বিপরীত মত তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত^১ চিন্তা-শক্তি কেবল শরীর- নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষ ধরনের সন্নিবেশে উৎপন্ন। যদি এই দ্বিতীয় মতটি স্বীকার করিয়া লইয়া বলা যায়- এই আত্মা বা মন বা উহাকে যে আখ্যাই দাও না কেন, উহা এই জড়দেহরূপ যন্ত্রেরই ফলস্বরূপ, যে-সকল জড়পরমাণু মস্তিষ্ক ও শরীর গঠন করিতেছে, তাহাদেরই রাসায়নিক মিলন বা সাধারণ মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়-শরীর-গঠন কে করে? কোন শক্তি পদার্থের অনুগুলিকে শরীররূপে পরিণত করে? কোন শক্তি চারিদিকের জড়রাশি হইতে কিয়দংশ লইয়া তোমার শরীর একরূপে, আমার শরীর আর একরূপে গঠন করে? এই-সকল বিভিন্নতা কিসে হয়? আত্মা নামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক পরমাণুগুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে ‘গাড়ির পিছনে ঘোড়াজোতা’র ন্যায় হয়। কিরূপে এই সংযোগ হইল? কোন শক্তি উহা করিল? যদি বলা যায়, অন্য কোন শক্তি এই সংযোগ সাধন

করিয়েছে, আর আত্মা-যাহা এখন জড়রাশি-বিশেষের সহিত সংযুক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাই আবার ঐ জড়পরমানুসকলের সংযোগের ফলরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর হইল না। যে মত অন্যান্য মতকে খণ্ডন না করিয়া -সমুদয় না হউক, অধিকাংশ ঘটনা-অধিকাংশ বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাই গ্রহনযোগ্য। সুতরাং ইহাই বেশী যুক্তিসঙ্গত, যে-শক্তি জড়রাশি গ্রহন করিয়া তাহা হইতে শরীর গঠন করে আর যে-শক্তি শরীরের ভিতর প্রকাশিত রহিয়াছে, উভয়ে অভেদ। অতএব, যে চিন্তাশক্তি আমাদের দেহে প্রকাশিত হইতেছে, উহা কেবল জড় অনুর সংযোগে উৎপন্ন, সুতরাং তাহার দেহ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই-এ কথাই কোন অর্থ হয় না। আর শক্তি কখনও জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা বরং ইহা প্রদর্শন করা সম্ভব- যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অস্তিত্ব নাই, উহা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থামাত্র। কাঠিন্য প্রভৃতি জড়ের গুণসকল বিভিন্ন প্রকার গতি ও স্পন্দনের ফল-ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। জড় পরমানুর ভিতর প্রবল আবর্তগতি উৎপাদন করিলে উহা কঠিনপদার্থবৎ শক্তিলাভ করিবে। বায়ুরাশি যখন ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়, তখন উহা কঠিন পদার্থের মতো হইয়া যায়, কঠিন পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। -কেবল গতিশীলতা দ্বারাই উহাতে এই কাঠিন্য-ধর্ম উৎপন্ন হইবে। এই ভাবে বিচার করিলে ইহা প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, যাহাকে আমরা পদার্থ বলি, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই; কিন্তু বিপরীত মতটি প্রমাণ করা যায় না।

১ Comte's Positivism

শরীরের ভিতর এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইহা কি? আমরা সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারি, ঐ শক্তি যাহাই হউক, উহা জড়পরমানুগুলি লইয়া তাহা হইতে আকৃতি-বিশেষ-মনুষ্য-দেহ গঠন করিতেছে। আর কেহ আসিয়া তোমার আমার জন্য শরীর গঠন করে না। কখনও দেখি নাই-অপরে আমার হইয়া খাইতিছে। আমাকেই ঐ খাদ্যের সার শরীরে গ্রহন করিয়া তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি-সব কিছুই গঠন করিতে

হয়। কি এই রহস্যময় শক্তিটি? ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত মানুষের পক্ষে ভয়াবহ বোধ হয়; অনেকের পক্ষে উহা কেবল আনুমানিক ব্যাপারমাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং বর্তমানে কি হয়, সেইটিই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা এখন বিষয়টি আলোচনা করিব। সে শক্তিটি কি, যাহা এইক্ষণে আমার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছে? আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই এই শক্তিকে লোকে এই শরীরের মতো শরীরসম্পন্ন একটি জ্যোতির্ময় পদার্থ বলিয়া মনে করিত, তাহারা বিশ্বাস করিত—এই শরীর গেলেও উহা থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই, ঐ শক্তি জ্যোতির্ময় দেহমাত্র বলিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, আর একটি উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে—তাহা এই যে, ঐ জ্যোতির্ময় শরীর শক্তির প্রতিকল্প হইতে পারে না। যাহারই আকৃতি আছে, তাহাই কতকগুলি পরমাণুর সংযোগ মাত্র, সুতরাং উহাকে পরিচালিত করিতে অন্য কিছু প্রয়োজন। যদি এই শরীরের গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন হয়, তবে সেই কারণেই জ্যোতির্ময় দেহের গঠন ও পরিচালনে ঐ দেহের অতিরিক্ত অন্য কিছু প্রয়োজন হইবে। এই ‘অন্য কিছুই’ আত্মা শব্দে অভিহিত হইল। আত্মাই ঐ জ্যোতির্ময় দেহের মধ্য দিয়া যেন স্থূল শরীরের উপর কার্য করিতেছেন। ঐ জ্যোতির্ময় দেহই মনের আধার বলিয়া বিবেচিত হয়, আর আত্মা উহার অতীত। আত্মা মন নহেন, তিনি মনের উপর কার্য করেন এবং মনের মধ্য দিয়া শরীরের উপর কার্য করেন। তোমার একটি আত্মা আছে, আমার একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক এক একটি আত্মা আছে এবং একটি সূক্ষ্ম শরীরও আছে; ঐ সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে আমরা স্থূল দেহের উপর কার্য করিয়া থাকি। এখন এই আত্মা ও উহার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। শরীর ও মন হইতে পৃথক্ এই আত্মার স্বরূপ কি? অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইতে লাগিল, নানাবিধ সিদ্ধান্ত ও অনুমান হইতে লাগিল, নানাপ্রকার দার্শনিক অনুসন্ধান চলিতে লাগিল—এই আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আপনাদের নিকট সেগুলি বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন এই একটি বিষয়ে একমত দেখা যায় যে, আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, উহার কোন আকৃতি নাই, আর যাহার আকৃতি

নাই, তাহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। কাল মনের অন্তর্গত, দেশও মনের অন্তর্গত। কাল ব্যতীত কার্যকারণভাব থাকিতে পারে না। ক্রমানুবর্তিতার ভাব ব্যতীত কার্যকারণভাবও থাকিতে পারে না। অতএব দেশকালনিমিত্ত মনের অন্তর্গত, আর এই আত্মা মনের অতীত ও নিরাকার বলিয়া উহাও অবশ্য দেশকালনিমিত্তের অতীত। আর যদি উহা দেশকালনিমিত্তের অতীত হয় তাহা হইলে উহা অবশ্য অনন্ত হইবে। এইবার হিন্দুদর্শনের চূড়ান্ত বিচার আসিল। অনন্ত কখন দুইটি হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে একটি মাত্র আত্মা থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে-তোমার এক আত্মা, আমার এক আত্মা-ইহা সত্য নহে।

অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সেই এক অনন্ত ও সর্বব্যাপী, আর এই ব্যাবহারিক জীব মানুষের প্রকৃত স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। এই হিসাব পূর্বোক্ত পৌরাণিক তত্ত্বগুলিও সত্য হইতে পারে যে, ব্যাবহারিক জীব যত বড় হউক না কেন, তিনি মানুষের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুট প্রতিবিম্ব-মাত্র। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা কার্যকারণের অতীত বলিয়া, দেশকালের অতীত বলিয়া অবশ্যই মুক্তস্বভাব। তিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে বদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। এই ব্যাবহারিক জীব, এই প্রতিবিম্ব দেশকালনিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমাদের কোন কোন দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, ‘বোধ হয় তিনি যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বদ্ধ নন।’ আমাদের আত্মার ভিতরে যথার্থ সত্য এইটুকু-এই সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্যস্বভাব ; উহাই আমাদের স্বভাব-চেষ্টা করিয়া আর আমাদেরকে এরূপ হইতে হয় না। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত, সুতরাং জন্মমৃত্যুর প্রশ্ন আসিতেই পারে না। কতগুলি বালক পরীক্ষা দিতেছিল। পরীক্ষক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল-‘পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না?’ তিনি মহাকর্ষের নিয়ম প্রভৃতি উত্তর আশা করিতেছিলেন! অধিকাংশ বালক বালিকাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেহ কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর কিছু বলিয়া উত্তর দিল। তাহাদের মধ্যে এক বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল-‘কোথায় উহা পড়িবে?’ এই প্রশ্নই যে

ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায়? পৃথিবীর পক্ষে পতন বা উত্থান কিছুই নাই। অনন্ত দেশের উঁচু-নীচু বলিয়া কিছুই নাই। উহা কেবল আপেক্ষিক। অনন্ত কোথায়ই বা যাইবে, কোথা হইতেই বা আসিবে?

যখন মানুষ অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে, যখন সে দেহকে সীমাবদ্ধ-সুতরাং উৎপত্তি-বিনাশশীল জানিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়। দেহ আত্মা নয়, মনও আত্মা নয়, কারণ উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। জড় জগতের অতীত আত্মাই অনন্তকাল ধরিয়া থাকিতে পারেন। শরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল—এগুলি পরিবর্তনশীল ঘটনা-শ্রেণীর নামমাত্র; নদীর প্রত্যেক জলবিন্দুই নিয়ত-পরিবর্তনশীল প্রবাহের অন্তর্গত; তথাপি আমরা দেখিতেছি, উহা সেই একই নদী। এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুই নিয়ত-পরিবর্তনশীল; কোন ব্যক্তির শরীরই কয়েক মুহূর্তের জন্যও একইরূপ থাকে না। তথাপি মনের একপ্রকার সংস্কারবশতঃ আমরা উহাকে সেই এক শরীর বলিয়াই মনে করি। মন সম্বন্ধেও এইরূপ; উহা ক্ষণে সুখী, ক্ষণে দুঃখী ক্ষণে সবল, ক্ষণে দুর্বল! নিয়ত-পরিবর্তনশীল ঘূর্ণিবিশেষ! সুতরাং উহাও আত্মা হইতে পারে না, আত্মা অনন্ত। পরিবর্তন কেবল সসীম বস্তুতেই সম্ভব। অনন্তের কোনরূপ পরিবর্তন হওয়া—অসম্ভব কথা। তাহা কখনও হইতে পারে না। শরীর-হিসাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারি, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুই নিত্য-পরিবর্তনশীল; কিন্তু জগৎকে সমষ্টিরূপে ধরিলে উহাতে গতি বা পরিবর্তন অসম্ভব। গতি সর্বত্রই আপেক্ষিক। তুমি বা আমি যখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাই, তাহা অপর একটি স্থির বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে; জগতের কোন পরমাণু অপর একটি পরমাণুর সহিত তুলনায় পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু সমুদয় জগৎকে সমষ্টি-ভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহা স্থান পরিবর্তন করিবে? ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত তো আর কিছু নাই। অতএব এই অনন্ত ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ অপরিণামী অচল ও পূর্ণ, উহাই পারমার্থিক সত্তা—মানুষের যথার্থ স্বরূপ। সুতরাং সর্বব্যাপী অনন্তই সত্য, সান্ত সসীম সত্য নয়। আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব—এই ধারণা যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, ইহা পুরাতন ভ্রম মাত্র। যদি লোককে বলা যায়, তুমি সর্বব্যাপী অনন্ত পুরুষ, সে ভয় পায়।

সকলের ভিতর দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সকল চরণের দ্বারা তুমি চলিতেছ, সকল মুখের দ্বারা তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিকা দ্বারাই তুমি শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য নির্বাহ করিতেছ—লোককে ইহা বলিলে সে ভয় পায়। সে তোমায় পুংন পুংন বলিবে, এই ‘অহং’-জ্ঞান কখনও যাইবে না। লোকের এই ‘আমিত্ব’ কোনটি—তাহা দেখিতে পাইলে সুখী হই।

ছোট শিশুর গোঁফ নাই, বড় হইলে তাহার গোঁফ-দাড়ি হয়। যদি ‘আমিত্ব’ শরীরগত হয়, তবে তো বালকের ‘আমিত্ব’ নষ্ট হইয়া গেল। যদি ‘আমিত্ব’ শরীরগত হয়, আমার একটি চোখ বা হাত নষ্ট হইলে ‘আমিত্ব’ ও নষ্ট হইয়া গেল। মাতালের মদ ছাড়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার ‘আমিত্ব’ যাইবে! চোরের সাধু হওয়া উচিত নয় তাহা হইলে সে তাহার ‘আমিত্ব’ হারাইবে! অতএব কাহারও এই ভয়ে নিজ অভ্যাস ছাড়া উচিত নয়। অনন্ত ব্যতীত আর ‘আমিত্ব’ কিছুতেই নাই। এই অনন্তেরই কেবল পরিবর্তন হয় না, আর সবই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। ‘আমিত্ব’ স্মৃতিতেও নাই। ‘আমিত্ব’ যদি স্মৃতিতে থাকিত, তবে মস্তকে প্রবল আঘাত পাইয়া অতীত স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গেলে আমার ‘আমিত্ব’ নষ্ট হইত, আমি একেবারে লোপ পাইতাম! ছেলেবেলার দুই-তিন বৎসর আমার মনে নাই ; যদি স্মৃতির উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহা হইলে ঐ দুই-তিন বৎসর আমার অস্তিত্ব ছিল না—বলিতেই হইবে। তাহা হইলে আমার জীবনের যে অংশ আমার মনে নাই, সেই সময়ে আমি জীবিত ছিলাম না, বলিতে হইবে।

ইহা অবশ্য ‘আমিত্ব’-সম্বন্ধীয় খুব সঙ্কীর্ণ ধারণা। আমরা এখনও ‘আমি’ নহি! আমরা এই ‘আমিত্ব’—প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-লাভের চেষ্টা করিতেছি, উহা অনন্ত ; উহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। যাঁহার জীবন বিশ্বব্যাপী, তিনিই জীবিত, আর যতই আমরা আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ পদার্থে কেন্দ্রীভূত করি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই। আমাদের জীবন যতক্ষণ সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যতক্ষণ উহা অপরের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, ততক্ষণই আমরা জীবিত, আর এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জীবন-যাপনই মৃত্যু এবং এই জন্যই আমাদের মৃত্যুভয় দেখা দেয়। মৃত্যুভয় তখনই জয় করা যাইতে পারে, যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, যতদিন এই জগতে একটি জীবনও রহিয়াছে, ততদিন সেও

জীবিত। এরূপ উপলব্ধি হইলে মানুষ বলিতে পারে : ‘আমি সকল বস্তুতে, সকল দেহে বর্তমান; সকল জীবের মধ্যেই আমি বর্তমান। আমিই এই জগৎ, সমুদয় জগৎই আমার শরীর! যতদিন একটি পরমানু রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি? এইভাবেই মানুষ নির্ভীক অবস্থায় উপনীত হয়। নিয়ত-পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে অমরত্ব আছে, এ-কথা বলা বাতুলতা। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, আত্মা অনন্ত, সুতরাং আত্মাই ‘আমি’ হইতে পারেন। অনন্তকে ভাগ করা যাইতে পারে না—অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে না। এই এক অবিভক্ত সমষ্টিস্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ ‘আমি’, তিনিই ‘প্রকৃত মানুষ’। মানুষ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে, তাহা শুধু ঐ ‘আমি’কে ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফল মাত্র; আর আত্মাতে কখন ‘ক্রমবিকাশ’ থাকিতে পারে না। এই যে-সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পশু মানুষ হইতেছে—এ সকল কখন আত্মাতে হয় না। মনে কর, যেন একটি যবনিকা রহিয়াছে; আর উহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়া আমার সম্মুখস্থ কতকগুলি—কেবল কতকগুলি মুখ দেখিতে পাইতেছি। এই ছিদ্র যতই বড় হইতে থাকে, ততই সম্মুখের দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে, আর যখন ঐ ছিদ্রটি সমগ্র যবনিকা ব্যাপ্ত করে তখন আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। এস্থলে তোমাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই—তোমরা যাহা, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর সেই সঙ্গে তোমাদের প্রকাশ হইতেছিল। আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ। তুমি মুক্তস্বভাব ও পূর্ণই আছ। চেষ্টা করিয়া পূর্ণত্ব পাইতে হয় না। ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এই-সকল ধারণা কোথা হইতে আসিল? মানুষ ‘ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া বেড়ায় কেন? কেন সকল জাতির ভিতরে সকল সমাজেই মানুষ পূর্ণ আদর্শের অন্বেষণ করে—উহা মনুষ্যে, ঈশ্বরে বা অন্য যাহাতেই হউক? তাহার কারণ—পূর্ণ আদর্শ তোমার মধ্যেই বর্তমান। তোমার নিজের হৃদয়ই ধক্ ধক্ করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ বাহিরের কোন বস্তু এইরূপ শব্দ করিতেছে, তোমার নিজের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরই তোমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে, তাঁহার উপলব্ধি করিতে প্রেরণা দিতেছেন।

এখানে সেখানে, মন্দিরে গির্জায়, স্বর্গে মর্ত্যে, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে অন্বেষণ করিবার পর অবশেষে

আমরা যেখানে হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই বৃত্তপথে ঘুরিয়া আসি এবং দেখিতে পাই—যাঁহার জন্য আমরা সমুদয় জগতে অন্বেষণ করিতেছিলাম, যাঁহার জন্য আমরা মন্দির গির্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলাম, যাঁহাকে আমরা সুদূর আকাশে মেঘরাশি দ্বারা আবৃত অব্যক্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রাণের প্রাণ ; তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আত্মা। ‘তুমিই আমি—আমিই তুমি।’ ইহাই তোমার স্বরূপ—ইহাকে প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে না—তুমি পবিত্র-স্বরূপই আছ। তোমাকে পূর্ণ হইতে হইবে না—তুমি পূর্ণস্বরূপই আছ। সমুদয় প্রকৃতিই জবনিকার ন্যায় তাহার অন্তরালে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। তুমি যা কোন সৎচিন্তা বা সৎকার্য কর, তাহা যেন শুধু আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে, আর প্রকৃতির সেই অন্তরালে শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর প্রকাশিত হইতেছেন।

ইহাই মানুষের সমগ্র ইতিহাস। আবরণ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, তখন প্রকৃতির অন্তরালে আলোক নিজ স্বভাববশতই ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দীপ্ত হইতে থাকেন, কারণ তাঁহার স্বভাবই এইভাবে দীপ্তি পাওয়া। তাঁহাকে জানা যায় না, আমরা তাঁহাকে জানিতে বৃথাই চেষ্টা করি। যদি তিনি জ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাবের বিলোপ হইত, কারণ তিনি নিত্য-জ্ঞাতা। জ্ঞান তো সসীম ; কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে উহাকে জ্ঞেয়বস্তুরূপে-বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি তো সকল বস্তুর জ্ঞাতা-স্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মাস্বরূপ। বিষয় জ্ঞান যেন একটি নিম্নতর অবস্থা—একটা অধঃপতন। আমারই সেই আত্মা, আত্মা আবার জানিব কিরূপে? প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আত্মা এবং সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ঐ আত্মাকে জীবনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে ; তাহা না হইলে এই নীতি-পদ্ধতি কোথা হইতে আসিল? সমুদয় নীতিপ্রণালীর তাৎপর্য কি? সকল নীতিপ্রণালীতে একটি মূল ভাবই ভিন্ন

ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, ভাবটি অপরের উপকার করা মানবজাতির সকল সৎকর্মের মূল উদ্দেশ্য—মানুষ জীব জন্তু সকলের প্রতি দয়া। কিন্তু এ সবই

‘আমিই জগৎ, এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ’—এই চিরন্তন সত্যের বিভিন্ন ভাবমাত্র। তাহা না হইলে অপরের হিত করিবার যুক্তি কি? কেন আমি অপরের উপকার করিব? কিসে আমাকে অপরের উপকার করিতে বাধ্য করে? সর্বত্র সমদর্শনজনিত সহানুভূতির ভাব হইতেই এরূপ হইয়া থাকে। অতি কঠোর অন্তঃকরণও কখন কখন অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি এই আপাতপ্রতীয়মান ‘অহং’ প্রকৃতপক্ষে ভ্রমমাত্র, এই ভ্রমাত্মক ‘অহং’-এ আসক্ত থাকা অতি নীচ কার্য—যে ব্যক্তি এই-সকল কথা শুনিতে ভয় পায়, সেই ব্যক্তিই তোমাকে বলিবে, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই সকল নীতির ভিত্তি। কিন্তু পূর্ণ আত্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে? আত্মত্যাগ অর্থে এই আপাতপ্রতীয়মান ‘অহং’-এর ত্যাগ, সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা-বর্জন। এই অহঙ্কার ও মমতা পূর্ব কুসংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই ‘অহং’ ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা নিত্যস্বরূপে নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ, ইহাই সমুদয় নীতিশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্রস্বরূপ। মানুষ উহা জানুক আর নাই জানুক, সমুদয় জগৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে চলিয়াছে, অল্পাধিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকে। তাহারা উহা জ্ঞাতসারে করুক। এই ‘আমি’ ও ‘আমার’ প্রকৃত আত্মা নহে—ইহা জানিয়া তাহারা এই ত্যাগ আচরন করুক। এই ব্যবহারিক জীব সীমাবদ্ধ। এখন যাহাকে মানুষ বলা যাইতেছে, সে সেই জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাস মাত্র, সেই সর্বস্বরূপ অনন্ত অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাহার প্রকৃত স্বরূপ।

এই জ্ঞানের ফল—এই জ্ঞানের উপকারিতা কি? আজকাল সব বিষয়ই এই ফল—এই উপকার দেখিয়াই পরিমান করা হয়। অর্থাৎ মোট কথা এই—উহাতে কত টাকা, কত আনা, কত পয়সা হয়। লোকের এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কি অধিকার আছে? সত্য কি উপকার বা অর্থের মাপকাঠি লইয়া বিচারিত হইবে? মনে কর, উহাতে কোন উপকার

নাই, উহা কি কম সত্য হইয়া যাইবে? উপকার বা প্রয়োজন সত্যের নির্ণায়ক হইতে পারে না।^১ যাহা হউক, এই জ্ঞানে মহৎ উপকার এবং প্রয়োজন আছে।

১ Bentham's Utilitarianism and James' Pragmatism

আমরা দেখিতেছি সকলেই সুখের অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক নশ্বর মিথ্যা বস্তুতে উহা অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে কেহ কখনও সুখ পায় নাই। সুখ কেবল আত্মাতেই পাওয়া যায়। অতএব এই আত্মাতে সুখলাভ করাই মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। আর এককথা এই যে, অবিদ্যাই সকল দুঃখের প্রসূতি এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমরা মনে করি সেই অনন্ত স্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন ; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি যে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র ; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার মূল। যখনই আমি নিজেকে একটি ক্ষুদ্র দেহ বলিয়া মনে করি, তখনই—জগতের অন্যান্য শরীরের সুখদুঃখের দিকে না চাহিয়া আমি দেহটিকে রক্ষা করিতে এবং উহার সৌন্দর্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি। তখন তুমি আমি ভিন্ন হইয়া যাই। যখনই এই ভেদজ্ঞান দেখা দেয়-তখনই উহা সর্ব-প্রকার অমঙ্গলের দ্বার খুলিয়া দেয় এবং সর্বপ্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে। সুতরাং পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভে এই উপকার হইবে যে, যদি বর্তমান কালের মনুষ্য জাতির খুব সামান্য অংশও স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে ; নানাবিধ যন্ত্র এবং বাহ্য জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে কখনও হইবে না। যেমন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা আরও বর্ধিত হয়, তেমনি এগুলি দুঃখই বৃদ্ধি করে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যাবতীয় জড়ের জ্ঞান অগ্নিতে ঘৃতাভূতি মাত্র। জড়বিজ্ঞান—স্বার্থপর লোকের হাতে পরস্ব কাড়িয়া লইবার এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ না করিয়া অপরকে শোষণ করিবার আর একটি যন্ত্র তুলিয়া দেয় মাত্র।

আর এক প্রশ্ন—এই ভাব কি কার্যে পরিণত করা সম্ভব? বর্তমান সমাজে ইহা কি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই, সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক।

সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হইবে; সত্য কখনও সমাজের সহিত আপস করিবে না। নিঃস্বার্থপরতার ন্যায় একটি মহৎ সত্য যদি সমাজে কার্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস কর। তাহা হইলেই বুঝিব তুমি সাহসী। সাহস দুই প্রকারের—এক প্রকারের সাহস কামানের মুখে যাওয়া। আর এক প্রকার—আধ্যাত্মিক দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহস। একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট। সম্রাট তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং তিনি ঐ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, ‘আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি।’ সম্রাট বলিলেন, ‘আমি সমুদয় পৃথিবীর সম্রাট। আমি আপনাকে ধন ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদা প্রদান করিব।’ সাধু বলিলেন, ‘ঐশ্বর্য পদমর্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।’ তখন সম্রাট বলিলেন, ‘আপনি যদি আমার সহিত না যান, তবে আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।’ সাধু তখন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, ‘মহারাজ, তুমি যত কথা বলিলে তন্মধ্যে ইহাই দেখিতেছি মহা মূর্খের মতো কথা। তুমি আমাকে সংহার করিতে পার না? সূর্য আমায় শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি আমায় পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্রও আমাকে সংহার করিতে পারে না; কারণ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিত্যবিদ্যমান, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ আত্মা।’ ইহা আর এক প্রকারের সাহসিকতা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় একটি মুসলমান সৈনিক একজন মহাত্মা সন্ন্যাসীকে প্রচণ্ডভাবে অস্ত্রাঘাত করে। হিন্দু বিদ্রোহীগণ ঐ মুসলমানকে সন্ন্যাসীর নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল, ‘বলেন তো, ইহাকে হত্যা করি।’ কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার দিকে ফিরিয়া ‘ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই’ বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহসিকতা। যদি এমন ভাবে সমাজ গঠন গঠন না করিতে পারো যাহাতে সেই সর্বোচ্চ সত্য স্থান পায়, তাহা হইলে তোমরা আর বাহুবলের কি গৌরব কর? তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানগুলির কি গৌরব কর? তোমাদের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি গৌরব কর, যদি তোমরা কেবল দিবারাত্র বলিতে

থাকো-ইহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব? টাকা-আনা-পাই ছাড়া আর কিছুই কি কার্যকর নহে? যদি তাহাই হয়, তবে তোমাদের সমাজের এত গর্ব কর কেন?

সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে-ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ উচ্চতম সত্যের উপযুক্ত না হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। যত শীঘ্র করিতে পারো ততই মঙ্গল। হে নরনারীগণ, এই ভাব লইয়া দণ্ডায়মান হও, সত্যে বিশ্বাসী হইতে সাহসী হও, সত্য অভ্যাস করিতে সাহসী হও। জগতে কয়েক শত সাহসী নরনারীর প্রয়োজন। সাহসী হওয়া বড় কঠিন। সেই সাহসিকতা অভ্যাস কর, যে সাহসিকতা সত্যকে জানিতে চায় জীবনে সেই সত্য দেখাইতে পারে ; যাহা মৃত্যুকে ভয় পায় না, যাহা মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে, যাহাতে মানুষ জানিতে পারে, সে আত্মা, আর সমুদয় জগতের মধ্যে কোন অস্ত্রেরই সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, সমুদয় বজ্র মিলিলেও তাহাদের সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, জগতের সমুদয় অগ্নির সাধ্য নাই তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে-তবেই তুমি মুক্ত পুরুষ, তবেই তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিবে। ইহা এই সমাজে-প্রত্যেক সমাজেই অভ্যাস করিতে হইবে। ‘আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবন, পরে মনন, তৎপরে নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

আজকাল কর্ম বিষয়ে বেশী কথা বলা এবং চিন্তাকে উড়াইয়া দেওয়ার খুব ঝোঁক। কর্ম খুব ভালো বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রসূত। শরীরের ভিতর দিয়া ব্যক্ত শক্তির ক্ষুদ্র প্রকাশকেই কর্ম বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কার্য হইতে পারে না। মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তায়-উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, দিবারাত্র মনের সম্মুখে ঐগুলি স্থাপন কর, তাহা হইলেই বড় বড় কার্য হইবে। অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বলো-আমরা শুদ্ধস্বরূপ। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা জন্মিয়াছি, আমরা মরিব-এই চিন্তায় আমরা নিজেদের একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি এবং সেজন্য সর্বদাই একরূপ ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছি।

একটি আসন্নাপ্রসবা সিংহী একবার শিকার-অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সে দূরে একদল মেঘ চরিতেছে দেখিয়া যেমন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফ দিল, অমনি

তাহার মৃত্যু হইল, একটি মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেষদল তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, সে-ও মেষগনের সহিত একত্র বড় হইতে লাগিল, মেষগনের ন্যায় ঘাস খাইয়া প্রানধারণ করিতে লাগিল, মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল ; যদিও সে রীতিমত একটি সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। এইরূপে দিন যায়, এমন সময় আর একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহ শিকার-অন্বেষণে সেখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্চর্য হইল যে, ঐ মেষদলের মধ্যে একটি সিংহ রহিয়াছে, আর সে মেষধর্মী হইয়া বিপদের সম্ভাবনা-মাত্রেই পলাইয়া যাইতেছে। সিংহ উহার নিকট গিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল যে, সে সিংহ, মেষ নহে; কিন্তু যেমনি সে অগ্রসর হয়, অমনি মেষপাল পলাইয়া যায়—তাহাদের সঙ্গে মেষ-সিংহটিও পলায়। যাহা হউক, ঐ সিংহ মেষ-সিংহটিকে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। সে ঐ মেষ-সিংহটি কোথায় থাকে, কি করে, লক্ষ্য করিতে লাগিল। একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে; দেখিয়াই সে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, ‘ওহে, তুমি মেষপালের সঙ্গে থাকিয়া আপন স্বভাব ভুলিলে কেন? তুমি তো মেষ নও, তুমি যে সিংহ।’ মেষ-সিংহটি বলিয়া উঠিল, ‘কি বলিতেছ, আমি যে মেষ, সিংহ হইব কিরূপে?’ সে কোনমতে বিশ্বাস করিবে না যে, সে সিংহ, বরং সে মেষের মত চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া একটা হ্রদের দিকে লইয়া গেল, বলিল, ‘এই দেখ তোমার প্রতিবিশ্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিশ্ব।’ তখন সে সেই দুইটির তুলনা করিতে লাগিল। সে একবার সেই সিংহের দিকে, একবার নিজের প্রতিবিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে, সত্যি তো আমি সিংহ। তখন সে সিংহ-গর্জন করিতে লাগিল, তাহার মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল! তোমরা সিংহ-স্বরূপ—তোমরা আত্মা, শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতর। ‘হে সখে, কেন রোদন করিতেছ? জন্ম-মৃত্যু তোমার নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছ? তোমার রোগ-দুঃখ কিছুই নাই; তুমি অনন্ত-আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে।’

এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা জগতে অসৎ-ভাব দেখি কেন? কারণ আমরা নিজেরাই অসৎ। পথের ধারে একটি স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল,

সে ভাবিল—এ একজন পাহারাওয়ালা। নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটি শিশু উহাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরূপে উহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিলেও উহা সেই স্থাণু—শুদ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও সেইরূপ দেখিয়া থাকি। মনে কর ঘরে একটি শিশু আছে, এবং টেবিলের উপর এক থলে মোহর রহিয়াছে। একজন চোর আসিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহন করিল। শিশুটি কি বঝিতে পারিবে—উহা অপহৃত হইল? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরেও তাহাই দেখিয়া থাকি। শিশুটির মনে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। সকল জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ। জগতের পাপ-অত্যাচারের কথা বলিও না। বরং তোমাকে যে জগতে এখনও পাপ দেখিতে হইতেছে, সেজন্য রোদন কর। নিজে কাঁদো যে তোমাকে এখনও সর্বত্র পাপ দেখিতে হইতেছে। যদি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে আর জগতের উপর দোষারোপ করিও না, উহাকে আরও বেশী দুর্বল করিও না। এই-সকল পাপ দুঃখ প্রভৃতি আর কি?—এগুলি তো দুর্বলতারই ফল। মানুষ ছেলেবেলা হইতে শিক্ষা পায় যে, সে দুর্বল ও পাপী। জগত এইরূপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিখাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান—এমন কি যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহা তাহাদিগকে যথার্থ সাহায্য করিবে, যাহা তাহাদিগকে সবল করিবে, যাহাতে তাহাদের যথার্থ কল্যান হইবে। দুর্বলতা ও কর্মশক্তি-লোপকারী চিন্তা যেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে। সৎ-চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, নিজের মনকে সর্বদা বলো—‘আমি সেই, আমিই সেই’ ; তোমার মনে দিনরাত্রি ইহা সঙ্গীতের মতো বাজিতে থাকুক,

আর মৃত্যুর সময়েও ‘সোহহং, সোহহং’ বলিয়া দেহ ত্যাগ কর। ইহাই সত্য-জগতের অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে। যে কুসংস্কার তোমার মনকে আবৃত্ত রাখিয়াছে, তাহা দূর করিয়া দাও। সাহসী হও। সত্যকে জানিয়া তাহা জীবনে পরিণত কর। চরম লক্ষ অনেক দূর হইতে পারে, কিন্তু ‘উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।’

৩. মানুষের যথার্থ স্বরূপ (২)

মানুষের যথার্থ স্বরূপ (২)

[নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আমরা এখানে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, অনেক সময় আমরা বহু দূরে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করি। মানুষও যতদিন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততদিন এইরূপ করিতেছে। মানুষ সর্বদাই সম্মুখে—ভবিষ্যতে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিতেছে, সে জানিতে চাহে—এই শরীর ধ্বংস হইলে মানুষ কোথায় যায়। এই রহস্য-ভেদের জন্য বহু প্রকার মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, একের পর এক বহু মত উপস্থাপিত হইয়াছে, আবার শত শত মত খণ্ডিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, কতকগুলি গৃহীত হইয়াছে; আর যতদিন মানুষ এই জগতে বাস করিবে, যতদিন সে চিন্তা করিবে, ততদিন এইরূপ চলিবে। এই মতগুলির প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে, আবার সবগুলিতেই এমন অনেক কিছু আছে, যাহা সত্য নয়। এই সম্বন্ধে ভারতে যে-সকল অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহারই সার—তাহারই সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতীয় দার্শনিকগণের এই-সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিতে এবং যদি সম্ভব হয়, তাহাদের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

বেদান্তদর্শনের একটি উদ্দেশ্য—একত্বের অনুসন্ধান। হিন্দুগণ বিশেষের^১ প্রতি বড় মন দেন না; তাঁহারা সর্বদাই সামান্যের^২—শুধু তাহাই নহে—সর্বব্যাপী সার্বভৌম বস্তুর অন্বেষণ করিয়াছেন। ‘এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে জানিলে সবই জানা হয়?’—গবেষণার ইহাই একমাত্র বিষয়বস্তু। ‘যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে জগতের সমুদয় মৃত্তিকাকে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে জগতের সব কিছু জানা যাইবে?’ ইহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধান, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা।

তাহাদের মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে উহা একমাত্র ‘আকাশ’ নামক পদার্থে পর্যবসিত হয়। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু

দেখিতে পাই, স্পর্শ করি বা আশ্বাদ করি, এমন কি, আমরা যাহা কিছু অনুভব করি – সবই এই আকাশের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী। কঠিন, তরল, বাষ্পীয় সকল পদার্থ, সর্বপ্রকার আকৃতি ও শরীর, পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা—সবই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তি কার্য করিয়া তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি করিল? আকাশের সঙ্গে একটি সর্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। জগতে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি চিন্তাশক্তি পর্যন্ত ‘প্রাণ’ নামক একটি মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর কার্য করিয়া জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। কল্প-প্রারম্ভে এই প্রাণ যেন অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে সুপ্ত থাকে। আদিতে এই আকাশ গতিহীন অবস্থায় ছিল। পরে প্রানের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমুদ্র হইতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ-কত সূর্য কত চন্দ্র, কত তারা পৃথিবী মানুষ জন্তু উদ্ভিদ ও নানা শক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব হিন্দুদের মতে সর্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্বপ্রকার পদার্থ আকাশের বিভিন্ন রূপমাত্র। কল্পান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হইবে, সেই তরল পদার্থ আবার বাষ্পে পরিণত হইবে, তাহা আবার তেজরূপ ধারণ করিবে; অবশেষে সব কিছু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই আকাশে লীন হইবে। আর আকর্ষণ বিকর্ষণ গতি প্রভৃতি সমুদয় শক্তি ধীরে ধীরে মূল প্রাণে পর্যবসিত হইবে। কিছুকালের জন্য এই প্রাণ যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাকিবে; কল্প আরম্ভ হইলে আবার জাগ্রত হইয়া নানাবিধ রূপ প্রকাশ করিবে, কল্পাবসানে সকলই আবার লয় পাইবে। এইরূপে সৃষ্টি প্রণালি চলিয়াছে; আসিতেছে, যাইতেছে—একবার পশ্চাতে, আবার যেন সম্মুখের দিকে দুলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানরে ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—কিছুকাল স্থিতিশীল, কিছুকাল গতিশীল হইতেছে; একবার সুপ্ত আর একবার ক্রিয়াশীল হইতেছে। এইরূপ পরিবর্তন অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে।

১ Particular

২ General

কিন্তু এই বিশ্লেষণও আংশিক। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও এই পর্যন্ত জানিয়াছে। ইহার উপরে ঐ বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর যাইতে পারে না। কিন্তু এই অনুসন্ধানের এখানেই শেষ হয় না। এ পর্যন্ত আমরা এমন জিনিস পাই নাই, যাহা জানিলে সব জানা যায়। আমরা সমুদয় জগৎকে পদার্থ

ও শক্তিতে, অথবা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষায় বলিতে গেলে—আকাশ ও প্রাণে পর্যবসিত করিয়াছি। এখন আকাশ ও প্রাণকে উহাদের আদি কারণে পর্যবসিত করিতে হইবে। উহাদিগকে ‘মন’ নামক উচ্চতর ক্রিয়াশক্তিতে পর্যবসিত করা যাইতে পারে; ‘মহৎ’ বা সমষ্টি চিন্তাশক্তি হইতে প্রাণ ও আকাশ—উভয়ের উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই দুইটি শক্তিরূপে বিভক্ত হইয়া যায়। আদিতে এই সর্বব্যাপী মন ছিলেন। ইনিই পরিণত হইয়া আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ করিলেন, আর এই দুইটির সংযোগে ও মিলনে সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

এবার মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা যাক। আমি তোমাকে দেখিতেছি; চক্ষু দ্বারা বিষয় গৃহীত হইতেছে, উহা অনুভূতিজনক স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে। এই চক্ষু দর্শনের সাধন নহে, উহা বাহিরের যন্ত্রমাত্র; কারণ দর্শনের প্রকৃত সাধন—যাহা মস্তিষ্কে বিষয়-জ্ঞানের সংবাদ বহন করে, তাহা যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবে আমার বিশটি চক্ষু থাকিলেও তোমাদের কাহাকেও দেখিতে পাইব না। অক্ষিজালের(retina) উপর সম্পূর্ণ ছবি পড়িতে পারে, তথাপি আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। সুতরাং প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় এই চক্ষু হইতে পৃথক; প্রকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয় অবশ্য চক্ষু-যন্ত্রের পশ্চাতে অবস্থিত। সকল প্রকার বিষয়ানুভূতি সম্বন্ধেই এরূপ বুঝিতে হইবে। নাসিকা স্রাণেন্দ্রিয় নহে; উহা যন্ত্রমাত্র, উহার পশ্চাতে স্রাণেন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, প্রথমে এই স্থূল শরীরে

বাহ্যযন্ত্রগুলি অবস্থিত, তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থূল শরীরেই ইন্দ্রিয়গণও অবস্থিত। কিন্তু তথাপি যথেষ্ট হইল না। মনে কর আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটি ঘন্টা বাজিল, তুমি হয়তো সেই ঘন্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে না। ঐ শব্দতরঙ্গ তোমার কানে পৌঁছিয়া কর্ণপটহে লাগিল, স্নায়ুর দ্বারা ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছিল, কিন্তু তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? যদি মস্তিষ্কে সংবাদ-বহন পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলেনা কেন? তাহা হইলে দেখা গেল, এই শ্রবণ-প্রক্রিয়ার জন্য আরও কিছু আবশ্যিক-এ ক্ষেত্রে মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত ছিল না। যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক থাকে, ইন্দ্রিয় উহাতে যে-কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা গ্রহন করিবে না। যখন মন উহাতে যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদগ্রহন সম্ভব। কিন্তু উহাতেও বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। বাহিরের যন্ত্র সংবাদ আনিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে উহা বহন করিতে পারে, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না, আর একটি জিনিস আবশ্যিক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া আবশ্যিক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু যেন আমার অন্তরে সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহন করিয়া বুদ্ধির নিকট প্রেরণ করিল, বুদ্ধি পূর্বানুভূত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়াপ্রবাহ প্রেরণ করিল, ঐ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। মনে যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, তাহাকে বুদ্ধি বলে। তথাপি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর একটি ক্যামেরা(ম্যাজিক লর্ডন) রহিয়াছে, আর একটি বস্তুখণ্ড রহিয়াছে। আমি ঐ বস্তুখণ্ডের উপর একটি চিত্র ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামেরা হইতে নানা প্রকার আলোক-কিরন ঐ বস্তুখণ্ডের উপর ফেলিয়া ঐগুলি ঐ স্থানে একত্র করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটি অচল বস্তুর আবশ্যিক, যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব-কোন স্থির বস্তুর প্রয়োজন। আমি যা সকল আলোকরশ্মি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি সচল ; এই সচল আলোকরশ্মি কোন অচল বস্তুর উপর একত্র-একীভূত করিয়া মিলিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল

অনুভূতি ভিতরে লইয়া গিয়া মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। যতক্ষণ না এমন কোন স্থির বস্তু পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে পারা যায়, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্রে মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ এই বিষয়ানুভূতি-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কি সেই বস্তু, যাহা আমাদের পরিবর্তনশীল সত্তাকে একটি একত্বের ভাব প্রদান করে। কি সেই বস্তু, যাহা বিভিন্ন গতির ভিতরেও প্রতি মুহূর্তে ঐক্য রক্ষা করিয়া থাকে? কি সেই বস্তু যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি যেন একত্র গ্রথিত থাকে, যাহার উপর বিষয়গুলি আসিয়া যেন একত্র বাস করে এবং একটি অখণ্ড ভাব ধারণ করে? আমরা দেখিলাম, এমন একটি বস্তু আবশ্যিক, এবং শরীর-মনের তুলনায় সেই বস্তুটিকে স্থির হইতে হইবে। যে বস্তুখণ্ডের উপর ঐ ক্যামেরা চিত্রনিষ্ক্ষেপ করিতেছে, তাহা ঐ আলোকরশ্মির তুলনায় স্থির, নতুবা কোন চিত্র প্রক্ষিপ্ত হইবে না। অর্থাৎ অনুভবিতা একটি ‘ব্যক্তি’ হওয়া আবশ্যিক। এই বস্তু, যাহার উপর মন এই-সকল চিত্রাঙ্কন করিতেছে—যাহার উপর মন ও বুদ্ধি দ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের বিষয়ানুভূতিসকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র হয়, তাহাকেই মানুষের আত্মা বলে।

আমরা দেখিলাম, সমষ্টি-মন বা মহৎ-আকাশ ও প্রাণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, আর মনের পশ্চাতে আত্মা রহিয়াছেন। সমষ্টি-মনের পশ্চাতে যে আত্মা, তাঁহাকে ‘ঈশ্বর’ বলে। ব্যষ্টিতে ইহা মানবের আত্মা মাত্র। যেমন জগতে সমষ্টি-মন আকাশ ও প্রাণরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ সমষ্টি-আত্মাও মনরূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ব্যষ্টি-মানব সম্বন্ধেও কি ঐরূপ? মানুষেরও মন কি তাহার শরীরের স্রষ্টা, তাহার আত্মা তাহার মনের স্রষ্টা—অর্থাৎ মানুষের শরীর, মন ও আত্মা—তিনটি বিভিন্ন বস্তু, অথবা ইহারা একের ভিতরেই তিন, অথবা ইহারা এক পদার্থেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র? আমরা ক্রমশঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, আমরা এতক্ষণে এই পাইলাম—প্রথমতঃ এই স্থূলদেহ, তৎপশ্চাতে ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরও পশ্চাতে আত্মা। প্রথমতঃ আমরা পাইলাম, আত্মা শরীর হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্। এই স্থান হইতেই ধর্মজগতে মতভেদ দেখা যায়। দ্বৈতবাদী বলেন—আত্মা সগুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও ভোগের সব অনুভূতিই যথার্থতঃ আত্মার ধর্ম; অদ্বৈতবাদী বলেন—আত্মা নির্গুণ।

আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদীদের মত—আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণনা করিয়া পরে যে-মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে, তাহা বর্ণনা করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর-মন হইতে পৃথক্ বলিয়া এবং আকাশ ও প্রাণ দ্বারা গঠিত নয় বলিয়া অমর। কেন? মরত্বের বা নশ্বরত্বের অর্থ কি? যাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই নশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগ দ্বারা লব্ধ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে-পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন নয়, তাহা কখনও বিশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ কখনও হইতে পারে না, তাহা অবিনাশী; তাহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখনও সৃষ্টি হয়

নাই সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি—কেহ কখনও দেখে নাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এইমাত্র জানি যে, উহা পূর্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলন মাত্র। যদি তাহাই হইল, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্তকাল ধরিয়া ছিল এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। এই শরীর-পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন। বেদান্তবাদীদের মতে—যখন এই শরীরের পতন হয়, তখন মানবের ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় পায়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান। এই সূক্ষ্মশরীরেই মানুষের সমুদয় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি? মন যেন হৃদের তুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হৃদে তরঙ্গতুল্য। যেমন হৃদে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে-পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায় ; সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত হয় না ; উহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া যায়, উহাদের অস্তিত্ব থাকে, প্রয়োজন হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই স্মৃতি বলে। এইরূপে আমরা যাহাকিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে রহিয়াছে। সবগুলিই সুক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্তমান থাকে—উহারা আবার

সূক্ষ্মশরীরের উপর কার্য করিয়া থাকে। আত্মা এই-সকল সংস্কার এবং সূক্ষ্মশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান এবং এই বিভিন্ন সংস্কাররূপ বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে।

যাঁহারা অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা সূর্যরশ্মির অনুসরণ করেন; সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সূর্যালোকে উপনীত হন, তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হন; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এইস্থানে তাঁহারা সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা লাভ করেন ; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়; আর দ্বৈতবাদীদের মতে-তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস করেন অথবা অদ্বৈতবাদীদের মতে-

কল্পানবসানে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। যাঁহারা সকামভাবে সৎকার্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাঁহারা এখানে সূক্ষ্মশরীর-দেবশরীর লাভ করেন। তাঁহারা দেবতা হইয়া এখানে বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের পুরাতন কর্ম বলবান হয়, সুতরাং পুনরায় তাঁহাদের মর্ত্যলোকে জন্ম হয়। তাঁহারা বায়ুলোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে তাহার ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করে।

যাঁহারা অতিশয় দুর্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মনুষ্যগণের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়। তাহারা কিছুকাল ঐস্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়-আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পৌঁছিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতরে খুব সামান্য অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই

সূর্যকিরণ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাঁহারা মাঝারি রকমের লোক, যাঁহারা স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সৎকার্য করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেই-সকল ব্যক্তি সেইস্থানের স্বর্গে বাস করেন, সেখানে তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হয়। আর যাঁহারা অত্যন্ত অসৎ, তাঁহারা ভূত দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তাঁহাদের পর তাঁহারা পশু হয়; পরে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাদিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে ‘কর্মভূমি’ বলে। ভাল-মন্দ কর্ম সবই এখানে করিতে হয়। স্বর্গকাম হইয়া সৎকার্য করিলে মানুষ স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায় তিনি আর নূতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহার সৎকর্মের ফলভোগ করেন। আর এই সৎকর্ম যেমনি শেষ হইয়া যায়, অমনি তিনি জীবনে যে- সকল অসৎ

কর্ম করিয়াছিলেন তাঁহারা সমবেত ফল বেগে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার এই পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে যাঁহারা ভূত প্রেত হয়, তাঁহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম না করিয়াই কেবল অতীত কর্মের ফলভোগ করে, তাঁহাদের পর পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া সেখানেও কোন নতুন কর্ম করে না, তাঁহাদের পর তাঁহারা আবার মানুষ হয়।

মনে কর -কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কাজ করিল,কিন্তু একটি খুব ভাল কাজও করিল, তাহা হইলে সেই সৎকর্মের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্যের ফল শেষ হইবামাত্র অসৎ কর্মগুলিও তাঁহাদের ফল প্রদান করিবে। যাঁহারা কতকগুলি ভাল ও মহৎ কাজ করিয়াছে, কিন্তু যাঁহাদের জীবনের অভ্যাস বা আচরণ ঠিক নহে, তাঁহারা দেবতা হইবে। দেবদেহসম্পন্ন হইয়া দেবতাদের শক্তি কিছুকাল সম্ভোগ করিয়া আবার তাঁহাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। যখন সৎকর্মের শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন আবার সেই পুরাতন অসৎকার্যগুলির ফল ফলিতে থাকিবে। যাঁহারা অতিশয় অসৎকর্ম করে, তাঁহাদিগকে ভূতশরীর দানবশরীর গ্রহণ করিতে হইবে ; আর যখন ঐ অসৎকার্যগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তখন যে সৎকর্মটুকু অবশিষ্ট থাকে—তাহা দ্বারা তাঁহারা আবার মানুষ

হইবে। যে পথে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়, যেখান হইতে পতন বা প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে ‘দেবযান’ বলে আর চন্দ্রলোকের পথকে ‘পিতৃযান’ বলে।

অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এইখানেই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকে মুক্ত হইতে হইলে মানব জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানব-জন্মেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।

এখন এই মতের বিরোধী মত আলোচনা করা যাক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেন এই শরীর-মনের পশ্চাতে আত্মা বলিয়া একটি পদার্থ আছে, তাহা মানিবার আবশ্যিকতা কি? ‘এই শরীর ও মন-রূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ’ বলিলেই কি যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার একটি তৃতীয় পদার্থ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদূর পর্যন্ত অনুসন্ধান চলে, ততদূর বোধ হয়, এই শরীর ও মনরূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ, অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তত্ত্বটি এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনের অতিরিক্ত, অথচ শরীর-মনের আশ্রয়স্বরূপ আত্মা-নামক একটি পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনায় আবশ্যিকতা কি? শুধু শরীর-মন বলিলেই তো যথেষ্ট হয় ; নিয়ত পরিণামশীল জড়স্রোতের নাম ‘শরীর’, আর নিয়ত-পরিণামশীল চিন্তাস্রোতের নাম মন। এই দুয়ের একত্ব-প্রতীতি হইতেছে কিসের দ্বারা? বৌদ্ধ বলেন : এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটি জ্বলন্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাকো, একটি অগ্নির বৃত্তস্বরূপ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই ; জড়ের রাশি ক্রমাগত বহিয়া চলিয়াছে। সমুদয় জড়রাশিকে ‘এক’ বলিতে ইচ্ছা হয় বলা, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তাই ; প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক্। এই প্রবল চিন্তাস্রোতই এই একত্বের ভ্রম রাখিয়া যাইতেছে। সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যিকতা নাই। দেহ-মনের বিশ্বপ্রপঞ্চ এই জড়স্রোত ও এই চিন্তাস্রোত-কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে ; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু অনুমান করিও না। আধুনিক অনেক

সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজেদের আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধ-দর্শনেরই মোট কথাটা এই যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পর্যাণ্ড ; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সব—কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? সবই গুণসমষ্টি। এমন আনুমানিক পদার্থ কল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে? গুণরাশির দ্রুত আদানপ্রদানবশতই পদার্থের জ্ঞান হয়, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়। আমরা দেখিলাম এই যুক্তিগুলি কি চমৎকার! আর এগুলি মানবের অভিজ্ঞতাকে সহজেই নাড়া দেয়। বাস্তবিক লক্ষ্যে একজনও এই দৃশ্যজগতের অতীত কিছুর ধারণা করিতে পারে কি না সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্যপরিণামশীল। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই পটভূমি স্থ সেই স্থির সমুদ্রের সামান্য

আভাস পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গ মাত্র। তাহা হইলে আমরা দুইটি মত পাইলাম। একটি—এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে ; আর একটি মত—এই জগতে অচল অপরিণামী বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল পরিবর্তনশীল—পরিণামী ; পরিণাম ছাড়া কিছু নয়! যাহা হউক অদ্বৈতবাদেই এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী বলেনঃ ‘জগতের একটি অপরিণামী আশ্রয় আছে’—দ্বৈতবাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণাম কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকে আবার পরিণামিরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে, যতক্ষণ না একটি পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থায় ছিল, যখন উহা শান্ত ও নিঃশব্দ ছিল, যখন উহা বিপরীত শক্তির সাম্যাবস্থায়

ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃত পক্ষে কোন শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল না; কারণ বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তির জন্য দ্রুতবেগে চলিয়াছে যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে তবে এই বিষয়েই আছে। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন, কিন্তু উহা যে শরীর-মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীর-মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এ কথা বলা ভুল। বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমুদয় জগৎ পরিণামপ্রবাহ মাত্র—এ কথাও সত্য; কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক্, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথা যতদিন দ্বৈতভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিমাণশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা—এই জগৎ পরিণামীও বটে, আবার অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর—তিনটি পৃথক্ বস্তু নহে উহারা একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর ও মন উভয়ই কোথায় চলিয়া যায়! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি পরম শান্ত স্থিরভাব দেখিতে পান না; আর যিনি সেই পরম শান্তভাব

দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি ও চঞ্চলতা কোথায় চলিয়া যায়! সর্পে রজ্জুভ্রম হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলিয়া যায়, আর ভ্রান্তি দূর হইলে সে ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তখন তাঁহার পক্ষে সর্প আর থাকে না।

তাহা হইলে দেখা গেল, একটিমাত্র বস্তুই আছে—তাহাই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বলো আর বস্তুই বলো বা অন্য কিছুই বলো, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ ‘বহু’ প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর একটি তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে! তবে তরঙ্গকে পৃথক্ দেখিতেছে কেন? নাম ও রূপ-তরঙ্গের আকৃতি রূপ, আর আমরা উহাকে ‘তরঙ্গ’ এই যে নাম দিয়াছি, এই নাম-রূপই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। নাম-রূপ চলিয়া গেলেই তরঙ্গ যে সমুদ্র

ছিল, সেই সমুদ্রই হইয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমগ্র জগৎ এক সত্তা। নাম-রূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ জলকনার উপরে প্রতিবিম্ব হইয়া প্রত্যেক জলকনার উপরেই সূর্যের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তেমনি সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা অসংখ্য নাম-রূপের বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু স্বরূপতঃ উহা এক। বাস্তবিক ‘আমি’ বা ‘তুমি’ বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বলো—সবই আমি, না হয় বলো—সবই তুমি। দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ফল। বিচারজ্ঞানের উদয় হইলে মানুষ দেখিতে পায় দুইটি বস্তু নাই, একটি বস্তুই আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়—সে নিজেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নিষ্ঠুর নিত্যপূর্ণ নিত্যানন্দময়।

অতএব নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ অপরিণামী অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতে শুধু প্রতীত হইতেছে। উহার উপরে নাম-রূপ এই-সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কন করিয়াছে। রূপ বা আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটি মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে ততক্ষণ রূপ থাকে ; কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই ‘নাম-রূপকে’ই মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়া একজনকে আর একজন হইতে পৃথক্ মনে করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। ‘রূপে’র বা আকৃতির অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, একথাও বলা যায় না, কারণ উহাই এই-সকল ভেদ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নাম-রূপ—ইওরোপীয়গণের মতে দেশকাল নিমিত্ত—সেই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎসত্তা দেখাইতেছে, পরমার্থতঃ এই জগৎ এক অখণ্ড-স্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত কেহ দুইটি বস্তুর কল্পনা করেন ততদিন তিনি ভ্রান্ত। যখন তিনি

জানিতে পারেন—একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি ঠিক ঠিক জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে—কি জড় জগতে, কি মনোজগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে, সর্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রমাণ হইয়াছে যে তুমি আমি, সূর্য চন্দ্র তারা-এ-সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। যা শক্তিকনা কয়েক মাস পূর্বে সূর্যে ছিল, তাহা আজ হয়তো মনুষ্যের ভিতর আসিয়াছে, কাল হয়তো উহা পশুর ভিতরে, আবার পরশু হয়তো কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। সর্বদাই আসিতেছে, সর্বদা যাইতেছে। উহা একমাত্র অখণ্ড জড়রাশি-কেবল নাম-রূপে পৃথক্। উহার এক বিন্দুর নাম সূর্য, এক বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, এক বিন্দু মানুষ, এক বিন্দু পশু, এক বিন্দু উদ্ভিদ এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক; কারণ এই জড় রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর একভাবে দেখিলে চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক-একটি বিন্দু এক-একটি মন ; তুমি একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক-একটি মনমাত্র। আবার এই জগৎকে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হয়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকে নিত্যশুদ্ধ অপরিণামী অবিনাশী অখণ্ড পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হইবে।

তবে দ্বৈতবাদীর পরলোকবাদ—মানুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসৎলোকে ভূত হয়, পরে পশু হয়—এ-সব কথার কি হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন—কেহ আসেও না, কেহ যায়ও না—তোমার পক্ষে যাওয়া-আসা কিসে সম্ভব? তুমি অনন্তস্বরূপ, তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায়?

কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি ছোট ছোট বালক-বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে ঐ প্রশ্নটিও ছিল—পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন? অনেকেই প্রশ্নটি বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল—‘কোথায় পড়িবে?’ প্রশ্নটিই তো

ভুল। জগতে উঁচু-নীচু বলিয়া তো কিছুই নাই। উঁচু-নীচু জ্ঞান আপেক্ষিক মাত্র। আত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ। আত্মার জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন একেবারে অর্থহীন। কে যায়, কে আসে? তুমি কোথায় নাই? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূর্ব হইতেই অবস্থিত নও? মানুষের আত্মা সর্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে না? আত্মা তো সর্বত্র! সুতরাং জ্ঞানী বা সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে এই-সব শিশুর কল্পনা, এই জন্মমৃত্যুরূপ বালসুলভ ভ্রম, এই স্বর্গ নরক-সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় ; যাহারা প্রায়সিদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়; অজ্ঞানীর পক্ষে উহা থাকিয়া যায়।

স্বর্গে যাওয়া, মরা, জন্মগ্রহণ করা-পৃথিবীর সকলে এ-সব কথা বিশ্বাস করে কি করিয়া? আমি একখানি বই পড়িতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উলটাইয়া যাইতেছি! আর এক পৃষ্ঠা আসিল, তাহাও উলটানো হইল। কাহার পরিণাম হইতেছে? কে যায় আসে? আমি নই-ঐ বইটির পাতা উলটানো হইতেছে। সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখে একখানি পুস্তকের মতো। উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও উলটানো হইতেছে, নূতন দৃশ্য সম্মুখে আসিতেছে। উহাও পড়া হইয়া গেল এবং উলটানো হইল। আবার নূতন অধ্যায় আসিল ; কিন্তু আত্মা যেমন, তেমনই-অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতিই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছেন, আত্মা নহেন। আত্মার কখন পরিণাম হয় না।

জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নয়। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে-আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নয় ; যেমন ভ্রান্তিবশতঃ আমরা মনে করি-সূর্যই চলিতেছে পৃথিবী নয়। সুতরাং এ-সব কিছুই ভ্রান্তিমাত্র, যেমন আমরা ভ্রমবশত রেলগাড়ির পরিবর্তে মাঠকে সছল বলিয়া মনে করি। জন্ম-মৃত্যুর ভ্রান্তি ঠিক এইরূপ। যখন মানুষ কোন বিশেষ ভাবে থাকে, তখন সে ইহাকেই পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে; আর যাহারা ঐরূপ মনোভাবাসম্পন্ন, তাহারও ঠিক তাহাই দেখে! তোমার আমার মধ্যে বিভিন্ন স্তরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারও আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন দেখিতে পাইব না।

এই প্রকার চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন একই লোকে অবস্থিত প্রাণীকেই আমরা দেখিতে পাই। যে যন্ত্রগুলি এক সুরে বাঁধা সেইগুলির মধ্যে একটি বাজিলেই অন্যগুলি বাজিয়া উঠিবে। মনে কর, আমরা এখন যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা ‘মানবকম্পন’ নাম দিতে পারি ; যদি উহা পরিবর্তিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না, পরিবর্তে অন্যরূপ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে আসিবে—হয়তো দেবতা ও দেবজগৎ কিংবা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ ; কিন্তু ঐ সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারা প্রভৃতিরূপে, আবার দানবের দৃষ্টিতে ইহাই নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে, আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহে, তাহারা এই স্থানকেই স্বর্গরূপে দেখিবে। যাহারা সারা জীবন ভাবিতেছে, আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ় ঈশ্বরের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদের চিত্তে ঐ-বিষয়ই দেখিবে। এই জগৎই তাহাদের চক্ষে একটি বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে ; তাহারা দেখিবে—নানাপ্রকার পক্ষযুক্ত দেবদূত উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর ঈশ্বর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সবকিছুই মানুষের সৃষ্টি। অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন : দ্বৈতবাদীর কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ-সকল তাহার নিজেরাই সৃষ্টি। এই-সব লোক এই-সব দৈত্য, পূর্নজন্ম প্রভৃতি সবই রূপক, মানবজীবনও তাহাই। ঐগুলি কেবল রূপক, আর মানব জীবন সত্য—ইহা হইতে পারে না। মানুষ সর্বদাই এই ভুল করিতেছে। অন্যান্য জিনিস-যথা স্বর্গ নরক প্রভৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া

কোনমতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাত-প্রতীয়মান সবই রূপকমাত্র আর ‘আমরা শরীর’—এই জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা ; আমরা কখনই শরীর নহি, কখনও শরীর হইতেও পারি না। আমরা কেবল মানুষ—ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা। আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অন্তর্নিহিত আত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছি।

তুমি জন্ম হইতে পাপী ও অসৎ-এইটি সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। যিনি নিজে পাপী, তিনি কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন। মনে কর এখানে একটি শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক থলি মোহর রাখিলে। মনে কর একজন চোর আসিয়া ঐ মোহর লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্ধান-উভয়ই সমান; তাহার ভিতর চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু পাপ দেখিতে পান না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগতকে নরক রূপে দেখে; যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গ-রূপে দেখে; আর যাহারা পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা জগতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপে দর্শন করেন, তখনই কেবল তাঁহার দৃষ্টি হইতে আবরণ সরিয়া যায়, আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে সকল দুঃস্বপ্ন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল তাহা একবারে চলিয়া যায়, আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ দেবতা দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখন উর্ধ্বে, কখন নিম্নে, কখন পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কখন বা অন্যত্র অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান—বাস্তবিক তিনি সর্বব্যাপী, তিনি কালের অধীন নহেন, কাল তাঁহার অধীন, সমুদয় স্বর্গ তাহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন; আর মানুষ এ পর্যন্ত যত দেবতার উপাসনা করিয়াছে, সবই তাহার ভিতরে; মানুষ কোন দেবতার ভিতরে অবস্থিত নয়, মানুষই দেব-অসুর মানুষ-পশু উদ্ভিদ-প্রস্তর প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা, আর তখনই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট বিশ্বজগত অপেক্ষা পরিপূর্ণ, অনন্তকাল অপেক্ষা সীমাহীন এবং সর্বব্যাপী আকাশ অপেক্ষা সর্বব্যাপিরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মানুষ নির্ভয় হইয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। তখন সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়, সব দুঃখ দূর হইয়া যায়, সব

ভয় একবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। তখন জন্ম কোথায় চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায়; দুঃখ চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সুখও চলিয়া যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাহার সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎই যেন অন্তর্হিত হয়। এই যে শক্তিরশির নিয়ত সংগ্রাম-

নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, আর যাহা শক্তি ও পদার্থরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টা রূপে ও যাহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বর্গ-পৃথিবী উদ্ভিদ-পশু মানুষ-দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সব এক অনন্ত অচ্ছেদ্য অপরিণামী সত্তারূপে পরিণত হয়; আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান—তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ। যেমন আকাশে নানা বর্ণের মেঘ আসিয়া খানিকখন খেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ এই আত্মার সম্মুখে পৃথিবী স্বর্গ চন্দ্রলোক দেবতা সুখদুঃখ প্রভৃতি আসিতেছে, কিন্তু উহারা সেই অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কখন পরিণামপ্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণামপ্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি—আমরা অপবিত্র আমরা সান্ত; আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মানুষ এই এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ।

এখন দুইটি প্রশ্ন দেখা দিতেছে। প্রথমটি এই—অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্যন্ত মতের কথা হইল; কিন্তু অপারোক্ষানুভূতি কি সম্ভব? হাঁ, সম্পূর্ণই সম্ভব। পৃথিবীতে এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা কি এই প্রকার উপলব্ধির পরক্ষণেই মরিয়া যান? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয়। একটি কাষ্ঠদণ্ডে সংযোযিত দুইটি চাকা একত্র চলিতেছে। যদি আমি একখানি চাকা ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠদণ্ডটিকে কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে চাকাখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে; কিন্তু অপর চাকার উপর পূর্বার্জিত গতিবেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যাইবে। পূর্ণ শুদ্ধস্বরূপ আত্মা যান একখানি চাকা, আর শরীরমনরূপ ভ্রান্তি আর একটি চাকা কর্মরূপ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা যোজিত, জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটির সংযোগদণ্ড ছিন্ন করিয়া দেয়। যখন আত্মারূপ চাকা থামিয়া

যাইবে, তখন আত্মা আসিতেছেন, যাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্মমৃত্যু হইতেছে—এ-সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যক্ত হইবে; আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিতভাব, অভাব, বাসনা—সব চলিয়া যাইবে; তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ণ—বাসনারহিত। কিন্তু শরীরমন-রূপ অপর চাকার প্রাক্তন কর্মের বেগ থাকিবে। সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন

কর্মের বেগ একেবারে নিবৃত্ত হয়, ততদিন উহারা থাকিবে; ঐ বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীর-মনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন। তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা নাই, এমন কি ব্রহ্মলোকে গমন পর্যন্ত নাই; কারণ তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এ-অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও এই সংসারদৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি ‘জীবনুক্ত’ বলিয়া কথিত হন। এই জীবনুক্ত অবস্থা লাভ করাই বেদান্ত-সাধকের লক্ষ্য।

এক সময়ে আমি ভারত-মহাসাগরের উপকূলে পশ্চিমভারতের মরুখণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়া পদব্রজে মরুভূমিতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন দেখিয়া আশ্চর্য হইতাম যে, চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর হ্রদ রহিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত, আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীতভাবে পড়িয়া নড়িতেছে। মনে মনে বলিতাম : কি অদ্ভুত দৃশ্য! লোকে ইহাকে মরুভূমি বলে! এই-সকল অদ্ভুত হ্রদ ও বৃক্ষরাজি দেখিয়া একমাস ভ্রমণ করিলাম। একদিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত হওয়ায় আমার একটু জল খাইবার ইচ্ছা হইল, সুতরাং আমি ঐ সুন্দর নির্মল হ্রদসমূহের একটির দিকে অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা অদৃশ্য হইল, আর আমার মনে তখন এই জ্ঞানের উদয় হইল, যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারাজীবন পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এ সেই মরীচিকা! আর সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিল—এই সারা মাস প্রত্যহই আমি মরীচিকাই দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানিতাম না যে ইহা মরীচিকা। তার পরদিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্বের মতই হ্রদ দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও হইতে লাগিল যে উহা মরীচিকা—সত্য হ্রদ নহে। এই জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ।

আমরা প্রতিদিন প্রতিমাস প্রতিবৎসর এই জগৎ-রূপ মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। একদিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, কিন্তু উহা আবার দেখা দিবে। শরীর প্রাক্তন কর্মের অধীন থাকিবে, সুতরাং ঐ মরীচিকা

ফিরিয়া আসিবে। যতদিন আমরা কর্ম দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্মুখে আসিবে। নর নারী, পশু উদ্ভিদ, আসক্তি কর্তব্য—সব আসিবে, কিন্তু উহারা পূর্বের মতো আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না। এই নূতন জ্ঞানের প্রভাবে কর্মের শক্তি নষ্ট হইবে, উহার বিষ দূরীভূত হইবে; জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে; কারণ যেমন জগৎ দেখা যাইবে, তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার প্রভেদজ্ঞানও দেখা দিবে।

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না। তবে এইরূপ জ্ঞান-সাধনে একটি বিপদের আশঙ্কা আছে। আমরা দেখিতে পাই, প্রতি দেশেই লোকে এই বেদান্তদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে, ‘আমি ধর্মাধর্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত, সুতরাং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।’ এই দেশেই দেখিবে, অনেক নির্বোধ ব্যক্তি বলিয়া থাকে, ‘আমি বদ্ধ নহি, আমি সয়ং ঈশ্বরস্বরূপ; আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।’ ইহা ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা শারীরিক মানসিক বা নৈতিক—সর্বপ্রকার নিয়মের অতীত। ইহা সত্য যে, নিয়মের মধ্যেই বন্ধন, নিয়মের বাহিরে মুক্তি। ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা তাহার জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব, আর আত্মার যথার্থ মুক্তস্বভাব জড়ের আবরণের মধ্য দিয়া মানুষের আপাত প্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হইতেছে। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্তই তুমি নিজেকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা নিজেকে মুক্ত অনুভব না করিয়া এক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, কথা কহিতে পারি না, কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসও ফেলিতে পারি না। কিন্তু আবার অল্প চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা যন্ত্রের মতো, আমরা মুক্ত নহি। তবে কোন্টি সত্য? এই যে ‘আমি মুক্ত’—এই ধারণাটিই কি ভ্রমাত্মক! একদল বলেন ‘আমি মুক্ত-স্বভাব’ এই ধারণা ভ্রমাত্মক, আবার অপর দল বলেন—‘আমি বদ্ধভাবাপন্ন’ এই

ধারণাই ভ্রমাত্মক। ইহা কিভাবে সম্ভব? মানুষ প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। মানুষ পরমার্থতঃ মুক্ত ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; কিন্তু যখনই তিনি মায়ার জগতে আসেন, যখনই তিনি নাম-রূপের মধ্যে পড়েন, তখনই তিনি বদ্ধ হইয়া যান। ‘স্বাধীন ইচ্ছা’—কথাটিই

ভুল। ইচ্ছা কখনও স্বাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া হইবে? প্রকৃত মানুষ যখন বদ্ধ হইয়া যান, তখনই তাঁহার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহার পূর্বে নহে। মানুষের ইচ্ছা বদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু উহার মূল অধিষ্ঠান নিত্যকালের জন্য মুক্ত। সুতরাং বন্ধনের অবস্থাতেও এই মনুষ্যজীবনেই হউক, দেবজীবনেই হউক, স্বর্গে অবস্থানকালেই হউক, আর মর্ত্যে অবস্থানকালেই হউক, আমাদের বিধিভুক্ত অধিকারস্বরূপ এই মুক্তির স্মৃতি থাকিয়া যায়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই সেই মুক্তির দিকেই চলিয়াছি। যখন মানুষ মুক্তিলাভ করে, তখন আর সে নিয়মের দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারে? জগতের কোন নিয়মই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। কারন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যে তাহার।

মানুষ তখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। হয় বলো—তিনিই সমুদয় জগৎ, না হয় বলো—তাঁহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী-পুরুষবোধ, দেশবিদেশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে? তিনি কিরূপে বলিবেন—আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী অথবা আমি বালক? এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি জানিয়াছেন—এ-সব মিথ্যা। তখন তিনি এইগুলি পুরুষের অধিকার, এইগুলি নারীর অধিকার—একথা কিরূপে বলিবেন? কাহারও কিছুই অধিকার নাই, কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই; আত্মা লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্ধ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী, অথবা আমি অমুক-দেশবাসী—এরূপ বলা মিথ্যা কথা মাত্র। সারা পৃথিবী আমার দেশ, সমুদয় জগৎই আমার; কারন ইহারই দ্বারা আমি নিজেকে আবৃত্ত করিয়াছি, জগৎই আমার শরীর হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—অনেক লোকে বিচারের সময় এইসব কথা বলিয়া কার্যের সময় অপবিত্র কার্য করিয়া বেড়ায়; আর যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ‘কেন তোমরা এইরূপ করিতেছ?’ তাহারা উত্তর দিবে, ‘এ তোমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমাদের দ্বারা কোন অন্যায় কার্য হওয়া অসম্ভব।’ এই সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় এই— যদিও ভালো-মন্দ উভয়ই আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি অসৎ-ভাব আত্মার বাহ্য আবরণ, আর সৎ-ভাব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা—তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতর আবরণ। যতদিন না মানুষ ‘অসৎ’-এর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছে, ততদিন সৎ-এর স্তরে পৌঁছিতেই পারিবে না; আর যতদিন না মানুষ সদসৎ উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছে, ততদিন আত্মার নিকট

পৌছিতেই পারিবে না । আত্মার নিকট পৌছিলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অতি সামান্য কর্ম, অতীত জীবনের কার্যের অতি সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ শুভকর্মেরই বেগ। যতদিন না অসৎ কর্মের গতিবেগ একে বারে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন না পূর্বের অপবিত্রতা একেবারে দক্ষ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং যিনি আত্মার নিকট পৌছিয়াছেন, যিনি সত্য কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল অতীত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত কর্ম করিলেও তিনি কেবল সৎ কর্ম করেন; তাঁহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্বাদ বর্ষণ করে, তাঁহার হস্ত কেবল সৎকার্যই করিয়া থাকে, তাঁহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ, তাঁহার উপস্থিতিই—তিনি যেখানেই যান না কেন—সর্বত্র মানবজাতির মহাকল্যাণকর। এরূপ ব্যক্তির দ্বারা কোন অসৎকর্ম কি সম্ভব? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত ‘প্রত্যক্ষানুভূতি’ এবং ‘শুধু মুখে বলা’র মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা বলিয়া থাকে। তোতাপাখিও ঐরূপ বকিয়া থাকে। মুখে বলা এক, উপলব্ধি আর এক। দর্শন-মতামত-বিচার, শাস্ত্র-মন্দির-সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছুই মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে ও-সব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী, কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তারপর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন দেখিতে পাইবে কত প্রভেদ ! সুতরাং যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর উহা বুঝিবার জন্য যুক্তিতর্ক প্রভৃতি মানসিক ব্যায়ামের আশ্রয় লইতে হয় না। উহা তাঁহাদের মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে—উহা তাঁহাদের জীবনের জীবন। বেদান্তবাদীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার ‘করামলকবৎ’ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকারীরা অসঙ্কোচে বলিতে পারেন, ‘এই যে, আত্মা রহিয়াছে’।

তুমি

তাঁহাদের সহিত যতই তর্ক কর না কেন, তাঁহারা তোমার কথায় শুধু হাসিবেন, তাঁহারা উহা শিশুর আবোল-তাবোল বলিয়া মনে করিবেন। শিশুর আধ-আধ কথায় তাঁহারা বাধা দেন না। তাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া ‘ভরপুর’ হইয়া আছেন। মনে কর তুমি একটি

দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর আর একজন ব্যক্তি তোমার নিকট আসিয়া তর্ক করিতে লাগিল—ঐ দেশের কখন অস্তিত্ব ছিল না; এইভাবে সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার এই মনোভাব হইবে যে, এই ব্যক্তি উন্মাদাগারে যাইবারই উপযুক্ত। এইরূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন ‘জগতে ধর্ম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনা যায়, সে-সকল কেবল শিশুর আধ আধ কথামাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্মের সার কথা।’ ধর্ম উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি উহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ? তুমি কি ধর্ম উপলব্ধি করিতে চাও? যদি তুমি ঠিক ঠিক চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইবে। যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট, কিন্তু যে বলে, ‘আমি ধর্ম বিশ্বাস করি’, অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।

পরবর্তী প্রশ্ন এই যে—উপলব্ধির পরে কি হয়? মনে কর উপলব্ধি করিলাম—আমরা জগতের এক অখণ্ড সত্তা, আমরাই যে সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ; মনে কর, আমরা জানিতে পারিলাম—আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন; এইরূপ জানিতে পারিলে আমাদের কি হইবে? তাহা হইলে আমরা কি এক কোণে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া মরিয়া যাইব? ইহা দ্বারা জগতের কি উপকার হইবে? আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন! প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করি, উহা দ্বারা জগতের উপকার হইবে কেন? ইহার কি কোন যুক্তি আছে? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে,—ইহাতে কি জগতের উপকার হইবে? ইহার অর্থ কি? ছোট ছেলে মিষ্টান্ন ভালবাসে। মনে কর, তুমি তড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ; শিশু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায়?’ তুমি বলিলে, ‘না’। ‘তবে ইহাতে কি উপকার হইবে?’ তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপ্ত দেখিলেও লোকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, ‘ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে?’ ‘না।’ ‘তবে ইহাতে আর উপকার কি?’ জগতের হিত করা অর্থে মানুষ এইরূপই বুঝিয়া থাকে। তথাপি ধর্মের এই প্রত্যক্ষানুভূতিই জগতের যথার্থ উপকার করিয়া থাকে। লোকের ভয় হয়, যখন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, যখন

সে উপলব্ধি করিবে-সবই এক, তখন তাহার প্রেমের প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইবে; জীবনের যাহা কিছু মূল্যবান্ সব চলিয়া যাইবে ; ইহজীবনে ও পরজীবনে তাহাদের ভালোবাসার আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু লোকে একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে-সকল ব্যক্তি নিজ সুখচিন্তায় একরূপ উদাসীন, তাঁহারাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী হইয়াছেন। তখনই মানুষ যথার্থ ভালোবাসে, যখন সে দেখিতে পায়- তাহার ভালোবাসার জিনিস কোন ক্ষুদ্র মর্ত্য জীব নহে। তখনই মানুষ যথার্থ ভালোবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পাই-তাহার ভালোবাসার পাত্র খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নহে, তাহার প্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী যদি ভাবেন -স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। তবে তিনি স্বামীকে আরও অধিক ভালোবাসিবেন। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালোবাসিবেন,যদি তিনি জানিতে পারেন -স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেইরূপ মাতাও সন্তানগণকে বেশী ভালোবাসিবেন, যিনি সন্তানগণকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন। যিনি জানেন-ঐ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি তাহার মহাশত্রুকেও ভালোবাসিবেন। যিনি জানেন-সাধু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তিনি সাধুকেও ভালোবাসিবেন। সেই লোকই আবার অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভালোবাসিসেন, যদি তিনি জানেন- অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিয়াছেন। যাঁহার জীবনে এই ক্ষুদ্র ‘অহং’ একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঈশ্বর সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিছেন, সেই ব্যক্তি পৃথিবীকে নাড়া দিয়া যান। তাঁহার নিকট সমুদয় জগৎ সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রতিভাত হয়। দুঃখকর ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোলমাল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। যেখানে আমরা প্রতিদিন একটুকরো রুটির জন্য ঝগড়া-মারামারি করি- সেই জগৎ তখন তাহার পক্ষে কারাগার না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তখন জগৎ কি সুন্দর ভাবই না ধারণ করিবে! এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে-‘এই জগৎ কি সুন্দর !’ তিনিই কেবল বলিতে পারেন যে সবই মঙ্গল-

স্বরূপ। এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহৎ কল্যাণ হইবে যে, সকল বিবাদ গুণ্ণগোল দূর হইয়া পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে। যদি সকল মানুষ আজ এই মহান্ সত্যের এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে সারা পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিবে; অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তি

জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে; উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘৃণা, সকল প্রকার ঈর্ষা এবং সকল প্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন, তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে। আর যখন দেবতায় দেবতায় খেলা, যখন দেবতায় দেবতায় কাজ, যখন দেবতায় দেবতায় প্রেম, তখন কি আর অশুভ থাকিতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সুফল। সমাজে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিবে। তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলিয়া দেখিবেনা; ইহাই প্রথম মহালাভ। তখন তোমরা আর কোন অন্যায়কারী দরিদ্র নরনারীর দিকে ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগন, যে-দুঃখিনী নারী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, আপনারা আর তাহার দিকে ঘৃণাপূর্বক দৃষ্টিপাত করিবেন না; কারণ আপনারা সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবেন। তখন আপনাদের মনে আর ঈর্ষা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাব উদিত হইবে না; ঐ-সবই চলিয়া যাইবে। তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মাবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করিতে আর চারুকের প্রয়োজন হইবে না।

যদি পৃথিবীর নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগও শুধু চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণের জন্যও বলেন, ‘তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানবগন, পশুগন, সর্বপ্রকার প্রাণিগন, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ’, তাহা হইলে আধ ঘন্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন চতুর্দিকে ঘৃণার বীজ নিক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ বিস্তার না করিয়া সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে—সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি তোমার মধ্যে অশুভ না থাকিলে তুমি কেমন করিয়া অশুভ দেখিবে? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে? তুমি নিজে খুনী না হইলে

খুনীকে দেখিবে কিরূপে? সাধু হও, তাহা হইলে তোমার অসাধু-ভাব একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। সমগ্র মানব জাতির পক্ষে ইহাই মহৎ লাভ।

ভারতে প্রাচীনকালে এই-সকল ভাব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে অনেকে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদাতা গুরুগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই-সকল চিন্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে পায় নাই। তাহা না হইলেও এগুলি মহাসত্য; যেখানেই এগুলির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, সেখানেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইতেছে। এইরূপ একজন দেবপ্রকৃতির মানুষের দ্বারা আমার সমুদয় জীবন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; ইহার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব। এখন এইসকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্য দার্শনিক পুস্তকগুলিকে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া, ঐগুলি সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে; যাহাতে ঐ-সকল ভাব সাধু পাপী আবালবৃদ্ধবনিতা শিক্ষিত অশিক্ষিত -সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তখন এই-সকল ভাব জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসে যে-বায়ু গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক তালে তালে ধ্বনিত হইবে-‘তত্ত্বমসি’। এই অসংখ্য চন্দ্রসূর্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে ভাষণক্ষম প্রত্যেক জীবের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হইবে-‘তত্ত্বমসি’।

৪. মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ

মায়া ও ঈশ্বর-ধারণার ক্রমাবকাশ

[লগনে প্রদত্ত বক্তৃতা : ২০ অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্তের অন্যতম মূলভিত্তিস্বরূপ মায়াবাদ অস্ফুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর উপনিষদে যে-সকল তত্ত্ব খুব পরিস্ফুট ভাবে ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে তাহার সবগুলিই কোন না কোন আকারে বর্তমান। আপনারা অনেকেই এতদিনে মায়াবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেক সময়ে লোকে ভুলবশতঃ মায়াকে ‘ভ্রম’ বলিয়া ব্যাখ্যা করে; অতএব তাঁহারা যখন জগৎকে মায়া বলেন, তখন উহাকেও ‘ভ্রম’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মায়াকে ভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করা ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপবর্ণনা মাত্র। সেই মায়াকে বুঝিতে হইলে আমাদের সংহিতা পর্যন্ত যাইতে হইবে এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহাও দেখিতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতা-জ্ঞান কিরূপে আসিল। বুঝিয়াছি, এই দেবতার প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষমাত্র ছিলেন। গ্রীক, হিব্রু, পারসী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতার আমাদের দৃষ্টিতে যে-সকল কার্য অতীব ঘৃণিত, সেই-সকল কার্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া আপনারা অনেকে ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই যে, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দির মানুষ, আর এই-সব দেবতা অনেক সহস্র বৎসর পূর্বের জীব; আমরা ইহাও ভুলিয়া যাই যে, ঐ-সকল দেবতার উপাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রে অসঙ্গত কিছু দেখিতে পাইতেন না, তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না, কারণ সেই-সকল দেবতা তাঁহাদেরই মতো ছিলেন। সারা জীবন ধরিয়া আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শ অনুসারে নয়। তাহা না করিয়া আমরা

আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা অপরের বিচার করিয়া থাকি। এরূপ করা উচিত নয়। আমাদের চারিপাশের মানুষের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্বদাই এই ভুল করি, আর আমার ধারণা অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ-বিসংবাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণেই হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, এবং অপরের আদর্শ আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা, অপরের উদ্দেশ্য আমাদের নিজ উদ্দেশ্য দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়তো কোন বিশেষ কার্য করিতে পারি, আর যখন দেখি-আর একজন লোক সেইরূপ কার্য করিতেছে, মনে করিয়া লই তাহারও সেই একই উদ্দেশ্য; আমার মনে একবারও এ-কথা একবারও উদিত হয় না যে, ফল সমান হইলেও অন্য বহু কারণ সেই ফল প্রসব করিতে পারে। আমি যে কারণে সেই কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তিনি সেই কার্য অন্য উদ্দেশ্যে করিতে পারেন। সুতরাং ঐ-সকল প্রাচীন ধর্ম বিচার করিবার সময় আমরা যেন আমাদের মানসিক প্রবণতা দ্বারা বিচার না করি; আমরা যেন সেই প্রাচীনকালের জীবন ও চিন্তাধারার ভাবে নিজদিগকে ভাবিত করিয়া বিচার করি।

ওল্ড টেস্টামেন্টের নিষ্ঠুর জিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীত হয়; কিন্তু কেন? লোকের এরূপ কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন য়াহুদীদিগের জিহোভা আজকালকার ঈশ্বরের মতো হইবেন? আবার আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমরা যে ভাবে প্রাচীনদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণায় হাসিয়া থাকি, আমাদের পরে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা আমাদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ধারণাগুলিকেও সেইভাবে উপহাস করিবেন। তাহা হইলেও এই-সকল বিভিন্ন ঈশ্বর-ধারণার মধ্যে সংযোগসাধক একটি সুবর্ণ-সূত্র বিদ্যমান, আর বেদান্তের উদ্দেশ্য-সেই সূত্র আবিষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-“ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন এ সূত্রে গ্রথিত, সেইরূপ এই-সকল বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও একটি সূত্র রহিয়াছে।” আর আধুনিক ধারণানুসারে সেগুলি যতই বীভৎস ভয়ানক বা ঘৃণিত বলিয়া মনে হউক না কেন, বেদান্তের কর্তব্য-ঐ-সকল ধারণা ও বর্তমান ধারণাগুলির ভিতর এই যোগসূত্র আবিষ্কার করা। অতীতকালের পটভূমিকায় সেগুলি বেশ সঙ্গতই ছিল, আমাদের বর্তমান ভাব ও ধারণা হইতে সেগুলি বেশী বীভৎস ছিল না। যখন আমরা

প্রাচীন পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তখনই শুধু ঐগুলির বীভৎসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাচীন পরিবেশ এখন তো আর নাই। যেমন প্রাচীন যাহুদী বর্তমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি যাহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্যেরা আধুনিক বুদ্ধিমান হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন, সেইরূপ জিহোভার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে। আমরা এইটুকু ভুল করি যে, আমরা উপাসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু উপাস্যের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না। উন্নতির জন্য উপাসকদিগকে আমরা যেটুকু প্রশংসা করি, উপাস্য ঈশ্বরকে সেটুকু করি না। কথাটা এই—তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্যোতক বলিয়া ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও উন্নতি হইয়াছে। তোমাদের আশ্চর্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা ঈশ্বরের ও উন্নতি হয়! তোমাদের ভাব—ঈশ্বরের উন্নতি হয় না, তিনি অপরিবর্তনীয়। এইভাবে তো ইহাও বলা যায় যে, প্রকৃত মানুষেরও কখন উন্নতি হয় না। আমরা পরে দেখিব—এই মানুষের ভিতর যে প্রকৃত মানুষ রহিয়াছেন, তিনি অচল অপরিণামী শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যেমন এই মানুষ সেই প্রকৃত মানুষের ছায়ামাত্র, সেইরূপ আমাদের ঈশ্বর-ধারণা আমাদের মনেরই সৃষ্টি; উহা সেই প্রকৃত ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশ- আভাসমাত্র। ঐ-সকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি নিত্য-শুদ্ধ অপরিণামী। কিন্তু ঐ সকল আংশিক প্রকাশ সর্বদাই পরিণামশীল—ঐগুলি উহাদের অন্তরালে অবস্থিত সত্যের ক্রমাভিব্যক্তি মাত্র; সেই সত্য যখন অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়, তখন উহাকে উন্নতি, আর উহার অধিকাংশ আবৃত থাকিলে তাহাকে অবনতি বলে। এইরূপে যেমন আমাদের উন্নতি হয়, তেমনি দেবতারও উন্নতি হয়। সাধারণ সোজাভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বরূপের যেমন প্রকাশ হয়, তেমনি দেবগণও তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন।

১ গীতা, ৭। ৭

এখন আমরা মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব। পৃথিবীর সকল ধর্মই এক প্রশ্ন করিয়াছেন : জগতে এই অসামঞ্জস্য কেন? এই অশুভ কেন? আমরা ধর্মভাবের প্রথম আরম্ভের সময় এই প্রশ্ন দেখিতে পাই না; তাহার কারণ—আদিম মনুষ্যের পক্ষে জগৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতুর্দিকে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের কোন প্রতিদ্বন্দিতা ছিল না। কেবল তাহার হৃদয়ে দুইটি জিনিসের সংগ্রাম হইত। একটি বলিত—‘এই কাজ কর’ আর এক বলিত—‘করিও না।’ আদিম মানুষ আবেগপ্রবণ ছিল। তাহার মনে যাহা উদিত হইত, সে তাহাই করিত। সে নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উহা সংযত করিবার চেষ্টা মোটেই করিত না। এই—সকল দেবতা সম্বন্ধেও সেইরূপ; ইহারাও আবেগের অধীন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্যবল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন জিহোভা কাহারও প্রতি সম্ভ্রষ্ট, কাহারও প্রতি বা রুষ্ট; কেন—তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। ইহার কারণ, মানুষের তখনও অনুসন্ধানের অভ্যাসই হয় নাই; সুতরাং সে যাহা করে, তাহাই ভাল। তখন ভালমন্দের কোন ধারনাই হয় নাই। আমরা যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কাজ করিতেছেন; বেদে দেখিতে পাই—ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা অনেক মন্দ কাজ করিতেছেন, কিন্তু ইন্দের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে সেগুলি পাপ বা অসৎ বলিয়া মনেই হইত না, সুতরাং তাহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করিত না।

নৈতিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এক যুদ্ধ বাধিল ; মানুষের ভিতরে যেন একটি নূতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছে; কেহ বলেন, উহা ঈশ্বরের বাণী; কেহ বলেন—উহা পূর্বশিক্ষার ফল। যাহা হউক, উহা প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য করিয়াছিল। আমাদের মনের একটি প্রবৃত্তি বলে—‘এই কাজ কর’ আর এক বলে—‘করিও না।’ আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে; আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর একটি স্বর বলিতেছে—‘বাহিরে যাইও না’। এই দুইটি ব্যাপার দুইটি সুন্দর সংস্কৃত শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি।

প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম আরম্ভ হয় এই ‘করিও না’ হইতে ; আধ্যাত্মিকতাও ঐ ‘করিও না’ হইতেই আরম্ভ হয়। যেখানে এই ‘করিও না’ নাই, সেখানে ধর্মের আরম্ভই হয় নাই, বুঝিতে হইবে। যুধ্যমান দেবতার উপাসনা সত্ত্বেও এই ‘করিও না’ বা নিবৃত্তির ভাবের জন্য মানুষের ধারণা উন্নত হইতে লাগিল।

এখন মানুষের হৃদয়ে একটু ভালোবাসা জাগিল। অবশ্য খুব অল্প ভালোবাসাই তাহাদের হৃদয়ে আসিয়া ছিল, আর এখনও যে উহা বড় বেশী তাহা নহে। প্রথম উহা ‘জাতি’তে আবদ্ধ ছিল। এই দেবগণ কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়কেই মাত্র ভালোবাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতা-মাত্রই ছিলেন, কেবল সেই বিশেষ জাতির রক্ষকমাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন বংশের লোকেরা নিজদিগকে তাঁহাদের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে কতকগুলি জাতি ছিল, এখনও আছে, যাহারা নিজদিগকে সূর্য ও চন্দ্রের বংশধর বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে আপনারা সূর্যবংশের বড় বড় বীর সম্রাটগণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইহারা প্রথমে চন্দ্র-সূর্যের উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ তাঁহারা নিজদিগকে ঐ চন্দ্র-সূর্যের বংশধর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং যখন এই ‘জাতীয়’-ভাব আসিতে লাগিল, তখন একটু ভালোবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কর্তব্যের ভাব আসিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল; আর অমনি এই ভাবও আসিতে লাগিল—‘আমরা পরস্পরের দোষ সহ্য ও ক্ষমা না করিয়া কিরূপে একত্র বাস করিতে পারি?’ মানুষ কি করিয়া অন্ততঃ কোন না কোন সময়ে নিজমনের প্রবৃত্তি সংযত না করিয়া অপরের—এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত বাস করিতে পারে? উহা অসম্ভব। এইরূপেই সংঘের ভাব আসে। এই সংঘের ভাবের উপর সমগ্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আর আমরা জানি, যে নর বা নারী এই সহিষ্ণুতা বা ক্ষমারূপ মহতী শিক্ষা আয়ত্ত করেন নাই, তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন।

অতএব যখন এইরূপ ধর্মের ভাব আসিল, তখন মনে কিছু উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাস আসিল। তখন তাঁহাদের ঐ প্রাচীন দেবতাগণকে—চঞ্চল, যুধ্যমান, মদ্যপায়ী, গোমাংসভুক্ দেবগণকে—যাঁহাদের পোড়া মাংসের গন্ধ এবং তীব্র সুরার আত্মিতেই পরম আনন্দ হইত—কেমন সামঞ্জস্যহীন ঠেকিতে লাগিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ-বেদে বর্ণিত আছে যে, কখন কখন ইন্দ্র হয়তো এত মদ্যপান করিয়াছেন যে, তিনি মাটিতে পড়িয়া অবোধ্যভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতাকে সহ্য করা আর লোকের পক্ষে সম্ভব হইল না। তখন উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইল; দেবতাদেরও কার্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু হইল। অমুক দেবতার অমুক কার্যের হেতু কি? কোন হেতুই পাওয়া গেল না, সুতরাং লোকে এই-সকল দেবতা পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহারা দেবতা সম্বন্ধে আরও উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল। তাহারা দেবতাদের কার্যগুলির মধ্যে যেগুলি ভাল, যেগুলি তাহারা সামঞ্জস্য করিতে পারিল, সেগুলি সব একত্র করিল; আর যেগুলি বুঝিতে পারিল না বা যেগুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না সেগুলিকেও পৃথক্ করিল; এই ভাল ভাবগুলির সমষ্টিকে তাহারা ‘দেবদেব’ এই আখ্যা প্রদান করিল। তাহাদের উপাস্য দেবতা তখন কেবলমাত্র শক্তির প্রতীক রহিলেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইল। তিনি নীতি-পরায়ণ দেবতা হইলেন; তিনি মানুষকে ভালবাসিতে লাগিলেন, তিনি মানুষের হিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ধারণা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল। তাহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা ও শক্তি বর্ধিত করিল মাত্র। জগতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং একরূপ সর্বশক্তিমান হইলেন।

কিন্তু জোড়াতালি দিয়া বেশী দিন চলে না। যেমন জগদ্রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, তেমনি ঐ রহস্য যেন আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল। দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ যেভাবে বাড়িতে লাগিল, সন্দেহ তদপেক্ষা বহুগুণ বাড়িতে লাগিল। যখন লোকের জিহোভা নামক নির্ধুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তখন সেই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামঞ্জস্যবিধান করিতে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হইল, তাহার সহিত জগতের সামঞ্জস্যসাধন করা কঠিনতর হইয়া পড়িল।

সর্বশক্তিমান ও প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে এইরূপ পৈশাচিক ঘটনা কেন ঘটে? কেন সুখ অপেক্ষা দুঃখ এত বেশী? সাধু ভাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধু ভাব এত বেশী কেন? আমরা এসব দেখিব না—বলিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু তাহাতে জগৎ যে বীভৎস, এ সত্য কিছুই পরিবর্তিত হয় না। খুব ভালো বলিলে বলিতে হয়, এই জগৎ ট্যান্টালাসের^১ নরকস্বরূপ, তাহা অপেক্ষা ইহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবলতর বাসনা রহিয়াছে, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ ওঠে—তাহাতে আমাদের কোন কার্যে অগ্রসর করিয়া দেয়, আর আমরা একপদ যেই অগ্রসর হই, অমনি বাধা পাই। আমরা সকলেই ট্যান্টালাসের মতো এই জগতে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে বাধ্য। অতীন্দ্রিয় আদর্শসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে আসিতেছে, কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিতে পাই, সেগুলিকে কখনই কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় না, বরং আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থাচক্রে পিষ্ট হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে পরিণত হই। আবার যদি আমি এই আদর্শের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবল সাংসারিকভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন যাপন করিতে হয়, এবং আমি অবনত হইয়া যাই। সুতরাং কোনদিকেই সুখ নাই। যাহারা এই জগতে জন্মাইয়া জাগতিক জীবনেই সন্তুষ্ট থাকিতে চায়, তাহাদেরও অদৃষ্টে দুঃখ। যাহারা আবার সত্যের জন্য—এই পশু-জীবন অপেক্ষা কিছু উন্নত জীবনের জন্য—অগ্রসর হইতে সাহস করে, উচ্চতর আদর্শ আকাজক্ষা করে, তাহাদের আবার সহস্রগুণ দুঃখ। ইহা বাস্তব ঘটনা; ইহার কোন ব্যাখ্যা নাই, কোন ব্যাখ্যা থাকিতে পারে না। তবে বেদান্ত এই সংসার হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। মাঝে মাঝে আমাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইবে, যাহাতে তোমরা ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহা বলি তাহা স্মরণ রাখিও, উহা বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারাত্র ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগকে সত্য বুঝিতে এবং জীবনে সত্য পালন করিতে সমর্থ করিবে।

এই জগৎ যে ট্যান্টালাসের নরকস্বরূপ, ইহা সত্য ঘটনার বর্ণনা মাত্র,—আমরা এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না ; আবার জানি না, এ-কথাও বলিতে পারি না। যখন মনে

করি আমি জানি না, তখন বলিতে পারি না এই বন্ধন আছে। সবটাই আমার মাথার ভুল হইতে পারে। আমি হয়তো সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছি। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, তোমরা আমার কথা শুনিতেছ। কেহই প্রমাণ করিতে পারে না, যে ইহা স্বপ্ন নয়। ‘আমার মস্তিষ্ক’ ইহাও একটি স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিক তো নিজের মস্তিষ্ক কেহ কখন দেখে নাই। আমরা সকলেই উহা মানিয়া লই। সকল ব্যাপারে এইরূপ। আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময় কুহেলিকা, এই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ—কোথায় মিশিয়াছে, কেহ জানে না। আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি—অর্ধনিদ্রিত, অর্ধজাগরিত, সারা জীবন এক অস্পষ্টতায় কাটিয়া যায়—ইহাই আমাদের প্রত্যেকের নিয়তি! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঐ নিয়তি। সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের—যাহাদিগকে লইয়া আমাদের এত অহংকার, তাহাদেরও এই নিয়তি এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বজগৎ।

১ গ্রীকপুরানে বর্ণিত ট্যান্টালাসের কাহিনী—তথ্যপঞ্জী দ্রষ্টব্য

ভূতই বলো, আত্মাই বলো, মনই বলো, আর যাহাই বলো না কেন, যে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার সেই একই—আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অস্তিত্ব আছে; উহাদের অস্তিত্ব নাই এ—কথাও বলিতে পারি না। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। এই আলো-অন্ধকারে খেলা, এই এলোমেলো অবিচ্ছেদ্য ভাব সর্বদা রহিয়াছে। সমুদয় ব্যাপার একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আবার বোধ হইতেছে মিথ্যা। একবার বোধ হইতেছে আমরা জাগরিত, একই কালে মনে হইতেছে আমরা নিদ্রিত। ইহা ঘটনার বর্ণনা—ইহাকেই মায়া বলে। আমরা এই মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাতেই চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, মায়াতেই সাধু; শুধু তাহাই নহে, আমরা

এই মায়াতেই কখন দানব, কখনও বা দেবতা হইতেছি। ভাব ও ধারণাকে যতদূর পারো বিস্তৃত কর, উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে ‘অনন্ত’ অথবা যে-কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয় দাও, ঐ ধারণাও ঐ মায়ারই ভিতরে। অন্যরূপ হইতেই পারে না ; আর মানুষের সমস্ত জ্ঞান-কেবল বিশেষ ধারণা হইতে সামান্যে আসা, উহার প্রতীয়মান স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করা এই মায়া নামরূপের কার্য। যে-কোন বস্তুরই আকৃতি আছে, যাহা কিছু তোমার মনের মধ্যে কোনপ্রকার ভাব জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত। জার্মান দার্শনিকগণ বলেন—সবই দেশ-কাল-নিমিত্তের অধীন, আর উহাই মায়া!

ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই প্রাচীন ধারণায় একটু ফিরিয়া যাই। পূর্বে সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, একজন ঈশ্বর আমাদের অনন্তকাল ধরিয়া ভালোবাসিতেছেন—একজন অনন্ত সর্বশক্তিমান ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন। পূর্বোক্ত এই ঈশ্বর-ধারণা মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। কোথায় তোমার ন্যায়পরায়ণ দয়াময় ঈশ্বর? দার্শনিক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কি মনুষ্য বা পশুরূপী তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতেছেন না? কারণ এমন কে আছে, যে এক মুহূর্তও অপরকে না মারিয়া জীবনধারণ করিতে পারে? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া একটি নিঃশ্বাসও গ্রহণ করিতে পারো? লক্ষ লক্ষ জীব মরিতেছে বলিয়া তুমি জীবিত রহিয়াছ। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত, প্রত্যেক নিঃশ্বাস—যাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সহস্র সহস্র জীবের মৃত্যুস্বরূপ এবং তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুস্বরূপ। কেন তাহারা মরিবে? এ সম্বন্ধে পুরাতন মিথ্যায়ুক্তি—‘উহারা তো অতি নীচ জীব।’ মনে কর যেন তাহাই হইল—যদিও উহা অমীমাংসিত বিষয়, কারণ কে বলিতে পারে—কীট মনুষ্য অপেক্ষা বড়, না মনুষ্য কীট অপেক্ষা উচ্চতর? কে প্রমাণ করিতে পারে—এটি ঠিক, কি ওটি ঠিক? যাক সে কথা, তাহারা অতি নিম্নস্তরের জীব ধরিয়া লইলেও তাহারা মরিবে কেন? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই তো বাঁচিয়া থাকা বেশী দরকার। কেন তাহারা বাঁচিবে না? তাহাদের জীবন ইন্দ্রিয়েই বেশী আবদ্ধ, সুতরাং তোমার আমার অপেক্ষা সহস্রগুণ সুখ-দুঃখ বোধ করে। কুকুর বাঘ যেরূপ তৃপ্তি সহকারে ভোজন করে, আমরা কি সেরূপ করি? করি না, কারণ আমাদের কর্মশক্তি শুধু ইন্দ্রিয়ে

নহে, বুদ্ধিতে-আত্মায়। কিন্তু পশুদের প্রাণ ইন্দ্রিয়েই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য উন্মত্ত হয়; তাহারা এত আনন্দের সহিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবে যে, মানুষ সেরূপ কল্পনাও করিতে পারে না; আর এই সুখও যতখানি, দুঃখও তাহার সমপরিমাণ।

যতখানি সুখ, ততখানি দুঃখ। যদি মনুষ্যের প্রাণীরা এত তীব্রভাবে সুখ অনুভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য যে তাহাদের দুঃখবোধও তেমনি তীব্র-মনুষ্যের অপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্রতর, তথাপি তাহাদিগকে মরিতে হইবে! তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, মানুষ মরিতে যত কষ্ট অনুভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার শতগুণ কষ্ট ভোগ করিবে; তথাপি তাহাদের কষ্টের বিষয় না ভাবিয়া আমরা তাহাদিগকে হত্যা করি। ইহাই মায়া। আর যদি আমরা মনে করি-একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মতো, যিনি সব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ যে-সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতি, যাহাতে বলে মন্দের মধ্যে হইতে ভালো হইতেছে, তাহা যথেষ্ট হয় না। হউক না শত সহস্র উপকার-মন্দের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে? এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য অপরের গলা কাটিব। সুতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। কেন মন্দের মধ্য দিয়া ভালো হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু এই প্রশ্নের তো উত্তর দেওয়া যায় না; ভারতীয় দর্শণ ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সকল প্রকার ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে বেদান্তই অধিকতর সাহসের সহিত সত্য-অন্বেষণে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্ত মাঝখানে এক জায়গায় গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক সুবিধাও ছিল। বেদান্তধর্মের বিকাশের সময় পুরোহিত-সম্প্রদায় সত্যান্বেষণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখতে চেষ্টা করেন নাই। ধর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ভারতে সঙ্কীর্ণতা ছিল-সামাজিক প্রণালীতে। এখানে (ইংলণ্ডে) সমাজ খুব স্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ধর্মমত সম্বন্ধে ছিল। এখানে লোকে পোশাক যেরূপ পরুক না কেন, কিম্বা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না; কিন্তু চার্চে একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই, নানা

কথা উঠে। সত্য চিন্তার সময় তাঁহাকে আগে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হয়। পূর্বপুরুষেরা যেরূপ পোশাক পরিতেন, তাহা হইতে একটু পৃথক্ৰূপ পোশাক পরিলেই ব্যস, তাহার সর্বনাশ! আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ি দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত হইয়াছিল। আচ্ছা, মানিয়া লইলাম ইহা সত্য নহে। কিন্তু আবার ধর্মবিষয়ে দেখিতে পাই—নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ, সকল রকমের ধর্ম, সকল রকমের মত, অদ্ভুত রকমের ভয়ানক মত লোকে প্রচার করিতেছে, শিক্ষাও পাইতেছে, এমন কি, মন্দিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণেরা জড়বাদিগণকেও দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন! তাঁহাদের এই উদারতা অবশ্য স্বীকার্য।

বুদ্ধ খুব বৃদ্ধবয়সেই দেহরক্ষা করেন। আমার একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বন্ধু বুদ্ধদেবের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভালোবাসিতেন। তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুটি ভালোবাসিতেন না; কারণ বুদ্ধদেব ত্রুশে বিদ্ধ হন নাই। কি ভুল ধারণা! বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে! ভারতে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধদেব ভারতের দেবদেবী, এমন কি জগদীশ্বরকে পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াও বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, আর তিনি অর্ধেক দেশকে তাঁহার ধর্মে আনিয়াছিলেন।

চার্বাকেরা ভয়ানক মত প্রচার করিতেন—উনবিংশ শতাব্দিতেও লোক এরূপ স্পষ্ট জড়বাদ প্রচার করিতে সাহস করে না। এই চার্বাকগণ মন্দিরে মন্দিরে নগরে নগরে প্রচার করিতেন : ধর্ম মিথ্যা, উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরদের রচনা—ঈশ্বর নাই, আত্মাও নাই। যদি আত্মা থাকে, তবে স্ত্রী-পুত্রের ভালোবাসার আকর্ষণে কেন ফিরিয়া আসে না। তাঁহাদের এই ধারণা ছিল যে, যদি আত্মা থাকে, তবে মৃত্যুর পরও তাহার ভালোবাসা থাকে; ভালো খাইতে, ভালো পড়িতে চায়। এইরূপ ধারণা সত্ত্বেও কেহই চার্বাকদিগের উপরে কোন অত্যাচার করে নাই।

আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম,তাহার ফলস্বরূপ এখনও আমরা ধর্মজগতে মহাশক্তির অধিকারী।তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ,তাহার ফলে তোমাদের অতি সুন্দর সামাজিক প্রণালী। আমরা সামাজিক উন্নতি-বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই,সুতরাং আমাদের সমাজ সঙ্কীর্ণ।তোমরা ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই,ধর্মবিষয়ে প্রচলিত মতের ব্যাতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক, তরবারি বাহির হইত! তাহার ফল—ইওরোপে ধর্মভাব সঙ্কীর্ণ।ভারতে সমাজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, আর ইওরোপে ধর্মের শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে হইবে। তবেই উন্নতি হইবে। যদি আমরা এই আধ্যাত্মিক নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তই ধর্মভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম আমাদের জীবনের প্রতি কার্যে প্রবেশ করিবে—ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেই-সব আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদান্তের আলোকে তোমরা বুঝিবে—সব বিজ্ঞান কেবল ধর্মেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র; জগতের আর সব জিনিসও ঐরূপ।

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাকাতেই ইওরোপে এই-সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; সকল সমাজেই দুইটি বিভিন্ন দল দেখিতে পাওয়া যায়। একদল জড়বাদী, বিরুদ্ধবাদী, আর একদল নিশ্চিত-বাদী সংগঠনকারী। মনে কর সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল উঠিয়া গালাগালি করিতে আরম্ভ করিল। ইহারা অনেক সময় গোঁড়া হইয়া দাঁড়ায়। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে; আর মেয়েরা প্রায়ই এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। যে-কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহারই দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙা সহজ; একজন পাগল সহজে যাহা ইচ্ছা ভাঙিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহারা মনে করে—কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভালো করিবে। তাহাদের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় বটে, তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক

তাহারা অনিষ্টই বেশী করিয়া থাকে। কোন জিনিস তো আর একদিনে হয় না। সমাজ একদিনে নির্মিত হয় নাই, আর পরিবর্তন অর্থে-কারণ দূর করা। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মূলে যাইতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তারপর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপ দোষ আপনিই চলিয়া যাইবে। শুধু প্রতিবাদে-টীৎকারে কোন ফল হইবে না; তাহাতে বরং অনিষ্টই হইবে।

আর এক শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিছিলেন যে, দোষনিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ পর্যন্ত যাইতে হইবে। বড় বড় সাধু-মহাত্মাদের লইয়াই এই শ্রেণী গঠিত। একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে, জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ সকলেই বলিয়া গিয়াছেন-আমরা নষ্ট করিতে আসি নাই, পূর্বে যাহা ছিল তাহাকে পূর্ণ করিতেই আসিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া মনে করে, তাঁহারা প্রচলিত মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অনুপযুক্ত কার্য করিয়াছেন; এখনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইহারা যাহা সত্য বলিয়া ভাবিতেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইহারা কতকটা কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই-সকল একদেশদর্শীরা মহাপুরুষদের হৃদয়স্থ প্রেমের অনন্ত শক্তি অতি অল্পই বুঝিতে পারে। তাঁহারা জগতের নরনারীগণকে তাঁহাদের সন্তান-স্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের অন্তরে প্রত্যেকেরই জন্য অনন্ত সহানুভূতি ও ক্ষমা ছিল-তাঁহারা সর্বদা সহ্য ও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন কি করিয়া মানব সমাজ গঠিত হইবে; সুতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহাদের সঞ্জীবন-ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা লোককে গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরে একটির পর একটি পা ফেলিয়া উন্নতির পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উপনিষদের রচয়িতা। তাঁহারা বেশ জানিতেন-ঈশ্বরীয় প্রাচীন ধারণাসকল উন্নত নীতি-সঙ্গত ধারণার সহিত মেলেনা। তাঁহারা জানিতেন-বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যেও অনেক মহৎ সত্য আছে; কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন-যাহারা পূর্বমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা না

করিয়া নূতন মত স্থাপন করিতে চায়, যাহারা যে সূত্রে মালা গ্রথিত তাহাকে ছিন্ন করিতে চায়, যাহারা শূন্যের উপর নূতন সমাজ গঠন করিতে চায়, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হইবে।

আমরা কখনই নূতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমরা বস্তুর স্থান পরিবর্তন করিতে পারি মাত্র। বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সুতরাং আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত শান্তভাবে লোকের সত্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত শক্তিকে পরিচালন করিতে হইবে; যে সত্য পূর্ব হইতে জ্ঞাত, তাহারই সম্পূর্ণ ভাব জানিতে হইবে। সুতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বরধারণা বর্তমান কালের অনুপযোগী বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া তাঁহারা উহার মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তাহারই ফল বেদান্তদর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতাসকল ও বিশ্বনিয়ন্তা এক ঈশ্বরের ভাব অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবসকল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন-এইরূপে তাহারা যে উচ্চতম সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহাই নির্গুণ পূর্ণব্রহ্ম নামে অভিহিত। এই নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণায় তাঁহারা জগতের মধ্যে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

‘যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডস্বরূপকে দেখিতে পান, যিনি এই মরজগতে সেই এক অনন্ত জীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা-ও অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহারই শাস্বতী শান্তি, আর কাহারও নহে।’

৫. মায়া ও মুক্তি

মায়া ও মুক্তি

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা : ২২শে অক্টোবর, ১৮৯৬]

কবি বলেন, ‘পিছনে হিরণ্য জলদজাল লইয়া আমরা জগতে প্রবেশ করি। কিন্তু’ সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা সকলেই একরূপ মহিমামণ্ডিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করি না; আমাদের অনেকেই কুজ্জটিকার কালিমা লইয়া জগতে প্রবেশ করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা-সকলেই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদেরকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে- যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই অনন্ত জীবন-সমুদ্রের মধ্যে পথ করিয়া লইতে হইবে- সম্মুখে আমরা অগ্রসর হই, পিছনে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত। এইরূপেই আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদেরকে এই যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে অপসারিত করিয়া দেয়- জয়ী হইলাম, না পরাজিত হইলাম, তাহাও আমরা জানি না;- ইহাই মায়া।

বালকের হৃদয়ে আশাই বলবতী। তাহার উন্মেষশীল নয়নের সম্মুখে সব-কিছুই যেন একটি সোনার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয়; সে ভাবে- সকলের উপর আমার ইচ্ছাই চলিবে। কিন্তু যেই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতি বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মতো দাঁড়ায়, এবং তাহার ভবিষ্যৎ গতি রোধ করে। বার বার এই প্রাচীর ভাঙিবার উদ্দেশ্যে সে বেগে তদুপরি পতিত হইতে পারে। সারা জীবন যতই সে অগ্রসর হয়, ততই তাহার আদর্শ যেন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়- শেষে মৃত্যু আসে, তখন হয়তো নিস্তার;- ইহাই মায়া।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন -তাহার জ্ঞানের পিপাসা। এমন কিছুই নাই যাহা তিনি ত্যাগ করিতে না পারেন, কোন সংগ্রামই তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে পরে না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া একটির পর একটি প্রকৃতির গোপনতত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন -প্রকৃতির অন্তস্তল হইতে আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যসকল উদঘাটন করিতেছেন -কিন্তু কেন? এ-সব করিবার

উদ্দেশ্য কি? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন? মানুষ যাহা করিতে পারে, প্রকৃতি কি তাহা অনন্তেগুণে অধিক করিতে পারে না? তাহা হইলেও প্রকৃতি জড়, অচেতন। অচেতন জড়ের অনুকরণে গৌরব কি? বজ্র যত বিরাট হউক, প্রকৃতি উহাকে যে-কোন দূরেদেশে নিক্ষেপ করিতে পারে। যদি কোন মানুষ তাহার তুলনায় সামান্য এতটুকু করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহার কারণ কি? প্রকৃতির অনুকরণ, মৃত্যুর অনুকরণ, জড়ের অনুকরণ, অচেতনের অনুকরণের জন্য কেন তাহার প্রশংসা করিব?

মহাকর্ষশক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি। জড়ের অনুকরণে কি গৌরব? তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার জন্যই চেষ্টা করিতেছি; -ইহাই মায়া।

ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যায়; যেখানে কোনক্রমে সুখ পাওয়া যায় না, মানুষ সেখানে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা সকলেই উপদেশ শুনিতেছি-এ-সব বৃথা; কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না। নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া শেখাও অসম্ভব। উপদেশ কাজে লাগাইতে হইবে-হয়তো তীব্র আঘাত পাইব। তাহাতেই কি আমরা শিখিব? না, তখনও নহে। পতঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নির অভিমুখে ধাবমান হয়, আমরাও তেমনি পুনঃ পুনঃ বিষয়সমূহের দিকে বেগে পতিত হইতেছি-যদি কিছু সুখ পাই। বার বার নূতন উৎসাহে ফিরিয়া যাইতেছি। এইরূপে আমরা চলিয়াছি, যতক্ষণ না দেহমন ভাঙিয়া যায়; শেষে প্রতারিত হইয়া মরিয়া যাই; -ইহাই মায়া।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও একই কথা। আমরা জগতের রহস্য-মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি-আমরা এই জিজ্ঞাসা, এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি না; কিন্তু আমাদের ইহা জানিয়া রাখা উচিত-জ্ঞান লব্ধব্য বস্তু নহে। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই দেখা যায়, অনাদি অনন্ত কালের প্রাচীর দণ্ডায়মান, আমরা উহা লঙ্ঘন করিতে পারি না। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়-উহাও অতিক্রম করা যায় না; সবই অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকারণরূপ প্রাচীরে সীমাবদ্ধ।

আমরা উহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি, চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হয়; -ইহাই মায়া।

প্রতি নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমরা মনে করি- আমরা স্বাধীন, আবার সেই মুহূর্তেই আমরা দেখিতে পাই- আমরা স্বাধীন নই। ক্রীতদাস, প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা; শরীর, মন, সর্ববিধ চিন্তা এবং সকল ভাবেই আমরা প্রকৃতির ক্রীতদাস; -ইহাই মায়া।

এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সন্তানকে অসাধারণ শিশু-প্রতিভাবান্ পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটিকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন, সেই ছেলেটির উপর তাঁহার সারা মনপ্রান পড়িয়া থাকে। ছেলেটি বড় হইল-হয়তো মাতাল, পশুতুল্য হইয়া উঠিল, জননীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। যতই এই অসদ্ব্যবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালোবাসাও ততই বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলিয়া খুব প্রশংসা করে; তাহারা স্বপ্নেও মনে করে না যে, সেই জননী জনাবধি একটি ক্রীতদাসী মাত্র-তিনি না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রবার তাঁহার ইচ্ছা হয়- তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না। তিনি উহার উপর পুষ্পরাশি ছড়াইয়া, উহাকেই আশ্চর্য ভালোবাসা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, -ইহাই মায়া।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ। নারদও একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, ‘প্রভু, তোমার মায়া কেমন, তাহা দেখাও।’ কয়েক দিন গত হইলে কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে লইয়া গেলেন। অনেকদূর গিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, ‘নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পারো?’ নারদ বলিলেন ‘প্রভু, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন; আমি জল লইয়া আসিতেছি।’ এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ঐ স্থান হইতে কিছু দূরে একটি গ্রাম ছিল; নারদ সেই গ্রামে জলের সন্ধানে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা তাঁহার সম্মুখে আসিল। তাহাকে দেখিয়াই নারদ সব ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রভু যে জলের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষ্ণার্ত, হয়তো তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, নারদ এ-সব ভুলিয়া

গেলেন। তিনি সব ভুলিয়া সেই কন্যাটির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, ক্রমে পরস্পরের প্রণয়সঞ্চার হইল। তখন নারদ সেই কন্যার পিতার নিকট কন্যাটির পাণি প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল, তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইল। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল। শ্বশুরের মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তির উত্তরারিকারী হইলেন এবং পুত্র-কলত্র ভূমি-পশু সম্পত্তি-গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। অন্ততঃ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল—তিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। এই সময় সেই দেশে বন্যা আসিল। একদিন রাত্রিকালে নদী দুই কূল প্লাবিত করিল, আর সমগ্র গ্রামটিই জলমগ্ন হইল। অনেক বাড়ি পড়িতে লাগিল—মানুষ পশু সব ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া যাইতে লাগিল, স্রোতের বেগে সবই ভাসিয়া গেল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হাতে দুইটি ছেলেকে ধরিলেন, কাঁধে আর একটি ছেলেকে লইয়া সেই ভয়ঙ্কর নদী হাঁটিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ কাঁধের শিশুটিকে কোন রকমে রাখিতে পারিলেন না; সে পড়িয় গিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। নিরাশায়, দুঃখে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেটিকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একটি—যাহার তিনি হাত ধরিয়া ছিলেন—সেহাত ফস্কাইয়া ডুবিয়া গেল। তাঁহার পত্নীকে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের স্রোত অবশেষে তাহাকেও তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল, তিনি স্বয়ং কূলে নিষ্কিণ্ত হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে অতি কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁহার পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, ‘বৎস, কই জল কই? তুমি যে জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ ঘণ্টা হইল গিয়াছ।’ অল্প ঘণ্টা! নারদের মনে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্তদৃশ্য তাঁহার মনের ভিতর ঘটয়া গিয়াছে;—ইহাই মায়া।

কোন না কোনরূপে আমরা এই মায়ার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন-বিষয়টিও বড় জটিল। ইহার তাৎপর্য কি? ইহার তাৎপর্য এই-ব্যাপার বড় ভয়ানক; সকল দেশেই মহাপুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সকল দেশের লোকই এই তত্ত্ব শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু খুব অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ নিজে না ভুগিলে, নিজে না ঠেকিলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে-সব কিছুই বৃথা, সবই মিথ্যা।

সর্বসংহারক কাল আসিয়া সবই গ্রাস করে, আর কিছু অবশিষ্ট রাখে না-পাপকে গ্রাস করে, পাপীকে গ্রাস করে; রাজা প্রজা সুন্দর কুৎসিত সকলকেই কাল গ্রাস করে, কাহাকেও ছাড়ে না। সকলেরই এক চরমগতি-সকলেই বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান শিল্প বিজ্ঞান-সবই সেই এক অনিবার্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐ তরঙ্গের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই ঐ বিনাশমুখী গতিকে এক মুহূর্তের জন্যও রোধ করিতে পারে না। আমরা মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, যেমন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে মদ্যপান নৃত্য ও অন্যান্য বৃথা আমোদ-প্রমোদে লোকে সবকিছু ভুলিবার চেষ্টা করিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো চলচ্ছত্রিরহিত হয়। আমরাও এইরূপে এই মৃত্যুচিন্তাকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি-সর্ব প্রকার ইন্দ্রিয়সুখে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু নিবারিত হয় না।

লোকের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। একটি পথ সকলেই জানেন, তাহা এই : জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে-সব সত্য, কিন্তু ও-সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। ‘যাবজ্জীবং সুখং জীবং ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।’ দুঃখ আছে বটে, কিন্তু ওদিকে নজর দিও না। যা একটু আধটু সুখ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও; এই সংসারের অন্ধকার দিকটা লক্ষ্য করিও না-কেবল উজ্জ্বল দিকটাই লক্ষ্য করিও। এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদের আশঙ্কাও আছে। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহা আমাদের কার্যে প্রবৃত্ত রাখে। আশা এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদের কার্যে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ আছে যে, শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া

দিতে হয়। ‘সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর; যতদূর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারো থাকো; দুঃখকষ্ট আসিলেও তাহাতে সম্ভুষ্ট থাকো; আঘাত পাইলে বলো—ইহা আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি; দাসবৎ পরিচালিত হইলেও বলো—আমি মুক্ত, স্বাধীন; অপরের নিকট এবং নিজের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলো, কারণ সংসারে থাকিবার, জীবন ধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়’—যাঁহারা এ-কথা বলেন, তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া অবশেষে সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহাকেই অবশ্য পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান যত প্রচলিত, কোনকালে এতটা ছিল না; তাহার কারণ এই—লোক এখন যেমন তীব্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোন কালে এত তীব্র আঘাত পাইত না, প্রতিদ্বন্দিতাও কখন এত তীব্র ছিল না; মানুষ এখন তাহার ভ্রাতার প্রতি যত নিষ্ঠুর, তত নিষ্ঠুর কখন ছিল না, আর এই জন্যই এখন এই সান্ত্বনা দেওয়া হইয়া থাকে, বর্তমানকালে এই উপদেশই অধিক পরিমাণে দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে এখন কোন ফল হয় না, কোনকালেই হয় নাই। গলিত শবকে কতকগুলি ফুল চাপা দিয়া রাখা যায় না—ইহা সম্ভব নহে; একদিন ঐ ফুল গুলি সব উড়িয়া যাইবে, তখন সেই শব পূর্বাপেক্ষা বীভৎসরূপে দেখা দিবে। আমাদের সমুদয় জীবনও এই প্রকার। আমরা আমাদের পুরাতন পচা ঘা সোনার আচ্ছাদনে মুড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু একদিন আসিবে যখন সেই সোনার পাত খসিয়া পড়িবে আর সেই ক্ষত অতি বীভৎসভাবে প্রকাশিত হইবে।

তবে কি কোনই আশা নাই? এ-কথা সত্য যে, আমরা সকলেই মায়ার দাস, আমরা মায়াতেই জন্মিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত। তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই? আমরা যে সকলেই অতি দুর্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটি কারাগার, আমাদের তথাকথিত পূর্বপ্রাপ্ত মহিমাও যে একটি কারা গৃহ মাত্র, আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে কারাগার-স্বরূপ, তাহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জানে। লোকে যাহাই বলুক না কেন, এমন কেহই নাই, যে কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিয়াছে। বৃদ্ধেরা এটি আরও তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষা তাঁহাদিগকে বড় বেশী

ঠকাইতে পারে না। এই বন্ধন-অতিক্রমের উপায় কি? এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই? আমরা দেখিতেছি, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, এই বন্ধন আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্র থাকিলেও এই দুঃখকষ্টের মধ্যেই, এই জগতেই—যেখানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক—এখানেও এক মহাবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদয়ে যেন ধ্বনিত হইতেছে : দৈব হ্যেমা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।^১—আমার এই দৈবী ত্রিগুণময়ী মায়া অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায়। যাহারা আমার শরণাপন্ন, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে। ‘হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জীবগণ, আমার কাছে এস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি দিব’^২—এই বাণীই আমাদের ক্রমাগত সম্মুখের দিকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। মানুষ ইহা শুনিয়াছে এবং অনন্ত যুগ ধরিয়া শুনিতোছে। যখন মানুষের সবই নষ্টপ্রায় বলিয়া মনে হয়, যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যায়, যখন সবই যেন তাহার আঙুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া যায় এবং জীবন একটি ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়, তখন সে এই বাণী শুনিতো পায়। আর ইহাই ধর্ম।

১ গীতা, ৭/ ১৪ ২ St. Matthew, Ch. II, 28

অতএব, একদিকে এই অভয়বানী, এই আশাপ্রদ বাক্য যে, এ-সব কিছুই নয়, এ-সবই মায়া, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু, সেই সঙ্গে এই আশার বাণী যে, মায়ার বাহিরে যাইবার পথ আছে। অপর দিকে, সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন—‘ধর্ম, দর্শন এ-সব বাজে জিনিস লইয়া মাথা ঘামাইও না। সংসারে বাস কর; এই সংসার নিতান্ত অশুভপূর্ণ বটে, কিন্তু যতদূর পারো, ইহার সদ্যবহার করিয়া লও।’ সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, দিবারাত্রি ভগ্নমি, মিথ্যাচার ও প্রতারণার জীবন যাপন কর—তোমার ক্ষতগুলি যতদূর পারো ঢাকিয়া রাখো। তালির উপর তালি দাও, শেষে প্রকৃত জিনিসটিই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটি জোড়াতালির সমষ্টিতে পরিণত হও। ইহাকেই বলে—

সাংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোরাতালি লইয়া সমুপস্থিত, তাহারা কখন ধর্মালাভ করিতে পারিবে না! যখন জীবনের বর্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, যখন এইরূপ ‘তালি’ দেওয়ার উপর ভয়ানক ঘৃণা উপস্থিত হয়, যখন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মায়, তখনই ধর্মের আরম্ভ। বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিম্নে বসিয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিয়াছেন, সে কথা যে প্রাণ হইতে বলিতে পারে, সেই কেবল ধার্মিক হইবার যোগ্য। সংসারী হইবার ইচ্ছা তাঁহারও হৃদয়ে একবার উদিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই অবস্থা : তিনি স্পষ্ট বুঝিতেছেন, এই সাংসারিক জীবনটা একেবারে ভুল; অথচ ইহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। প্রলোভন একবার তাঁহার নিকট আবিভূত হইয়াছিল; সে যেন বলিল—সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, সংসারে ফিরিয়া গিয়া পূর্বেকার মতো প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিসকে তাহার ভুল নামে ডাকো, নিজের নিকট ও সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাকো। কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহাকে জয় করিয়া ফেলিলেন; তিনি বলিলেন—‘কেবল খাইয়া পরিয়া মূর্খের মতো জীবনযাপন অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ; পরাজয়ের জীবনযাপন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মরা শ্রেয়ঃ।’ ইহাই ধর্মের ভিত্তি। যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সে সত্যলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বরলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ধার্মিক হইবার জন্যও প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্যিক। আমি নিজের পথ নিজে করিয়া লইব। সত্য জানিব অথবা এই চেষ্টায় প্রাণ দিব; কারণ সংসারের দিকে তো আর কিছু পাইবার আশা নাই, ইহা শূন্য—ইহা প্রতিদিন লয় পাইতেছে। আজিকার সুন্দর আশাপূর্ণ তরুণ আগামী কাল বৃদ্ধ। আজিকার আশা আনন্দ সুখ—এ-সকল মুকুলের মতো আগামী কাল শিশিরপাতেই নষ্ট হইবে। ইহা যেমন একদিকের কথা, অপরদিকে তেমনি জয়ের আশাও রহিয়াছে—জীবনের সমুদয় অশুভ জয় করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন ও জগতের উপর পর্যন্ত জয়ী হইবার আশা রহিয়াছে; এই উপায়েই মানুষ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব যাহারা এই জয় লাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই ঠিক পথে রহিয়াছে এবং

বেদসকল ইহাই প্রচার করেন—‘নিরাশ হইও না ; পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ—জাগো এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও।’১

বিভিন্ন ধর্মসমূহ যে আকারেই মানুষের নিকট আপন স্বরূপ অভিব্যক্ত করুক না কেন, তাহাদের সকলেরই এই এক মূলভিত্তি। সকল ধর্মই জগৎ হইতে বাহিরে যাইবার অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ দিতেছে। এই-সকল বিভিন্ন ধর্মের উদ্দেশ্য—সংসার ও ধর্মের মধ্যে একটা আপস করিয়া লওয়া নহে, বরং ধর্মকে নিজ আদর্শে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা, সংসারের সঙ্গে আপস করিয়া ঐ আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলা নহে। প্রত্যেক ধর্মই এ-কথা প্রচার করিতেছে, আর বেদান্তের কর্তব্য—বিভিন্ন ধর্মভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন; যেমন এইমাত্র আমরা দেখিলাম, এই মুক্তিতত্ত্বে জগতের উচ্চতম ও নিম্নতম সকল ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আমরা যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কুসংস্কার বলি, আবার যাহা সর্বোচ্চ দর্শন, সবগুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে তাহারা সকলেই ঐ এক প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দেয় এবং এই-সকল ধর্মের অধিকাংশই প্রপঞ্চগতীত পুরুষবিশেষের—প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নহেন এরূপ অর্থাৎ নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষের—সাহায্যে এই মুক্তি লাভ করিতে হয়। এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা বিরোধ ও মতভেদ সত্ত্বেও—সেই ব্রহ্ম সত্ত্ব বা নিরুত্ত্ব, মানুষের ন্যায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ, স্ত্রী বা উভয় ভাব-বর্জিত, এইরূপ অনন্ত বিচারসত্ত্বেও—বিভিন্ন মতের অতি প্রবল বিরোধসত্ত্বেও উহাদের সকলের মধ্যেই একত্বের যে সুবর্ণসূত্র উহাদিগকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই; সুতরাং ঐ-সকল বিভিন্নতা বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না; আর এই বেদান্তদর্শনে এই সুবর্ণসূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহাতে প্রথমেই এই তত্ত্ব উপলব্ধ হয় যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ দ্বারা সেই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। সকল ধর্মেরই এই সাধারণ ভাব।

১ কঠ. উপ. , ১/৩/১৪

আমাদের সুখ-দুঃখ, বিপদ-কষ্টের অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইলঃ এই জগৎটা বাস্তবিক কি? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহার লয়? আর ইহার উত্তরঃ ‘মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়।’ এই যে মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিকই মুক্ত—এই মহান্ ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্তও চলিতে পারি না, এই ভাব ব্যতীত আমাদের সকল কার্য, এমন কি জীবন পর্যন্ত বৃথা। প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি আমাদের দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই অপর ভাবও মনে আমাদের মনে উদিত হইতেছে যে, তথাপি আমরা মুক্ত। প্রতি মুহূর্তেই যেন আমরা মায়ার দ্বারা আহত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি হইতেছে, আমরা মুক্ত। আমাদের ভিতরে যেন কিছু আমাদের দাস বলিয়া দিতেছে, আমরা মুক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে-সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন সর্বদা বলিতেছে—আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্মমত আলোচনা করিয়া দেখ, তবে তুমি বুঝবে—তাহাদের সবগুলিতেই কোন না কোনরূপে এইভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ধর্ম নয়—ধর্ম-শব্দটিকে আপনারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না—সমগ্র সামাজিক জীবনটি কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। সকল সামাজিক গতিই সেই এক মুক্তভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেন সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বর শুনিয়াছে—যেস্বর দিবারাত্রি বলিতেছে, ‘পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার কাছে এস।’^১ একরূপ ভাষায় বা একরূপ ভঙ্গিতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির সেই বাণী কোন না কোনরূপে আমাদের সহিত বর্তমান রহিয়াছে। আমরা এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও ঐ বাণীর জন্য; আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্য। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি। যেমন সেই মোহন বংশীবাদক^২ বংশীধ্বনি দ্বারা গ্রামের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিল, আমরাও তেমনি না জানিয়াই এক মোহন বংশীর অনুসরণ করিতেছি।

আমরা যখন সেই বাণী অনুসরণ করি, তখনই আমরা নীতিপরায়ণ। কেবল জীবাত্মা নয়, সেই নিম্নতম জড়পরমানু হইতে উচ্চতম মানব পর্যন্ত সকলেই সে স্বর শুনিয়াছে, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছে। আর এই চেষ্টায় পরস্পর মিলিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে আর এই-ভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনন্দ চেষ্টা সুখ জীবন মৃত্যু-সব কিছুই উৎপত্তি; আর এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ বাণীর সমীপে উপস্থিত হইবার উন্মত্ত চেষ্টার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি। ইহাই প্রকৃতির অভিব্যক্তি।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয়? তখন আমাদের সম্মুখের দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যখনই তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পারো, বুঝিতে পারো-উহা কি, তখন সম্মুখের সকল দৃশ্যই পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই জগৎ, যাহা পূর্বে মায়ার বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা একটি সুন্দর ও মনোরম স্থানে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তখন আর আমাদের প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এ-সবই বৃথা-ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কাঁদিবার অথবা বিলাপ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যখন ঐ বাণীর মর্ম বুঝিতে পারি, তখনই বুঝি-এই-সকল চেষ্টা, এই যুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই গোলমাল, এই নিষ্ঠুরতা, এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-সন্তোষের প্রয়োজন কি। তখন বুঝিতে পারা যায় যে উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতই ঘটিয়া থাকে-আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই এইগুলি ঘটিয়া থাকে!

১ St. Matthew, Ch. II 28

২ The Pied Piper of Hamelin

অতএব সমুদয় মানবজীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র; সূর্যও সেইদিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও ঐজন্য সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এবং বায়ুও বহিতেছে। সেই মুক্তির জন্য বজ্র তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহার জন্য চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সকলেই সেই দিকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাধু সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাপীও চলিয়াছে, দানশীল ব্যক্তি সেই বানী লক্ষ্য করিয়া সোজা সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না; আবার ভয়ানক কৃপণ ব্যক্তিও সেই লক্ষ্যে চলিয়াছে। মহান্ হিতকারী ব্যক্তিও অন্তরে অন্তরে সেই বাণী শুনিয়াছেন; তিনি হিতকর্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না, আবার ভয়ানক অলস ব্যক্তিও সেইরূপ। একজনের অপেক্ষা অপর ব্যক্তির পদস্থলন বেশী হইতে পারে, আর যে ব্যক্তির খুব বেশী পদস্থলন হয়, তাহাকে আমরা মন্দ বলি; আর যাহার পদস্থলন অল্প হয়, তাহাকে আমরা ভালো বলি। ভালো-মন্দ এই দুইটি ভিন্ন বস্তু নহে, উহারা একই জিনিস; উহাদের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

এখন দেখ, যদি এই মুক্তভাবরূপ শক্তি বাস্তবিক সমগ্র জগতে কার্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়—ধর্মে উহা প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই, সব ধর্মই ঐ এক ভাব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অতি নিম্ন স্তরের ধর্মগুলির কথা ধর, সেই-সকল ধর্মে হয়তো কোন মৃত পূর্বপুরুষ অথবা ভয়ানক নিষ্ঠুর দেবগণ উপাসিত হন; কিন্তু তাহাদের উপাসিত এই দেবতা বা মৃতপুরুষদের মোটামুটি ধারণাটা কি? সেই ধারণা এই যে—তাঁহারা প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত, এই মায়া দ্বারা তাঁহারা বদ্ধ নন। অবশ্য তাঁহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা খুব সামান্য। উপাসক একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার ধারণা খুব স্থূল, সে গৃহ-প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অথবা শূন্যে উড়িতে পারে না। সুতরাং এই সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা ব্যতীত শক্তি সম্বন্ধে তাহার উচ্চতর ধারণা নাই; সুতরাং সে এমন দেবগণের উপাসনা করে, যাঁহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। দার্শনিকভাবে

লক্ষ্য করিলে এইরূপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহস্য নিহিত আছে? রহস্য এই যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার দেবতার ধারণা পরিচিত প্রকৃতির ধারণা অপেক্ষা উন্নত। আবার যাহারা তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাহাদেরও সেই একই মুক্তির সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ধারণা। যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে; অবশেষে আমরা একেশ্বরবাদে উপনীত হই। এই মায়া, এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইনিই আমাদের আশার স্থল।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদের ভাব উদ্ভূত হয়, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ। বেদান্ত উহা অপেক্ষাও গভীরতর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চান। বেদান্ত বলেন—এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে চৈতন্য রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও সকলে যে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই; এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যদিও উহা স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে আছে—‘আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে’, বেদান্তের পক্ষেও এই স্তুতি খাটিবে। তিনি কেবল একটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া বলিবেন—‘আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে।’ আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে আমাদের অনেক দূরে প্রকৃতির পারে; আমরা যে তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই দূরবর্তী ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে—অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতির ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে ও সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ না থাকে, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেবন্দিররূপে পরিণত হন, তিনিই যেন শেষে জীবাত্মা ও মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। এইখানেই বেদান্তের শেষ কথা।

যাঁহাকে ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদান্ত বললেন—তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য; তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিক পথে চল নাই। মুক্তির যে মহান্ আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে তোমার কাছে—আরও কাছে অনুভব কর, যতদিন না তুমি জানিতে পারো যে ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপ ছিল এবং মায়া তোমাকে কখনই বদ্ধ করে নাই। এই প্রকৃতি কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ নয়। ভয়গ্রস্ত বালকের মতো তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছে, এই প্রকৃতি হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য। ইহা শধু বুদ্ধিদ্বারা জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষভাবে অনুভব করা। আমরা এই জগৎকে যত স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের সকল চঞ্চলতা স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সকল কুটিলতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্বের ভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি—এই মায়া এখনকার মতো ভয়ানক অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র-রূপে প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমরা যে-সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, সেগুলিও ব্রহ্মভাবে রূপায়িত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত রূপে প্রতিভাত হইবে, সকল বস্তুর পশ্চাতে সারসত্তারূপে তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মা।

৬. ব্রহ্ম ও জগৎ

অনন্ত ব্রহ্ম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে—অদ্বৈত বেদান্তের এই বিষয়টি ধারণা করা অতি কঠিন। এই প্রশ্ন মানুষ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে কিন্তু এই প্রশ্ন চিরকাল থাকিবে—যিনি অনন্ত অসীম, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে? আমি এখন এই প্রশ্নটি আলোচনা করিব। ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য এই চিত্রটির সাহায্য গ্রহণ করিব।

চিত্রে (ক)ব্রহ্ম (খ)জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। এখানে জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, সূক্ষ্ম জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে—স্বর্গ-নরক, এক কথায় যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে সে-সবই বুঝিতে হইবে। এক প্রকার পরিণামের নাম ‘মন’, আর একপ্রকার পরিণামের নাম ‘শরীর’—ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সব লইয়া জগৎ। এই ব্রহ্ম(ক) জগৎ(খ)হইয়াছেন দেশ-কাল-নিমিত্তের(গ-এর) মধ্য দিয়া আসিয়া—ইহাই অদ্বৈতবাদের মূল কথা। দেশকালনিমিত্ত-রূপ কাচের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে আমরা দেখিতেছি, আর ঐরূপে নীচের দিক হইতে দেখিলে এই ব্রহ্ম জগদ্রূপে দৃষ্ট হন। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম সেখানে দেশ-কাল-নিমিত্ত নাই। কাল সেখানে থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে মন নাই, চিন্তাও নাই। দেশ সেখানে থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে কোন পরিবর্তন নাই—পরিবর্তন, গতি এবং নিমিত্ত বা কার্যকারণ-ভাবও থাকিতে পারে না। এক মাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটি বুঝা এবং বিশেষরূপে ধারণা করা আবশ্যিক যে, যাহাকে আমরা কার্যকারণভাব বলি, তাহা ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন হইবার পর—যদি আমরা এই ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি—তাহার পর আরম্ভ হয়, পূর্বে নহে; আর আমাদের ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু সব তাহার পর হইতে আরম্ভ হয়।

আমার বরাবর ধারণা এই যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বুঝিতে এই জায়গায় ভুল করিয়াছেন; তিনি এই ‘ইচ্ছা’কেই সর্বস্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের স্থানে এই ‘ইচ্ছা’কেই বসাইতে চান। কিন্তু পূর্ণব্রহ্মকে কখন ‘ইচ্ছা’ (Will) বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ ‘ইচ্ছা’ জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামশীল, কিন্তু ব্রহ্মে—‘গ’ - এর

অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের উপরে—কোনরূপ গতি নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। ঐ গ-এর নিম্নেই গতি—বাহ্য বা আন্তর সর্বপ্রকার গতির আরম্ভ; আর এই আন্তর গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব গ-এর উপরে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না, সুতরাং ‘ইচ্ছা’ জগতের কারণ হইতে পারে না। আরও নিকটে আসিয়া পর্যবেক্ষণ কর; আমাদের শরীরের সকল গতি ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারখানি নাড়িলাম। ইচ্ছা অবশ্য উহা নাড়াইবার কারণ, ঐ ইচ্ছাই পেশীর শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, এ-কথা ঠিক বটে। কিন্তু যে শক্তি চেয়ারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার হৃদয় এবং ফুসফুসকেও সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্তু ‘ইচ্ছা’রূপে নহে। এই দুই শক্তিই এক ধরিয়া লইলেও যখন উহা জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করে, তখনই উহাকে ‘ইচ্ছা’ বলা যায়, কিন্তু ঐ ভূমিতে আরোহণ করিবার পূর্বে উহাকে ইচ্ছা বলিলে উহার ভুল নাম দেওয়া হইল বলিতে হইবে। ইহাতেই শোপেনহাওয়ারের দর্শনে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন আলোচনা করা যাক—আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি কেন? একটি প্রস্তর পড়িল—আমরা অমনি প্রশ্ন করিলাম, উহার পতনের কারণ কি? এই প্রশ্নের ন্যায্যতা বা সম্ভাবনীয়তা এই অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, কারণ ব্যতীত কিছুই ঘটে না। বিষয়টি সম্বন্ধে আপনাদিগকে খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি, ‘এই ঘটনা কেন ঘটিল?’—তখনই আমরা মানিয়া লইতেছি যে সব জিনিসেরই, সব ঘটনারই একটি ‘কেন’ থাকিবে। অর্থাৎ উহা ঘটিবার পূর্বে আর কিছু উহার পূর্ববর্তী থাকিবে। এই পূর্ববর্তিতা ও পরবর্তিতাকেই ‘নিমিত্ত’ বা ‘কার্যকারণ’ভাব বলে, আর যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি বা অনুভব করি—সংক্ষেপে জগতের সবকিছুই একবার কারণ, আবার কার্যরূপে অনুভূত হইতেছে। একটি জিনিস তাহার পরবর্তীটির কারণ, উহাই আবার তাহার পূর্ববর্তী কোন কিছুর কার্য। ইহাকেই কার্যকারণের নিয়ম বলে, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস জগতের প্রত্যেক পরমাণুই অন্যান্য সকল বস্তুর সহিত, তাহা যাহাই হউক না কেন, কোন না কোন সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ইওরোপে অনেক স্বজ্ঞা-সম্পন্ন দার্শনিক আছেন, তাহাদের

বিশ্বাস ইহা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার অনেকের ধারণা ইহা ভূয়োদর্শনলব্ধ, কিন্তু এই প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বেদান্ত ইহার কি মীমাংসা করেন, তাহা আমরা পরে দেখিব। অতএব আমাদের প্রথম বুঝা উচিত ‘কেন’ এই প্রশ্নটি এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্ববর্তী কিছু আছে এবং উহার পরে আরও কিছু ঘটবে। এই প্রশ্নে আর একটি বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে—জগতের কোন পদার্থই স্বতন্ত্র নয়, সকল পদার্থের উপর উহার বাহিরের কোন পদার্থ কার্য করে। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ—একটি অপরটির অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে। যখন আমরা বলি, ‘ব্রহ্মের কারণ কি? তখন আমরা এই ভুল করি যে, ব্রহ্মকে জগতের সামিল কোন বস্তুর ন্যায় মনে করিয়া বসি। এই প্রশ্ন করিতে গেলেই আমাদেরকে অনুমান করিতে হইবে, সেই ব্রহ্মও অন্য কিছুর অধীন—সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাও অন্য কিছুর দ্বারা বদ্ধ। অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম’ বা ‘নিরপেক্ষ সত্তা’ শব্দটিকে আমরা জগতের ন্যায় মনে করিতেছি। পূর্বোক্ত রেখার উপরে তো আর দেশকালনিমিত্ত নাই, কারণ উহা ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’—মনের অতীত। যাহা কেবল নিজের অস্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহা একমাত্র—‘একমেবাদ্বিতীয়ম্,’ তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহা মুক্তস্বভাব—স্বতন্ত্র, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না, যেহেতু তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইলেন না, বদ্ধ হইয়া গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে তাহা কখন মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। অতএব দেখিতেছ, অনন্ত কেন সান্ত হইল—এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক, উহা স্ববিরোধী।

এইসব সূক্ষ্ম বিচার ছাড়িয়া দিয়া সহজ ভাবেও আমরা এ-বিষয় বুঝাইতে পারি। মনে কর আমরা বুঝিলাম—ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ হইলেন, অনন্ত কিরূপে সান্ত হইলেন; তাহা হইলে ব্রহ্ম কি ব্রহ্মই থাকিবেন, অনন্ত কি অনন্তই থাকিবেন? তাহা হইলে তো অনন্ত ব্রহ্ম আপেক্ষিক হইয়া গেলেন। মোটামুটি আমরা জ্ঞান বলিতে কি বুঝি? যে-কোন বিষয় আমাদের মনের বিষয়ীভূত হয় অর্থাৎ মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা জানিতে পারি, আর যখন উহা আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত না হয়, তখন আমরা উহা জানিতে পারি না। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যদি সেই অনন্ত ব্রহ্ম মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি আর অনন্ত রহিলেন না; তিনি সসীম হইয়া

গেলেন। মনের দ্বারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, সে-সবই সসীম। অতএব সেই ‘ব্রহ্মকে জানা’—এ-কথা আবার স্ববিরোধী। এই জন্যই এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই; কারণ যদি ইহার উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম অসীম রহিলেন না; ঈশ্বর ‘জ্ঞাত’ হইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না—তিনি আমাদেরই মতো একজন—এই চেয়ারখানার মতো একটা জিনিস হইয়া গেলেন। তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্বদাই অজ্ঞেয়।

তবে অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি শুধু ‘জ্ঞেয়’ অপেক্ষা আরও কিছু বেশী। এ-কথাটি আবার বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর অজ্ঞেয় মনে করিয়া তোমরা যেন অজ্ঞেয়বাদীদের মতো বসিয়া থাকিও না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—সম্মুখে এই চেয়ারখানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জানিতেছি, উহা আমার জ্ঞাত পদার্থ। আবার আকাশের বহির্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি আছে কি না, এ বিষয় হয়তো একেবারে অজ্ঞেয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্বোক্ত পদার্থগুলির ন্যায় জ্ঞাতও নন, অজ্ঞাতও নন। ঈশ্বর বরং যাহাকে ‘জ্ঞাত’ বলা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী—ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে ইহাই বুঝায়, কিন্তু যে অর্থে কেহ কেহ কোন কোন প্রশ্নকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলেন, সে অর্থে নহে। ঈশ্বর জ্ঞাত অপেক্ষা আরও কিছু অধিক। এই চেয়ার আমাদের জ্ঞাত; কিন্তু ঈশ্বর তাহা অপেক্ষাও আমাদের অধিক জ্ঞাত, কারণ ঈশ্বরকে আগে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—আমাদিগকে চেয়ারের জ্ঞান লাভ করিতে হয়। তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ। যাহা কিছু আমরা জানি, সবই আগে তাঁহাকে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আত্মার সত্তাস্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি—সেই ‘আমি’ই আমাদের এই ‘আমি’র স্বরূপ; আমরা সেই ‘আমি’র ভিতর দিয়া ছাড়া কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং সবকিছুই আমাদিগকে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে ভিতর ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম চেয়ার অপেক্ষা আমাদের নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে রহিলেন। জ্ঞাতও নহেন অজ্ঞাতও নহেন, কিন্তু উভয় হইতেই অনন্তগুণ উর্ধ্ব, তিনি তোমার আত্মা স্বরূপ। কে এই জগতে এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করিতে পারিত, কে এই জগতে এক মুহূর্তও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য নির্বাহ করিতে পারিত, যদি সেই আনন্দস্বরূপ ইহার

প্রতি পরমাণুতে বিরাজমান না থাকিতেন?১ কারণ তাঁহারই শক্তিতে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য নির্বাহ করিতেছি এবং তাঁহারই অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব। তিনি ‘যে স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তাহা নহে; ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনিই সব কিছুর সত্ত্বাস্বরূপ—তিনি আমার আত্মার আত্মা; তুমি কোন-রূপেই বলিতে পার না যে, তুমি তাঁহাকে জানো—ইহা দ্বারা তাঁকে অত্যন্ত নামাইয়া ফেলা হয়। তুমি নিজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না, সুতরাং তুমি তাঁহাকে জানিতও পার না। জ্ঞান বলিতে ‘বিষয়ীকরণ’(□□□□□□□□□□□□□□□□)—কোন জিনিসকে বাহিরে আনিয়া বিষয়ের ন্যায়—জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ করা বুঝায়। উদাহরণ স্বরূপ দেখ, স্মরণ-কার্যে তোমরা অনেক জিনিসকে জ্ঞানের ‘বিষয়’ করিতেছ—যেন তোমাদের নিজেদের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ! সমুদয় স্মৃতি—যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জানি, সবই আমার মনে অবস্থিত। ঐ-সকল বস্তুর ছাপ বা ছবি যেন আমার অন্তরে রহিয়াছ। যখনই উহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করি, উহাদিগকে জানিতে চাই তখন প্রথমেই ঐগুলিকে বাহিরে প্রক্ষেপ করি। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ করা অসম্ভব, কারণ তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমরা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে পারি না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ‘স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’২-ইহার অর্থ : সেই সূক্ষ্মস্বরূপ জগৎকারণ সকল বস্তুর আত্মা, তিনিই সত্যস্বরূপ; হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই। এই ‘তত্ত্বমসি’ বাক্য বেদান্তের মধ্যে পবিত্রতম বাক্য, মহাবাক্য বলিয়া কথিত হয়, আর ঐ পূর্বোদ্ধৃত বাক্যাংশ দ্বারা ‘তত্ত্বমসি’র প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বুঝা গেল। ‘তুমিই সেই’-এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তুমি ঈশ্বরকে বর্ণনা করতে পার না। ভগবানকে পিতা মাতা ভ্রাতা বা প্রিয় বন্ধু বলিলে তাঁহাকে ‘বিষয়ীভূত’ করিতে হয়-তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিতে হয়-তাহা তো কখন হইতে পারে না। তিনি সকল বিষয়ের অনন্ত বিষয়ী। যেমন আমি চেয়ারখানি দেখিতেছি, আমি চেয়ারখানির দ্রষ্টা-আমি উহার বিষয়ী, তেমনি ঈশ্বর আমার আত্মার নিত্যদ্রষ্টা-নিত্যজ্ঞাতা-নিত্যবিষয়ী। কিরূপে তুমি তাঁহাকে-তোমার আত্মার অন্তরাত্মাকে-সকল

বস্তু প্রকৃত সত্তাকে ‘বিষয়ীকৃত’ করিবে বাহিরে আনিয়া দেখিবে? অতএব পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বর জ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন—তিনি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় অপেক্ষা অনন্তগুণ মহীয়ান—তিনি আমাদের সহিত অভিন্ন; আর যাহা আমার সহিত এক, তাহা কখন আমার জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় হইতে পারে না, যেমন তোমার আত্মা আমার আত্মা জ্ঞেয়ও নহে, অজ্ঞেয়ও নহে। তুমি তোমার আত্মাকে জানিতে পার না, তুমি আত্মাকে নাড়িতে পার না, অথবা উহাকে ‘বিষয়’ করিয়া দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ তুমিই সেই, তুমি নিজেকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিতে পার না। আবার আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিতে পার না, কারণ অজ্ঞেয় বলিতে গেলেও আগে আত্মাকে ‘বিষয়’ করিতে হইবে; তাহা তো করা যায় না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিকট পরিচিত—জ্ঞাত, আর কোন্ বস্তু তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত? প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ। ঠিক এই ভাবেই বলা যায় যে ঈশ্বর জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন তদপেক্ষা অনন্তগুণে মহীয়ান, কারণ তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা।

১ কো হ্যেবান্যাৎ...। তৈত্তিরীয় উপ., ২/৭ ২ ছান্দোগ্য উপ., ৬/১৩/৩

অতএব প্রথমতঃ আমরা দেখিতেছি, ‘পূর্ণব্রহ্মসত্তা হইতে কিরূপে জগৎ হইল?’—এই প্রশ্নই স্ববিরোধী; আর দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈত-বাদে ঈশ্বরের ধারণা এই একত্ব; সুতরাং আমরা তাঁহাকে ‘বিষয়ীভূত’ করিতে পারি না, কারণ জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাত সারেই হউক, আমরা সর্বদা তাঁহাতেই জীবিত এবং তাঁহাতে থাকিয়াই যাবতীয় কার্যকলাপ করিতেছি। আমরা যাহা করিতেছি, সবই সর্বদা তাঁহারই মধ্যদিয়া করিতেছি। এখন প্রশ্ন—এই দেশ-কাল-নিমিত্ত কি? অদ্বৈতবাদের মর্ম তো এই—একটিমাত্র বস্তু আছে, দুইটি নাই। আবার কিন্তু বলা হইতেছে সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্তের আবরণের ভিতর দিয়া নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব এখন বোধ হইতেছে, দুইটি বস্তু আছে—সেই অনন্ত ব্রহ্ম আর মায়া অর্থাৎ দেশ-কাল-নিমিত্তের সমষ্টি। আপাততঃ

দুইটি বস্তু আছে, ইহাই যেন স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হইতেছে। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন, বাস্তবিক ইহাকে দুই বলা যায় না। দুইটি বস্তু থাকিতে হইলে ব্রহ্মের ন্যায়-যাঁহার উপর কোন নিমিত্ত কার্য করিতে পারে না-এরূপ দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু থাকা আবশ্যিক। প্রথমতঃ দেশ-কাল-নিমিত্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। আমাদের মনের প্রতি পরিবর্তনের সহিত কাল পরিবর্তিত হইতেছে, সুতরাং উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কখন কখন স্বপ্নে দেখা যায়, যেন অনেক বৎসর জীবনধারণ করিয়াছি-কখন কখন আবার বোধ হয় এক মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মাস অতীত হইল।

অতএব দেখা গেল, কাল মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কালের জ্ঞান সময় সময় একেবারে অন্তর্হিত হয়, আবার অপর সময় আসিয়া থাকে। দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ। আমরা দেশের স্বরূপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার লক্ষণ নির্দিষ্ট করা অসম্ভব মনে হইলেও উহা যে রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; উহা আবার কোন পদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না। নিমিত্ত বা কার্যকারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দেশ-কাল-নিমিত্তের ভিতর এই একই বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, উহারা অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তোমরা শুদ্ধ ‘দেশের’ বিষয়-ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে কোন বর্ণ নাই, যাহার সীমা নাই, চারিদিকের কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তাই করিতে পারিবে না। তোমাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে দুইটি সীমার মধ্যস্থিত অথবা তিনটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। তবেই দেখা গেল, দেশের অস্তিত্ব অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে। কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ; শুদ্ধ কাল সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে পার না; কালের ধারণা করিতে হইলে তোমাকে একটি পূর্ববর্তী আর একটি পরবর্তী ঘটনা লইতে হইবে এবং কালের ধারণা দ্বারা ঐ দুইটিকে যোগ করিতে হইবে। দেশ যেমন বাহিরের দুইটি বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে, কালও তেমনি দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। আর ‘নিমিত্ত’ বা ‘কার্যকারণ’ভাবে ধারণা এই দেশকালের উপর নির্ভর করিতেছে। ‘দেশ-কাল-নিমিত্ত’ এই সবগুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই চেয়ারখানা বা ঐ দেয়ালটার যেরূপ অস্তিত্ব আছে; উহার তাহাও

নাই। উহারা যেন সকল বস্তুই পিছনে ছাড়ার মতো, তুমি কোনমতে উহাদিগকে ধরিতে পার না। উহাদের তো কোন সত্তা নাই—আবার উহারা যে কিছুই নয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ উহাদেরই ভিতর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে। অতএব আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম, এই দেশ-কাল-নিমিত্তের সমষ্টির অস্তিত্ব নাই এবং উহারা একেবারে অসৎ বা অস্তিত্বশূন্যও নহে। দ্বিতীয়তঃ উহারা আবার এক সময়ে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের উপর তরঙ্গ চিন্তা কর। তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের সহিত অভিন্ন, তথাপি আমরা মনে করি—ইহা তরঙ্গ এবং সমুদ্র হইতে পৃথক্। এই পৃথক্-ভাবে কারণ কি? নাম ও রূপ। নাম অর্থাৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটি ধারণা রহিয়াছে, আর রূপ অর্থাৎ আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে একেবারে পৃথক্‌রূপে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি? কখনই না। উহা সকল সময়েই ঐ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, তবে রূপও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু ঐ রূপটি যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা নহে। যতদিন ঐ তরঙ্গ ছিল, ততদিন ঐ রূপটি ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হইয়া ঐ রূপ দেখিতে হইত; ইহাই মায়া। অতএব এই সমগ্র জগৎ যেন সেই ব্রহ্মের এক বিশেষ রূপ। ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি সূর্য তারা সবই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করে কে? রূপ। আর ঐ রূপ—দেশ-কাল-নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ দেশ-কাল-নিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তরঙ্গও যেই চলিয়া যায়, অমনি তাহারাও অন্তর্হিত হয়। জীবাত্মা যখনই এই মায়া পরিত্যাগ করে, তখনই তাহার পক্ষে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া যায়। আমাদের সমুদয় চেষ্টাই এই দেশ-কাল-নিমিত্তের উপর নির্ভরতা হইতে নিজেকে রক্ষা করা। উহারা সর্বদাই আমাদের উন্নতির পথে বাধা দিতেছে, আর আমরা সর্বদাই উহাদের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পণ্ডিতেরা ‘ক্রমবিকাশবাদ’ কাহাকে বলেন? উহার ভিতর দুইটি ব্যাপার আছে। একটি এই যে, একটি প্রবল অন্তর্নিহিত শক্তি নিজেকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বাহিরের অনেক ঘটনা উহাকে বাধা দিতেছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি উহাকে প্রকাশিত

হইতে দিতেছে না। সুতরাং এই অবস্থাগুলির সহিত সংগ্রামের জন্য ঐ শক্তি নব নব রূপ ধারণ করিতেছে। একটি ক্ষুদ্রতম কীটানু উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটি শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণের পর মনুষ্যরূপে পরিণত হয়। এখন যদি এই তত্ত্বটিকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন সময় আসিবে, যখন যে শক্তি কীটানুর ভিতরে ক্রীড়া করিতেছিল এবং যাহা অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বাহিরের ঘটনা পুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পরিবে না। এই তত্ত্বটি দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে এইরূপ বলিতে হইবে—প্রত্যেক কার্যের দুইটি করিয়া অংশ আছে, একটি বিষয়ী, অপরটি বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার করিল, আমি দুঃখ বোধ করিলাম—এ ক্ষেত্রেও এই দুইটি ব্যাপার রহিয়াছে। আমার সারাজীবনের চেষ্টা কি? না, নিজের মনকে এতদূর সবল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থাগুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারি, অর্থাৎ লোকে আমাকে তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অনুভব করিব না। এইরূপেই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। নীতির অর্থ কি? ব্রহ্ম-ভাবের চরম সুরে বাঁধিয়া ‘নিজে’কে শক্ত সবল করা, যাহাতে সসীম প্রকৃতি আর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে না পারে। আমাদের দর্শনের ইহাই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত। এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সর্বপ্রকার পরিবেশের উপর জয়লাভ করিতে পারিব, কারণ প্রকৃতি সসীম।

এই একটি কথা আবার বুঝিতে হইবে—প্রকৃতি সসীম। প্রকৃতি সসীম কি করিয়া জানিলে? দর্শনের দ্বারা উহা জানা যায়; প্রকৃতি সেই অনন্তেরই সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র, অতএব উহা সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা বাহিরের অবস্থাগুলিকে জয় করিতে পারিব। উহাদিগকে জয় করিবার উপায় কি? আমরা বাস্তবিকপক্ষে বাহিরের বিষয়গুলির কোন পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্রকায় মৎস্যটি তাহার জলমধ্যস্থ শত্রু হইতে আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক। সে কি করিয়া আত্মরক্ষা করে? আকাশে উড়িয়া পক্ষী হইয়া। মৎস্যটি জলে বা বায়ুতে কোন পরিবর্তন সাধন করিল না—পরিবর্তন যাহা কিছু হইল, তাহা তাহার নিজের ভিতরে, পরিবর্তন সসর্বদাই ‘নিজের’

ভিতরেই হিয়া থাকে। এই রূপে আমরা দেখতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ-ব্যাপারটিতে ‘নিজের’ পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই প্রকৃতিকে জয় করা হইতেছে। এই তত্ত্বটি ধর্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর—দেখিবে এখানেও ‘অশুভজয়’ নিজের ভিতরে পরিবর্তনের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। অদ্বৈত বেদান্তের সমগ্র শক্তি মানুষের নিজের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে। ‘অশুভ, দুঃখ’—এ-সকল কথা বলাই ভুল, কারণ বহির্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণ পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও ঐ-সকল ঘটনায় স্থির থাকা যদি আমার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলেই আমার কখনই ক্রোধের উদ্বেক হইবে না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘৃণা করুক, যদি সে-সকল আমি গায়ে না মাখি, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি আমার ঘৃণার উদ্বেক হইবে না। এইরূপে নিজের উন্নতি সাধন করিয়া ‘অশুভ’ জয় করিতে হয়, অতএব তোমরা দেখিতেছ—অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই শুধু মেলে তাহা নয়, বরং ঐ-সকল সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর এইজন্যই ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্তর এতখানি স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মসমূহ তাঁহাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, উহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্রা মিটিতেছে না। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্রা মিটিতেছে। মানুষের শুধু বিশ্বাস থাকিলে চলিবে না, এমন বিশ্বাস থাকা চাই, যাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে বলা হয়—যাহা দেখিবে তাহাই বিশ্বাস কর, তবে শীঘ্রই তাহাকে উন্মাদাগারে যাইতে হইবে।

একবার জনৈক মহিলা আমার নিকট একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দেন—তাহাতে লেখা ছিল, সবকিছুই বিশ্বাস করা উচিত। ঐ পুস্তকে আরও লেখা ছিল যে, মানুষের আত্মা বা ঐরূপ কিছুই অস্তিত্বই নাই। তবে স্বর্গে দেবদেবীগণ আছেন, আর একটি জ্যোতিঃসূত্র আমাদের প্রত্যেকের মস্তকের সহিত স্বর্গের সংযোগসাধন করিতেছে। গ্রন্থকর্ত্রী জানিলেন কিরূপে?—তিনি প্রত্যাदिষ্ট হইয়া এ-সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, আর তিনি আমাকেও এই-সকল বিশ্বাস করিতে বলিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহার এ-সকল কথা বিশ্বাস করিতে

অস্বীকৃত হইলাম, তিনি বলিলেন, ‘তুমি নিশ্চয়ই অতি দুরাচার—তোমার আর কোন আশা নাই।’

যাহা হউক, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও ‘আমার পিতৃপিতামহের ধর্মই একমাত্র সত্য, অন্য যে-কোন স্থানে যে-কোন ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই মিথ্যা’—বহু স্থানে এইরূপ ধারণা বর্তমান থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ভিতর এখনও কতকটা দুর্বলতা রহিয়াছে; এই দুর্বলতা দূর করিতে হইবে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, এই দুর্বলতা শুধু এই দেশেই(ইংলন্ডে) আছে—ইহা সকল দেশেই আছে; আর আমাদের দেশে যেমন, তেমন আর কোথাও নাই,—সেখানে ইহা অতি ভয়ানক আকারে বর্তমান। সেখানে অদ্বৈতবাদ কখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই, সন্ন্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেইজন্যই বেদান্তের এক নাম হইয়াছিল ‘আরণ্যক’। অবশেষে ভগবৎকৃপায় বুদ্ধদেব আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, তখন সমস্ত জাতি বৌদ্ধধর্মে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আবার যখন নাস্তিকেরা সমগ্র জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, তখন জ্ঞানিগণ দেখিলেন—অদ্বৈতবাদই ভারতকে এই জড়বাদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। দুইবার এই অদ্বৈতবাদ ভারতকে জড়বাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রথম, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে জড়বাদ অতি প্রবল হইয়াছিল—ইওরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যে ধরনের জড়বাদ আছে, উহা সেরূপ নহে, উহা অপেক্ষা অনেক জঘন্য। আমি একপ্রকারের জড়বাদী, কারণ আমি একটি মাত্র সত্তায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বাদীও এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তিনি শুধু উহাকে ‘জড়’ আখ্যা দেন, আর আমি উহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলি। জড়বাদী বলেন—এই জড় হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি—ব্রহ্ম হইতে সমুদয় হইয়াছে। এরূপ জড়বাদের কথা এখানে বলিতেছি না, আমি চার্বাক-মতের কথা বলিতেছি : খাও দাও, মজা কর; ঈশ্বর আত্মা বা স্বর্গ বলিয়া কিছু নাই; ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত দুষ্ট পুরোহিতের কল্পনামাত্র—‘যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।’—এইরূপ নাস্তিকতা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এত বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, উহার এক নাম ছিল—

‘লোকাযত-দর্শন’। এই অবস্থায় বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বৎসর পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডাল বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানাপ্রকার মানুষ ও জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে অতি নীচজাতি হইলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বেশ সদাচারপরায়ণ হইল। ইহাদের কিন্তু নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল—নানা মন্ত্রতন্ত্রে, ভূত ও দেবতায় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধধর্মপ্রভাবে ঐগুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানাপ্রকার বিষয়ের খিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার জড়বাদের মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল—সম্ভ্রান্ত লোক যথেষ্টাচারী ও সাধারণ লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য আসিয়া বেদান্তকে পুনরুদ্দীপিত করিলেন। তিনি উহাকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে বিচারভাগ বড় অস্ফুট। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন। উহা দ্বারা উপনিষদের সিদ্ধান্ত গুলি যুক্তিবিচারের সাহায্যে প্রমানিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে।

ইওরোপেও আজকাল ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। এই অবিশ্বাসীদের মুক্তির জন্য—তাহারা যাহাতে বিশ্বাস করে সেজন্য—তোমরা জগৎ জুড়িয়া প্রার্থনা করিতে পারো, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবে না; তাহারা যুক্তি চায়। সুতরাং ইওরোপের মুক্তি এখন এই যুক্তিমূলক ধর্ম—অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদই, ব্রহ্মের এই নির্গুণ ভাবই পণ্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যখনই ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্যই ইওরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে।

এই দর্শন সম্পর্কে আর একটি কথা বলিব। প্রাচীন উপনিষদগুলি অতি উচ্চ স্তরের কবিত্বে পূর্ণ এই-সকল উপনিষদ্বত্তা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন। প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়া জগতের অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম

সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতা যেন উপনিষদের ঋষিগণকে সাধারণ মানব হইতে বহু উর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রচার করিতেন না, দার্শনিক বিচার করিতেন না বা লিখিতেনও না। তাঁহাদের হৃদয় হইতে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হইত। বুদ্ধদেবের মধ্যে আমরা দেখি মহৎ সর্বজনীন হৃদয়, অনন্ত সহিষ্ণুতা; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে যুক্তির প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এখন চাই এই প্রখর জ্ঞানের সহিত বুদ্ধদেবের এই হৃদয়-এই অদ্ভুত প্রেম ও করুণা সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা যুক্তিমূলক হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, গভীর প্রেম ও করুণার যোগ থাকে। তবেই মনিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক গড়িয়া তুলতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সর্বকাল ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে। যদি আপনারা বাড়ি গিয়া স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। তাহা হইলেও নিশ্চয় জানিবেন, আধুনিক বিজ্ঞানকে এই পথেই আসিতে হইবে-এখনই প্রায় এই পথে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন কোন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানার্চ্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্তন করিতেছেন?—

‘অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ।।’ ১

—যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, তদ্রূপ সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন। বিজ্ঞানের গতি কোন দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইওরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন উভয়ে এক স্থানে পৌঁছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই

এক অনন্ত সর্বভৌম সত্তায় পৌঁছিতেছি-যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্বরূপ। জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছিতেছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ। আর সমগ্র মানবজাতিই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাদের গতি কখনই বন্ধনের দিকে হইতে পারে না। মানুষ নীতিপরায়ণত হইবে কেন? কারণ নীতিয় মুক্তির, এবং দুর্নীতিই বন্ধনের পথ।

১ কঠ উপ. , ২/২/৯

অদ্বৈতবাদের আর একটি বিশেষত্ব এই, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সূত্রপাত হইতেই উহা অন্যধর্ম বা অন্য মতকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে না। ইহা অদ্বৈতবাদের আর একটি মহত্ত্ব-ইহা প্রচার করা মহা সাহসের কার্য যে,

‘ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন।।’ ১

-জ্ঞানিরা অজ্ঞ ও কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকলপ্রকার কর্মে যুক্ত করিবেন।

অদ্বৈতবাদ ইহাই বলে-কাহারও মতি বিচলিত করিওনা, কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহায্য কর। অদ্বৈতবাদ যে-ঈশ্বর প্রচার করেন, সেই ঈশ্বর জগতের সমষ্টিস্বরূপ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই সকল মতকে গ্রহণ করিবে। যদি এমন কোনো সর্বজনীন ধর্ম থাকে, যাহার লক্ষ্য সকলকেই গ্রহণ করা, তাহা হইলে তাহাকে কেবল কতকগুলি লোকের গ্রহণোপযোগী ঈশ্বরের ভাব প্রচার করিলে চলিবে না, উহা সর্বভাবের সমষ্টি হওয়া আবশ্যিক।

১গীতা, ৩/ ২৬

অন্য কোনমতে এই সমষ্টির ভাব তত পরিস্ফুট নহে। তাহা হইলেও তাঁহারা সকলেই সেই সমষ্টিকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এই জন্য যে, উহা সর্বদাই সমষ্টি হইবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্যই অদ্বৈতবাদের সহিত ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই কোন বিরোধ ছিল না। ভারতে আজকাল অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন; তাঁহাদের সংখ্যা সর্বাধিক। কারণ দ্বৈতবাদ কম-শিক্ষিত লোকের মন স্বভাবতই আকর্ষণ করে। দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, দ্বৈতবাদ জগতের খুব স্বাভাবিক সুবিধাজনক ব্যাখ্যা, কিন্তু এই দ্বৈতবাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদীর কোন বিরোধ নাই। দ্বৈতবাদী বলেন : ঈশ্বর জগতের বাহিরে স্বর্গে-স্থানবিশেষে আছেন। অদ্বৈতবাদী বলেন : ঈশ্বর জগতের আত্মার অন্তরাত্মা; ঈশ্বরকে দূরবর্তী বলাই যে নাস্তিকতা। তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বলো কি করিয়া? ঈশ্বর হইতে মানুষ পৃথক্-ইহা মনে করাও যে ভয়ানক। তিনি অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা আমাদের অধিকতর সন্নিহিত। ‘তুমিই তিনি’-এই একত্বসূচক বাক্য ব্যতীত কোন ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই যাহা দ্বারা এই নিকটত্ব প্রকাশ করা যাইতে পারে। যেমন দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান, মনে করেন-উহা ঈশ্বর নিন্দা, অদ্বৈতবাদীও তেমনি দ্বৈতবাদী কথায় ভয় পান ও বলেন,- ‘মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে জেয় বস্তুর ন্যায় ভাবিতে সাহস করে?’ তাহা হইলেও তিনি জানেন ধর্মজগতে দ্বৈতবাদের স্থান কোথায়-তিনি জানেন দ্বৈতবাদী তাঁহার দৃষ্টিকোণ হইতে ঠিকই দেখিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত কোন বিবাদ নাই। যখন তিনি সমষ্টিভাবে না দেখিয়া ব্যষ্টিভাবের দিক হইতে দেখিতেছেন, তখন তাহাকে অবশ্য বহু দেখিতে হইবে। ব্যষ্টিভাবের দিক হইতে দেখতে গেলে, তাঁহাকে অবশ্যই ভগবানকে বাহিরে দেখিতে হইবে-এরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইতে পারে না। দ্বৈতবাদী বলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতে থাকিতে দাও। তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী জানেন, দ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহারা সকলে সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন।

এইখানেই দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদী স্বভাবতই এমন এক সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যমাত্র, এবং যেমন মানুষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে আবার কতকগুলি অপ্রিয় ব্যক্তি থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তেমনি আছে। তিনি বিনা কারণেই কাহারও প্রতি সম্ভ্রষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বিরক্ত। আপনারা দেখিবেন—সকল জাতির মধ্যেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, ‘আমরাই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কেহ নহেন; যদি অনুতপ্তহৃদয়ে আমাদের শরণাগত হও, তবেই আমাদের ঈশ্বর তোমাকে কৃপা করিবেন।’ আবার কতকগুলি দ্বৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরও ভয়ানক। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যাহাদের প্রতি সদয়, যাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাঁহারা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট—আর কেহ যদি মাথা কুটিয়া মরে, তথাপি ঐ অন্তরঙ্গ-দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।’ আপনারা দ্বৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই। এজন্যই এই-সকল ধর্ম চিরকাল পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছি এবং করিবে। আবার এই দ্বৈতবাদের ধর্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়, কারণ ইহা অশিক্ষিতদের মন বেশী আকর্ষণ করে। দ্বৈতবাদী ভাবেন, একজন দণ্ডধারী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দাঁড়াইতে পারে না। মনে কর, একটা ছেক্‌ড়া গাড়ির ঘোড়া বজ্রতা দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিবে লগুনের লোকগুলি বড় খারাপ, কারণ প্রত্যহ তাহাদিগকে চাবুক মারা হয় না। সে নিজে চাবুক খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সে ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি বুঝিবে? চাবুক কিন্তু লোককে আরও খারাপ করিয়া তোলে। গভীর চিন্তায় অক্ষম সাধারণ লোক সকলদেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। গরীব বেচারারা চিরকাল নির্যাতিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহাদের মুক্তির ধারণা শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া। অপরপক্ষে আমরা ইহাও জানি, সকল দেশের চিন্তাশীল মহাপুরুষগণই এই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব লইয়া কাজ করিয়াছেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ঈশা বলিয়াছেন, ‘আমি ও আমার পিতা এক।’ এইরূপ ব্যক্তিই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে শক্তি-সঞ্চার করিতে সমর্থ। এই শক্তি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবের প্রানে শুভ মুক্তিপদ শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। আমরা ইহাও জানি, সেই মহাপুরুষ অদ্বৈতবাদী বলিয়া অপরের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। তিনি

সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন, ‘আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’। সাধারণ লোকদিগকে, যাহারা সগুণ ঈশ্বর অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর ভাব ধারণা করিতে পারে না, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন; কিন্তু ইহাও বলিলেন : যখন সময় আসিবে তখন তোমরা জানিবে—‘আমি তোমাদের মধ্যে, তোমরা আমাতে’। কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে আরও খোলাখুলিভাবে বলিয়াছিলেন, ‘তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত একীভূত হইতে পারো, যেমন আমি ও আমার পিতা অভেদ।’

বুদ্ধদেব দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে মন দিতেন না। সাধারণ লোক তাঁহাকে নাস্তিক ও জড়বাদী আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটি সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, বুদ্ধদেব তাহাই প্রচার করিয়া-ছিলেন। যেখানেই কোনপ্রকার নীতির বিধান দেখিবে, সেখানেই তাঁহার প্রভাব, তাঁহার আলোক লক্ষ্য করিবে। জগতের এই-সকল উচ্চহৃদয় ব্যক্তিকে তুমি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ এখন মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এমন এক সময় আসিয়াছে, যাহা শতবর্ষ পূর্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই; এখন এমন জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এ-সময় কি আর লোককে ঐ-ধরনের সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। লোকে পশুর মতো চিন্তাশক্তিহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইহা অসম্ভব। এখন প্রয়োজন—উচ্চতম জ্ঞানের সহিত মহত্তম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত প্রেমের সংযোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সঙ্গে এক হওয়াই একমাত্র ধর্ম; আর তিনি ভগবানের এই তিনটি গুণের কথাই বলেন—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখন থাকিতে পারে না। আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত আনন্দ বা প্রেম থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্তা জ্ঞান ও আনন্দের চরম উন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে। আমরা চাই—সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি। শঙ্করের মেধার সহিত বুদ্ধের হৃদয় লাভ করা সম্ভব। আশা করি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

৭. জগৎ(১)

[নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা ১৯শে জানুআরি, ১৮৯৬]

সুন্দর কুসুমরাশি চতুর্দিকে সুবাস ছড়াইতেছে, প্রভাতের সূর্য অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হইয়া পরম রমণীয় হইয়াছে। সমগ্র জগৎই সুন্দর, আর মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই সৌন্দর্য সন্তোষ করিতেছে। গম্ভীরভাবব্যঞ্জক ও ভয়োদ্দীপক শৈলমালা, খরস্রোতা সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনী, পদচিহ্নহীন মরুদেশ, অনন্ত অসীম সাগর, তারকামণ্ডিত গগন—এ-সকলই গম্ভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক, অথচ মনোহর; প্রকৃতি-নামক সমুদয় সত্তা স্মরণাতীত কাল হইতে মানবমনের উপর কাজ করিতেছে, মানব চিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ক্রমাগত মানবহৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—এগুলি কি? এবং এগুলির উৎপত্তিই বা কোথায়? মানবের অতি প্রাচীন রচনা বেদের প্রাচীনতম ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে দেখিতে পাই। কোথা হইতে ইহা আসিল? যখন ‘অস্তি, নাস্তি’ কিছুই ছিলনা, ‘অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত’^১ ছিল, তখন কে এই জগৎ সৃষ্টি করিল? কেমন করিয়াই বা করিল? কে এই রহস্য জানে? বর্তমান সময় পর্যন্ত এই প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে; লক্ষ লক্ষ বার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে, আরও লক্ষ লক্ষ বার উহার উত্তর দিতে হইবে। ঐ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। প্রত্যেক উত্তরে কিছু না কিছু সত্য আছে—কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্যও ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিতেছে। আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের নিকট ঐ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা বর্তমান কালের জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া আপনাদের সমক্ষে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিতে পাই; এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূর্বেই মীমাংসিত হইয়াছে। প্রথম বিষয় এই : এমন এক সময় ছিল, ‘যখন অস্তি-নাস্তি কিছুই ছিল না, জগৎ ছিল না, এই গ্রহ-জ্যোতিষ্কগণ, সাগর মহাসাগর, নদী শৈলমালা, নগর গ্রাম, মনুষ্য ইতরপ্রাণী

উদ্ভিদ, বিহঙ্গসহ আমাদের জননী বসুন্ধরা, এই অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি ছিল না—এ বিষয় পূর্ব হইতেই জানা ছিল। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ? কি করিয়া মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ নিজের চতুর্দিকে কি দেখে? একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লও। মানুষ দেখে, উদ্ভিদটি ধীরে ধীরে মাটি ঠেলিয়া উঠিতেছে, বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হয়তো একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আবার মরিয়া যায়—রাখিয়া যায় কেবল বীজ। উহা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। বীজ হইতে উহা আসে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজে উহার পুনঃপরিণতি। একটি পাখিকে দেখ, কেমন উহা ডিম হইতে জন্মায়, সুন্দর পাখির রূপ ধরে, কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে, পরে আবার মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় কেবল কতকগুলি ডিম, ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। তির্যগ্জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন কতকগুলি বীজ—কতকগুলি মূল উপাদান—কতকগুলি সূক্ষ্ম আকার হইতে আরম্ভ, এগুলি স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, কিছুকালের জন্য ঐরূপে চলে, পুণরায় সূক্ষ্মরূপে চলিয়া গিয়া উহাদের লয় হয়। বৃষ্টির ফোঁটাটি, যাহার মধ্যে সুন্দর সূর্যকিরণ খেলা করিতেছে, বাতাসে অনেক দূরে চলিয়া গিয়া পাহাড়ে পৌঁছায়, সেখানে বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ঘুরিয়া উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে মিলিত হয়। আমাদের চারিদিকের প্রকৃতির সকল বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ; আর আমরা জানি বর্তমানকালে হিমশিলা ও নদীগুলি বড় বড় পর্বতের উপর কাজ করিতেছে, ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে পর্বতগুলি চূর্ণ করিতেছে, গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে—সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের মতো শক্ত হইতেছে, স্তূপীকৃত হইয়া ভবিষ্যতে পর্বত হইবে। আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইবে—এইরূপ চলিবে। বালুকা হইতে এই শৈলমালার উদ্ভব, আবার বালুকায় পরিণতি। বড় বড় জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধেও এই কথা; আমাদের এই পৃথিবীও নীহারিকাময় পদার্থ হইতে আসিয়াছে—ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়া বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট আমাদের ভবিষ্যতে উহা আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে, শেষে সেই মূল নীহারিকাময় সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইবে। প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে ইহা

ঘটিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই ইহা ঘটিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই ইহা হইতেছে। ইহাই মানুষের ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস। ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস। নিবাস-ভূমি হইয়াছে।

১ ঋগ্বেদ-নাসদীয় সূক্ত

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্রই একরূপ; যদি ইহা সত্য হয় এ পর্যন্ত কোন মনুষ্যজ্ঞানই ইহা খণ্ডন করে নাই—যে, একটি ক্ষুদ্র বালুকণা যে-প্রণালী ও যে-নিয়মে সৃষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য তারা এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডও সেই একই প্রণালীতে—একই নিয়মে সৃষ্ট; ইহা যদি সত্য হয় যে, একটি পরমাণু যে কৌশলে নির্মিত, সমুদয় জগৎও সেই কৌশলে নির্মিত; যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদয় জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় আমরা বলিতে পারি—‘একখন্ড-মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগতের সমস্ত মৃত্তিকাকে জানিতে পারি।’^১ একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লইয়া উহার জীবন-চরিত আলোচনা করিলে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানিতে পারি। একটি বালুকণার গতি পর্যবেক্ষণ করিলে সমুদয় জগতের রহস্য জানিতে পারা যাইবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব আলোচনার ফল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রয়োগ করিয়া প্রথমতঃ ইহাই পাইতেছি যে, আদি ও অন্ত প্রায় সদৃশ্য। পর্বতের উৎপত্তি বালুকা হইতে, বালুকায় আবার উহার পরিণতি; নদী বাষ্প হইতে আসে, আবার বাষ্প যায়; উদ্ভিদজীবন আসে বীজ হইতে, আবার বীজেই যায়; মনুষ্যজীবন আসে জীবাণু হইতে, আবার জীবাণুতেই ফিরিয়া যায়। নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ-উপগ্রহ নীহারিকাময় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, আবার সেই নীহারিকায় লয় পায়। ইহা হইতেই আমরা শিখি কি? শিখি এই যে, ব্যক্ত আর্থাৎ স্থূল অবস্থা—কার্য; আর সূক্ষ্মভাব—উহার কারণ। সর্ব দর্শনের জনকস্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন পূর্বে প্রমাণ করিয়াছেন, ‘নাশঃ কারণলয়ঃ’।

যদি এই টেবিলটির নাশ হয় তো উহা কেবল উহার কারণরূপে ফিরিয়া যায় মাত্র—সেই সূক্ষ্মরূপও পরমাণুতে ফিরিয়া যাইবে, যাহাদের সম্মিলনে এই টেবিল নামক পদার্থটি উৎপন্ন হইয়াছিল। মানুষ যখন মরে, তখন যে-সকল পদার্থে তাহার দেহ নির্মিত,

সেইগুলিতেই ফিরিয়া যায়। এই পৃথিবীর ধ্বংস হইলে যে পদার্থ-সমষ্টি ইহাকে এই আকার দিয়াছিল, তাহাতে ফিরিয়া যাইবে। ইহাকেই বলে নাশ-কারণে লয়। সুতরাং আমরা শিখিলাম, কার্য কারণের সহিত অভেদ-ভিন্ন নহে, কারণটিই রূপ-বিশেষ ধারণ করিয়া কার্য নামে পরিচিত হয়। যে উপাদানগুলিতে ঐ টেবিলের উৎপত্তি, তাহাই কারণ; আর টেবিলটি কার্য, এবং ঐ কারণগুলি এখানে টেবিলরূপে বর্তমান। এই গেলাসটি একটি কার্য -উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্যে এখনও বর্তমান দেখিতেছি। কাচ নামক কতকটা জিনিস আর সেই সঙ্গে গঠনকারীর হাতের শক্তি নিমিত্ত ও উপাদান এই দুইটি কারণ মিলিয়া গেলাস-নামক এই আকারটি হইয়াছে। ঐ দুই কারণই উহাতে বর্তমান। যে শক্তিটি কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল তাহা সংহতিশক্তিরূপে ইহাতে রহিয়াছে, তাহা না থাকিলে গেলাসের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলির সব খসিয়া পড়িবে এবং উহার উপাদান কাচও ইহাতে বর্তমান। গেলাসটি কেবল ঐ সূক্ষ্ম কারণগুলির আর একরূপে পরিণতি এবং যদি এই গেলাসটি ভাঙিয়া ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটি সংহতিরূপে উহাতে বর্তমান ছিল, তাহা ফিরিয়া নিজ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আবার পূর্বরূপ ধরিবে এবং সেই রূপেই থাকিবে, যতদিন না পুনরায় নূতন আকার লাভ করে।

১ ছান্দোগ্য উপ., ৬/ ১/ ৪

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, কার্য কখন কারণ হইতে ভিন্ন নয়; উহা সেই কারণে পুনরাবির্ভাব মাত্র। তাহার পর আমরা শিখিলাম এই ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপ বা আকৃতি -যেগুলিকে আমরা উদ্ভিদ তির্যগ্জাতি বা মানব বলি, সেগুলি অনন্তকাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা এক বৃক্ষ হয়-আবার অন্য বীজ হয়, আবার এক বৃক্ষ হয়-এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিন্দু পাহাড়ের গা বাহিয়া সমুদ্রে যায়, আবার বাষ্প হইয়া উঠে-পাহাড়ে যায়, আবার সমুদ্রে ফিরিয়া আসে। উঠিতেছি, পড়িতেছে-চক্র ঘুরিতেছে। সমুদয় জীবন

সম্বন্ধেই এইরূপ-সমুদয় অস্তিত্ব, যাহা কিছু দেখিতে শুনিতে ভাবিতে বা কল্পনা করিতে পারি,

যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে তাহাই এই ভাবে চলিতেছে ঠিক মনুষ্যদেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। সমুদয় সৃষ্টিই এইরূপে চলিয়াছে, একটি তরঙ্গ উঠিতেছে, একটি পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। প্রত্যেক তরঙ্গেরই সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া গহ্বর, প্রত্যেক গহ্বরের সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া তরঙ্গ। সর্বত্র একরূপ বলিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতি থাকার দরুন একই নিয়ম খাটিবে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যেন এককালে কারণে লীন হইতে বাধ্য; সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা পৃথিবী মন শরীর-যাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সকল বস্তুই যেন নিজ সূক্ষ্ম কারণে লীন বা অন্তর্হিত হইবে-আপাতদৃষ্টিতে বিনষ্ট হইবে। বাস্তবিক কিন্তু উহারা সূক্ষ্মরূপে উহাদের কারণে থাকিবে; এইসব সূক্ষ্মরূপ হইতে আবার তাহারা পৃথিবী চন্দ্র সূর্য তারা রূপে বাহির হইবে।

এই উত্থান-পতন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জানিবার আছে। বৃক্ষ হইতে বীজ আসে। বীজ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হয় না। উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতিসূক্ষ্ম অব্যক্ত কার্যের জন্য সময়ের প্রয়োজন। বীজকে খনিকক্ষন মাটির নীচে থাকিয়া কার্য করিতে হয়। বীজ নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, নিজেকে যেন খানিকটা অধঃপতিত করে, এবং ঐ অবনতি হইতে উহার পুনর্জন্ম হইয়া থাকে। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্য ও অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মরূপে কার্য করিতে হয়, যাহাকে প্রলয় বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বলে, তাহার পর আবার সৃষ্টি হয়। জগৎপ্রবাহের একটি প্রকাশকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে ইহার পরিণতি, কিছুকাল সেই অবস্থায় স্থিতি এবং পুনরাবির্ভাবকে সংস্কৃতে ‘কল্প’ বলে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই এইরূপে চলিয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্বর্তী প্রত্যেক পরমাণু পর্যন্ত সব জিনিসই এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে।

এখন আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসিল-বিশেষতঃ বর্তমান কালের পক্ষে। আমরা দেখিতেছি সূক্ষ্মতর রূপগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতেছে, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর

হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য অভেদ-কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কিছুই আসিতে পারে না; শুধু তাহা নহে, কারণই কার্যের ভিতর আর একরূপে বর্তমান। তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কোন্ বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? পূর্ববর্তী সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে। মানুষ কোন্ বস্তু হইতে উদ্ভূত? পূর্ববর্তী সূক্ষ্মরূপ হইতে। বৃক্ষ কোথা হইতে হইল? বীজ হইতে। সমুদয় বৃক্ষটি বীজে বর্তমান ছিল-উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এই জগতেরই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এখন উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। উহা পুনরায় ঐ সূক্ষ্মরূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এখন আমরা দেখিলাম, সূক্ষ্মরূপগুলি ব্যক্ত হইয়া স্থূল হইতে স্থূলতর হয়, যতদিন না উহারা উহাদের চরম সীমায় পৌঁছে; চরমে পৌঁছিলে তাহারা আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়। এই সূক্ষ্ম হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতররূপে পরিণতি কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান-পরিবর্তন-ইহাকেই বর্তমানকালে ‘ক্রমবিকাশ’-বাদ বলে। ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবতঃ এই ‘ক্রমবিকাশ’-বাদীদের সহিত বিবাদ করিবেন না। কিন্তু আমাদের কাছে আরও একটি বিষয় জানিতে হইবে-তাহা এই যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটি আসিয়াছে, আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজরূপে ক্রম-সঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই ঐ বীজে বর্তমান। শূন্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, আর বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষেই উৎপন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ-কেবল ঐ বীজমাত্র; আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। সমুদয় মানুষটাই একটি জীবাণুর ভিতরে, ঐ জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া মানবাকারে পরিণত হয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই-সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে ছিল। সবই কারণে-উহার সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে। অতএব ‘ক্রমবিকাশ’-বাদ সত্য। তবে ঐ সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া রহিয়াছে; অতএব যে ক্ষুদ্র

অণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ক্রমবিকাশবাদীদের (Darwin's Evolution) সহিত

আমাদের কোন বিবাদ নাই, কারণ আমরা ক্রমশ দেখিব, যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াটি স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশক না হইয়া সহায়ক হইবেন।

আমরা দেখিলাম শূন্য হইতে কিছুর উৎপত্তি হয় না। সকল জিনিসই অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল তরঙ্গের ন্যায় একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, আবার স্থূল ব্যক্ত ভাবে প্রকাশ, সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এখন বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে-আবার ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাবে ধারণ করিবে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর। আমরা দেখি দুইটি বিষয় একত্র মিলিত হইয়াই ঐ উদ্ভিদে এক অখণ্ড বস্তুরূপে প্রতীত করাইতেছে-উহার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং উহার ক্ষয় ও বিনাশ। এই দুইটি মিলিয়াই উদ্ভিদ-জীবন নামক এই একত্ব বিধান করিতেছে। এইরূপে ঐ উদ্ভিদ-জীবনকে প্রাণ-শৃঙ্খলের একটি পর্ব বলিয়া ধরিয়া আমরা সমুদয় বস্তুরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি-জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি। মানুষ ঐ শৃঙ্খলের একটি পর্ব; আর যেমন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন-নানারূপ বানর, তারপর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদগণ যেন ঐ প্রাণ-শৃঙ্খলের অন্যান্য পর্ব। এখন যে ক্ষুদ্রতম কোষ হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেখান হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর, আর প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই যে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বিদ্যমান, ইতঃপূর্বে লব্ধ ঐ নিয়ম এস্থলে প্রয়োগ করিলে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি নিম্নতম জন্তু হইতে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সকল শ্রেণীই অবশ্য অপর কিছুর ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। কিসের ক্রমসঙ্কোচ? ইহাই প্রশ্ন। কোন পদার্থ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল? ক্রমবিকাশবাদী বলিবেনঃ ইহা যে ঈশ্বরের

ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা-তোমাদের এ-ধারণা ভুল। কারণ তোমরা বলো, চৈতন্যই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে আসে। মানুষে ও উচ্চতর জন্তুতেই কেবল আমরা চৈতন্য দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মবার পূর্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই ক্রমবিকাশবাদীদের আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা এই মাত্র যে নিয়ম আবিষ্কার করিলাম, তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখা যাক—কি সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়। বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব আবার বীজে উহার পরিণাম—সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম একই। পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই উহার বিলয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা-আমরা দেখিতেছি, আদি অন্ত উভয়ই সমান। এই সমুদয় শৃঙ্খলের শেষ কি? আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপে অন্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব। এই সমুদয় ‘ক্রমবিকাশশীল’ জীব-প্রবাহের -যাহারা এক প্রান্তে জীবণু, অপর প্রান্তে পূর্ণমানব -এই-সবকে একটি জীবন বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও যে তিনি অবস্থিত ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পারো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। ‘শক্তির নিত্যতা’ নিয়ম (Law of Conservation of Energy) যদি সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি তুমি কোন যন্ত্রে পূর্ব হইতেই কোন শক্তি-প্রয়োগ না করিয়া থাকো, তবে তুমি উহা হইতে কোন কার্যই পাইতে পার না। তুমি ইঞ্জিনে জল ও কয়লারূপে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ কর, উহা হইতে ঠিক ততটুকু কার্য পাইয়া থাকো, এতটুকু বেশী নয়, কমও নয়। আমি আমার দেহের ভিতরে বায়ু খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থরূপে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, ঠিক ততটুকু কার্য করিতে সমর্থ হই। কেবল ঐ শক্তিগুলি অন্যরূপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একবিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারা যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্য কি? যদি

উহা জীবাণুতে বর্তমান না থাকে, তবে উহাকে অবশ্যই অকস্মাৎ উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে-তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ‘অসৎ’ (কিছু না) হইতে ‘সতে’র (কিছুর) উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহা হইলে ইহা একেবারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে-যেমন অন্য অন্য বিষয়ে দেখা যায়, যেখানে আরম্ভ

সেইখানেই শেষ; তবে কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত; সেইরূপ পূর্ণমানব, মুক্তপুরুষ, দেবমানব, যিনি প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহাকে আর এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইতে হয় না, যাঁহাকে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ বুদ্ধমানব বলেন, যোগীরা মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে জীবানুরূপে প্রকাশিত।

এখন এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল-আলোচনা করা যাক। জগৎ-সম্বন্ধে মানুষের চরম ধারণা কি? চৈতন্য-এক অংশের সহিত অপর অংশের সামঞ্জস্য-বিধান, বুদ্ধির বিকাশ। প্রাচীন ‘উদ্দেশ্য-বাদ’ (Design Theory) এই ধারণারই অস্ফুট আভাস। আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্যই জগতের শেষ বস্তু-সৃষ্টিক্রমের ইহাই শেষ বিকাশ, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমরা ইহাও বলিয়া থাকি যে, ইহাই যদি শেষ বিকাশ হয়, তবে আদিতেও ইহা বর্তমান ছিল। জড়বাদী বলিতে পারেন-বেশ কথা, কিন্তু মানুষ জন্মবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তখন তো জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। এ-কথায় আমাদের উত্তর এই, ব্যক্ত চৈতন্য তখন ছিল না বটে, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল-আর সৃষ্টির শেষ-পূর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য; তবে আদি কি ছিল? আদিও সেই চৈতন্য। প্রথমে সেই চৈতন্যই ক্রমসঙ্কুচিত হয়, শেষে আবার উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডে এখন যে জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার সমষ্টি অবশ্যই সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ‘ঈশ্বর’। উহাকে অন্য যে-কোন নামে অভিহিত কর না কেন, ইহাই স্থির যে, আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই নিজেকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন-যতদিন না পূর্ণমানব, খ্রীষ্টমানব

বুদ্ধমানবে পরিণত হন। তখন তিনি নিজ উৎপত্তি-স্থানে ফিরিয়া আসেন। এই জন্য সকল শাস্ত্রই বলেন, ‘আমরা তাঁহাতেই জীবিত, তাঁহাতেই চলি ফিরি, তাঁহাতেই আমাদের সত্তা।’^১ এই জন্যই সকল শাস্ত্রই বলেন, ‘আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব।’ বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভয় পাইও না-পরিভাষায় যদি ভয় পাও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য হইবে না। এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই তত্ত্ববিদগণ ‘ঈশ্বর’ বলিয়া থাকেন।

১ তৈত্তি. উপ., ৩/ ১

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন : আপনি পুরাতন শব্দ ‘ঈশ্বর’ (God) ব্যবহার করেন কেন? ইহার উত্তর এই—পূর্বোক্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য যত শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, তন্মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। উহা অপেক্ষা ভাল শব্দ আর খুঁজিয়া পাইবে না, কারণ মানুষের সকল আশা-ভরসা, সকল সুখ ঐ এক শব্দে কেন্দ্রীভূত। এখন ঐ শব্দ পরিবর্তন করা অসম্ভব। যখন বড় বড় সাধু-মহাত্মা ঐরূপ শব্দ গড়েন, তখন তাঁহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরূপেই বুঝিতেন। ক্রমে সমাজে যখন ঐ শব্দগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন অজ্ঞ লোকেরা ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করতে লাগিল। তাহার ফলে শব্দগুলির মহিমা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। ‘ঈশ্বর’ শব্দটি স্মরণাতীত কাল হইতে আসিয়াছে, আর যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, এবং এক সর্বব্যাপী চৈতন্যের ভাব ঐ শব্দের ভিতর রহিয়াছে। কোন নির্বোধ ঐ শব্দ-ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা ত্যাগ করিতে বলা? একজন আসিয়া বলিবে আমার এই শব্দটি লও, অপরে আবার তাহার শব্দটি লইতে বলিবে। সুতরাং এই ধরণের বৃথা শব্দের কোন অন্ত থাকিবে না। তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটিই ব্যবহার কর, কিন্তু মন হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া দিয়া, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি-তাহা ভালোভাবে বুঝিয়া ঐ শব্দ আরও ভালোভাবে ব্যবহার কর। যদি তোমরা ‘ভাবানুশঙ্গ-বিধানে’ র (Law of Association of Ideas) শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হও, তবে জানিবে এই শব্দের সহিত নানাপ্রকার মহান্ ওজস্বী ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে; লক্ষ লক্ষ মানুষ এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঐ শব্দের পূজা করিয়াছে, আর উহার সহিত যাহা

কিছু অতি উচ্চ ও সুন্দর, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, মনুষ্য-প্রকৃতিতে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব উহা ঐ-সকল ভাবের উদ্দীপক কারণ স্বরূপ, সুতরাং উহাকে ত্যাগ করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনাদের নিকট উহা

কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিত না। তথাপি ঐ-সকল বিচারের পর আমরা সেই প্রাচীন পরম পুরুষের নিকটেই পৌঁছিলাম।

আমরা এখন দেখিলাম যে, জড় শক্তি মন চৈতন্য বা অন্যনামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে ‘পরম প্রভু’ বলিয়া অভিহিত করিব। যাহা কিছু দেখ, শোন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি-ঠিক বলিতে গেলে, তাঁহারই পরিণাম-আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি স্বয়ং। তিনি সূর্য ও তারকারূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী বসুন্ধরা, তিনিই স্বয়ং সমুদ্র। তিনিই মৃদু বৃষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই মৃদু বাতাস-যাহা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি, তিনিই দেহে শক্তিরূপে কার্য করিতেছেন। তিনিই বজ্রতা, তিনিই বজ্রা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। তিনিই দেহে শক্তিরূপে কার্য করিতেছেন। তিনিই বজ্রতাম তিনিই বজ্রা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। তিনিই এই বজ্রতা-মঞ্চ-যাহার উপর আমি দণ্ডায়মান, তিনিই ঐ আলোক-যাহা দ্বারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি, এ-সবই তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন; তিনিই নীচে নামিয়া আসিয়া অতি নিম্নতম পরমাণু হন; আবার ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া স্বরূপে পুনর্মিলিত হন-ইহাই জগতের রহস্য। ‘তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবন-গর্বে ভ্রমণশীল যুবা, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ-দণ্ড ধরিয়া কোনরূপে চলিতেছে, তুমিই সকল বস্তুতে - হে প্রভু, তুমিই সবকিছু’^১ -জগৎপ্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই কেবল মানবযুক্তি মানববুদ্ধি পরিতৃপ্ত হয়। এক কথায়

ঈশ্বরী বিন্দুশঙ্কর । ঈশ্বরী বিন্দুশঙ্কর বর্ণনা ও রচনা

বলিতে গেলে, আমরা তাঁহা হইতেই জন্মগ্রহণ করি, তাঁহাতেই জীবিত এবং তাঁহাতেই
আবার প্রত্যাবর্তন করি।

৮. জগৎ(২)

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড

[নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত, ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৯৬]

মনুষ্যমন স্বভাবতই বহির্মুখী। মন যেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া উঁকি মারিতে চায়। চক্ষু অবশ্যই দেখিবে, কর্ণ অবশ্যই শুনিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ্যই বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতই প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহত্ব প্রথমেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবাত্মা প্রথমেই বহির্জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আকাশ নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তরীক্ষে অন্যান্য পদার্থনিচয়, পৃথিবী নদী পর্বত সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া ছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাই। প্রথমে মানবমন অন্ধকারে অনুসন্ধান করিত করিতে বাহিরে, যাহা কিছু দেখিত, তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিত। এই রূপে সে নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেঘের অধিষ্ঠাত্রী একজন, আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবতায় বিশ্বাসী হইল। যেগুলিকে আমরা প্রকৃতির শক্তি বলিয়া জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু যতই গভীর হইতে গভীরতর অনুসন্ধান হইতে লাগিল, ততই এই বাহ্য দেবতাগণে আর মানুষের তৃপ্তি হইল না। তখন মানুষের সমগ্র শক্তি তাহার নিজের ভিতরে চালিত হইল—তাহার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। বহির্জগৎ হইতে ঐ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জগতে পৌঁছিল। বহির্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া শেষ মানুষ অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চতর সভ্যতার স্তরে, প্রকৃতির সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি হইতে, উন্নতির উচ্চতর ভূমিতে এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি হইতে, উন্নতির উচ্চতর ভূমিতে এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হয়।

এই ভিতরের মানুষই আজিকার অপরাহ্নের আলোচ্য বিষয়। এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতখানি প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের যত সন্নিহিত, আর কিছুই তত নহে। কত দেশে কত লক্ষবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। কি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি

দরিদ্র, কি ধনী, কি সাধু, কি পাপী, প্রত্যেক নরনরী সকলেই কোন না কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে নিত্য কি কিছুই নাই? এই শরীর মরিলেও এমন কি কিছু নাই, যাহা মরে না? যখনই এই শরীর ধূলিমাত্রে পরিণত হয়, তখন কি কিছুই জীবিত থাকে না? অগ্নি শরীরকে ভস্মসাৎ করিলে তাহার পর আর কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে না? যদি থাকে, তবে তাহার নিয়তি কি? উহা যায় কোথায়? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, আর যতদিন এই সৃষ্টি থাকিবে, যতদিন মানব-মস্তিষ্ক চিন্তা করিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে। ইহার উত্তর যে কখনও পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে; যখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তখনই উত্তর আসিয়াছে; আর যত সময় যাইতেছে, ততই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে ঐ প্রশ্নের উত্তর চিরদিনের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল, আর পরবর্তী সময়ে ঐ উত্তরই আবার কথিত, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া আমাদের বুদ্ধির নিকট উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। অতএব আমাদিগকে কেবল ঐ উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। সকলের চিত্তাকর্ষক এই সমস্যা-গুলির উপর নূতন আলোকপাত করিব, এমন ভান করি না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, সেই সনাতন মহান্ সত্য বর্তমান কালের ভাষায় প্রকাশ করিব, প্রাচীনদিগের চিন্তা আধুনিকদিগের ভাষায় ব্যক্ত করিব, দার্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব—দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা দুর্বল মানুষের ভাষায় প্রকাশ করিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে। কারণ আমরা পরে দেখিব, যে ঐশী সত্তা হইতে ঐ-সকল ভাব প্রসূত, তাহা মানবেও বর্তমান—যে সত্তা ঐ চিন্তাগুলিকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া নিজেই ইহা বুঝিবেন।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি। এই দর্শনক্রিয়ার জন্য কতগুলি জিনিসের আবশ্যক? প্রথমতঃ চক্ষু-চক্ষু অবশ্যই থাকা চাই। আমার অন্যান্য ইন্দ্রিয় অবিকল থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। অতএব প্রথমতঃ অবশ্যই আমার চক্ষু থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ চক্ষুর পশ্চাতে আর একটা কিছু থাকা আবশ্যক—সেটিই প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয়। তাহা না থাকিলে দর্শনক্রিয়া অসম্ভব। চক্ষু বাস্তবিক

ইন্দ্রিয় নয়, উহা দর্শনের যন্ত্র মাত্র; যথার্থ ইন্দ্রিয়টি চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত—উহা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেन्द्र। যদি ঐ কেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া যায়, তবে মানুষের অতি নির্মল দুটি চক্ষু থাকিতেও সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব দর্শনক্রিয়ার জন্য ঐ প্রকৃত ইন্দ্রিয়টি থাকা বিশেষ আবশ্যিক। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও সেইরূপ। বাহিরের কর্ণ কেবল ভিতরে শব্দ লইয়া যাইবার যন্ত্রমাত্র। উহা মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে পৌঁছানো চাই। তবু ইহাই শ্রবণক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট হইল না। কখন কখন এরূপ হয়, তুমি তোমার গ্রন্থাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছ—এমন সময় ঘড়িতে বারোটো বাজিল, কিন্তু তুমি শুনিতে পাইলে না। কেন শুনিতে পাইলে না? এখানে কিসের অভাব ছিল? মন ঐ ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত ছিল না। অতএব আমরা দেখিতেছি, তৃতীয়তঃ মন অবশ্যই থাকা চাই। প্রথম বাহ্যযন্ত্র; তার পর এই বাহ্যযন্ত্রটি ইন্দ্রিয়ের নিকট যেন ঐ বিষয়কে বহন করিয়া লইয়া যায়; তারপর আবার মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। যখন মন ঐ মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে যুক্ত না থাকে, তখন কর্ণ-যন্ত্রে এবং মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমরা উহা বুঝিতে পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে এই বিষয়ের ছাপ আরও ভিতরে বহন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি। তবু যথেষ্ট হইল না। বুদ্ধিকে আবার আরও ভিতর লইয়া গিয়া এই শরীরের অধীশ্বর আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তবে তিনি আদেশ করেন—‘কর’ অথবা ‘করিও না’। তখন যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বাহিরে আসে—প্রথমে বুদ্ধিতে, তারপর মনে, তারপর মস্তিষ্ককেন্দ্রে, তারপর বহির্যন্ত্রে; তখনই বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল, বলা যায়।

যন্ত্রগুলি মানুষের স্কুলদেহে—বাহিরেই অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে, বুদ্ধিও নহে। হিন্দু দর্শনে উহাদের নাম সূক্ষ্ম শরীর, খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে আধ্যাত্মিক শরীর। উহা এই শরীর হইতে অনেক সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহা আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। স্কুল শরীর অল্প দিনেই ধ্বংস হইয়া যায়—খুব সামান্য কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে এবং উহা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। সূক্ষ্ম শরীর এত সহজে নষ্ট হয় না, কিন্তু উহাও কখন সবল, কখন বা দুর্বল হয়। আমরা দেখিতে পাই—বৃদ্ধ লোকের মনে তত বল থাকে না,

আবার শরীর সবল থাকিলে মনও সবল থাকে, নানাবিধ ঔষধ মনের উপর কার্য করে, বাহিরের সকল বস্তুই মনের উপর কার্য করে, আবার মনও বাহ্য জগতের উপর কার্য করিয়া থাকে। শরীরের যেমন উন্নতি-অবনতি আছে, মনেরও তেমনি আছে; অতএব মন কখনও আত্মা হইতে পারে না। কারণ আত্মার ক্ষয় বা অধঃপতন নাই। আমরা কিভাবে উহা জানিতে পারি? কি করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরও কিছু আছে? কারণ স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় না, চৈতন্য যাহার স্বরূপ। অচেতন জড় পদার্থ কখন নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে। এই যে সম্মুখে হল (hall) দেখিতেছ, জ্ঞানই ইহার মূল বলিতে হইবে, কারণ কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা ছাড়া উহার অস্তিত্বই জানা যাইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। যদি তাহা হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহও স্বপ্রকাশ হইত। মন বা আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, উহা চৈতন্যস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার কখনও ক্ষয় হয় না। যাহা অপরের আলোকে আলোকিত, তাহার আলোক কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ, তাহার আলোকের আবির্ভাব-তিরোভাব, হ্রাস-বৃদ্ধি আবার কি? আমরা দেখিতে পাই, চন্দ্রের ক্ষয় হয়, আবার উহার কলাবৃদ্ধি হইতে থাকে—তাহার কারণ উহা সূর্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর যদি উহাকে লোহিত-তপ্ত করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া যাইবে। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, যাহা স্বপ্রকাশ তাহাতে নহে।

আমরা দেখিলাম এই স্থূলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা নিজেকে নিজে জানিতে পারে না। মনও নিজেকে নিজে জানিতে পারে না। কেন? কারণ মনের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কখন উহা সবল, আবার কখন দুর্বল হয়; বাহ্য সকল বস্তুই উহার উপর কার্য করিয়া উহাকে সবল বা দুর্বল করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আসিতেছে, তাহা মনের নিজের নহে। তবে ঐ আলো কাহার? উহা অবশ্যই এমন কাহারও যাহার পক্ষে উহা নিজস্বরূপ, যাহা অপর আলোকের প্রতিফলন নহে, কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ; অতএব

সেই আলোক বা জ্ঞান সেই পুরুষের স্বরূপ বলিয়া তাহার কখন নাশ বা ক্ষয় হয় না, উহা কখন প্রবল বা কখন মৃদু হইতে পারে না। উহা স্বপ্রকাশ-উহা আলোকস্বরূপ। আত্মা জানেন-তাহা নহে, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে -তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ; আত্মা সুখী-তাহা নহে, আত্মা সুখস্বরূপ। যে সুখী, তাহার সুখ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত। যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, উহা অপর কাহারও অস্তিত্বের প্রতিফলন। যেখানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব, বা আনন্দ-এগুলি আত্মার ধর্ম নহে, আত্মার স্বরূপ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে আমরা এ-কথা স্বীকার করিয়া লইব কেন? কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ-অস্তিত্ব-জ্ঞান আত্মার স্বরূপ, অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে? ইহার উত্তর এই-আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে; যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে আর দেহের প্রকাশ থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমায় দেখিতে পাইব না, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে মন চলিয়া গেলে তোমাদের কথা মোটেই শুনিতে পাইব না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এইরূপ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম শরীরের প্রকাশ-মনের প্রকাশে। আবার মন সম্বন্ধেও সেইরূপ। বর্হিজগতের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য করিতেছে, সামান্য কারণেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলযোগ হইলেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ আমরা সমুদয় প্রকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। কেবল যাহা অপর বস্তুর ধর্ম, যাহা অপর বস্তু হইতে গৃহীত, তাহারই পরিবর্তন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে-আত্মার প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও ঐরূপ অপরের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার কর না কেন? এইরূপ স্বীকার করিলে দোষ এই হইবে যে, এরূপ স্বীকৃতির কোন অন্ত পাওয়া যাইবে না। আবার প্রশ্ন উঠিবে, সে কাহার নিকট হইতে আলোক পাইল? যদি বলো, অপর কোন আত্মা হইতে,

তবে আবার প্রশ্ন উঠবে, সেই বা কোথা হইতে আলোক পাইল? অতএব অবশেষে আমাদিগকে এমন এক জায়গায় আসিতে হইবে, যাহার আলো অপরের নয়, নিজের। অতএব ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত এই—যেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইখানেই থামা, এবং আর অগ্রসর না হওয়া।

অতএব আমরা দেখিলাম, মানুষের প্রথমতঃ এই স্থূল দেহ, তারপর সূক্ষ্ম শরীর, উহার পশ্চাতে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা রহিয়াছেন; আমরা দেখিয়াছি, স্থূল দেহের সমুদয় গুণ ও শক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ—এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাবতই প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা শূন্য হইতে সৃষ্ট হইতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ-অপর বস্তু-নিরপেক্ষ, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগৎও শূন্য হইতে হয় নাই—আত্মা তো দূরের কথা। অতএব সর্বদাই উহার অস্তিত্ব ছিল। এমন সময় কখন ছিল না, যখন উহার অস্তিত্ব ছিল না; কারণ যদি বলো—এক সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে ‘কাল’ কোথায় অবস্থিত ছিল? কাল তো আত্মার মধ্যেই অবস্থিত। যখন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রতিফলিত হয়, আর মন চিন্তা করে, তখনই কালের উৎপত্তি। সুতরাং যখন আত্মা ছিল না, তখন চিন্তাও ছিল না, আর চিন্তা না থাকিলে কালও থাকিতে পারে না। অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তখন আত্মা যে কালে অবস্থিত, ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে মাত্র। উহা ধীরে ধীরে নিজেকে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। আত্মা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য করিয়া নিজ মহিমা বিকাশ করিতেছে, এবং শরীরের দ্বারা বাহ্য জগৎ গ্রহণ করিয়া উহাকে বুঝিতেছে। উহা একটি শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার করিতেছে, এবং যখন সেই শরীরের দ্বারা আর কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন আত্মা আর এক শরীর গ্রহণ করে।

এখন আবার আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিল। অনেক সময় লোকে এই পুনর্জন্মের কথা শুনিলেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিন্তাশীল লোকেও বিশ্বাস করিবে-আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তারপর আবার চমৎকার যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে, যদিও আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন, পরে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিব। যাহারা শূন্য হইতে আসিয়াছে, তাহারা অবশ্যই শূন্যে যাইবে। তুমি আমি বা উপস্থিত কেহই শূন্য হইতে আসে নাই, সুতরাং শূন্যে যাইবে না। আমরা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদেরকে শূন্যে পরিণত করিতে পারে। এই পুনর্জন্মবাদে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, উহাই মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ইহাই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনন্তকাল অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও সত্য যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ছিলে; অন্য কোনরূপ হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তি-গুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিবে, তথাপি ঐগুলির উত্তর দিতে হইবে, কারণ কখন কখন আমরা দেখিতে পাই, মহাচিন্তাশীল ব্যক্তিও অতি মূর্খোচিত কথা বলিয়া থাকে। লোকে যে বলিয়া থাকে, ‘এমন অসঙ্গত মতই নাই, যাহা সমর্থন করিবার জন্য কোন-না-কোন দার্শনিক অগ্রসর না হন’-এ-কথা অতি সত্য। এ-বিষয়ে প্রথম আপত্তি এই-জন্মান্তরের কথা আমাদের স্মরণ থাকে না কেন? আমরা কি এই জন্মেরই অতীত ঘটনা সব স্মরণ করিতে পারি? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা মনে পড়ে? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারও মনে পড়ে না; আর যদি স্মৃতি-শক্তির উপর তোমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার মনে নাই বলিয়া ঐ শৈশবাবস্থায় তোমার অস্তিত্বও ছিল না-এ কথা বলিতে হইবে। আমরা যদি স্মরণ করিতে পারি, তবেই পূর্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিব, ইহা বলা চরম নির্বুদ্ধিতা। আমাদের পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ থাকিবেই-ইহার কি কোন হেতু আছে? সেই মস্তিষ্ক নাই, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এবং নূতন একটি মস্তিষ্ক হইয়াছে। অতীতে

অর্জিত সংস্কারগুলির সমষ্টি আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়াছে—উহা লইয়া মন এই শরীরে বাস করিতেছে।

এইক্ষণে আমি ঠিক যেমনটি আছি, তাহা আমার অনন্ত অতীতের কর্ম-ফলস্বরূপ। আর সেই সমগ্র অতীত কে স্মরণ করারই বা আমার কি প্রয়োজন? কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহারা পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাহারাই আবার বিশ্বাস করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম; কিন্তু তাহাদের বানরজন্ম কেন স্মরণ হয় না—এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেও ভরসা করে না। যখন শূনি, কোন প্রাচীন ঋষি বা সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমরা আধুনিকেরা তাঁহাকে নির্বোধ বলিয়া থাকি; কিন্তু যদি কেহ বলে, হাক্সলি ইহা বলিয়াছেন, টিণ্ডাল ইহা বলিয়াছেন, তখন আমরা বলি উহা অবশ্যই সত্য হইবে—অমনি আমরা তাহা মানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্তে আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অতএব আমরা দেখিলাম, স্মৃতি সম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্ম সম্বন্ধে যে গুরুতর আপত্তি উঠিয়া থাকে, তাহার মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যাহা বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও দেখিয়াছি, পুনর্জন্মবাদ প্রমাণ করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও থাকিবে—ইহা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এরূপ স্মৃতি দেখা যায়, আর তোমরাও সকলে যে-জন্মে মুক্তিলাভ করিবে, সেই জন্মে এই স্মৃতি লাভ করিবে। কেবল তখনই জানিতে পারিবে—জগৎ স্বপ্নমাত্র, তখনই অন্তরের অন্তরে বুঝিবে যে, আমরা এই জগতে অভিনেতামাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমি, তখনই প্রবলবেগে অনাসক্তি ভাব তোমাদের ভিতর আসিবে, তখনই যত ভোগতৃষ্ণা-জীবনের উপর এই তীব্র আগ্রহ—এই সংসার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন তুমি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আসিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তুমি পিতামাতা পুত্রকন্যা স্বামী-স্ত্রী বন্ধু ঐশ্বর্য শক্তি লইয়া কাটাইয়াছ। কতবার এই-সকল আসিয়াছে, কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার তুমি সংসার-তরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ, আবার কতবার তুমি নৈরাশ্যের গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন স্মৃতি তোমার নিকট এই-সকল আনিয়া দিবে, তখনই কেবল তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইবে, এবং

জগৎ তোমায় দ্রুতঙ্গী করিলে তুমি শুধু হাসিবে। তখনই তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে—‘মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্য করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও?’ যখন তুমি জানিতে পারিবে, তোমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে। আর সকলেই কালে এই অবস্থা লাভ করিবে।

আত্মার যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে? এতক্ষণ আমরা কেবল শঙ্কানিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম, পুনর্জন্মবাদ খণ্ডন করিবার যুক্তিগুলি অকিঞ্চিৎকর। এখন পুনর্জন্মের সপক্ষে যে-সব যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুরকে দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরূপে? যখনই উহার ছাপ আমার মনের উপর পড়িল, উহার সহিত মনের ভিতরকার পূর্বসংস্কারগুলিকে মিলাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—আমার যাবতীয় পূর্বসংস্কার স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে। নূতন কোন বিষয় আসিবামাত্রই আমি ঐটিকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইয়া দেখি। যখনই দেখি, সেই ভাবের আর কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাই, তখনই আমার তৃপ্তি আসে। আমি তখন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারি, কারণ উহা পূর্বাভাসিত কতকগুলি সংস্কারের সহিত মেলে। যখন উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে দেখিতে পাই না, তখনই আমার অতৃপ্তি আসে, এইরূপ হইলে উহাকে ‘অজ্ঞান’ বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে ‘জ্ঞান’ বলে। যখন একটি আপেল পড়িল, তখনই মানুষের মধ্যে অতৃপ্তি আসিল। তারপর মানুষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুলি ঘটনার মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাইল। কি সেই শ্রেণী? সকল আপেলই পড়িয়া থাকে। মানুষ উহার ‘মাধ্যাকর্ষণ’ সংজ্ঞা দিল। অতএব আমরা দেখিলাম—পূর্বে কতকগুলি অনুভূতি না থাকিলে নূতন অনুভূতি অসম্ভব, কারণ ঐ নূতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া যাইবে না। অতএব কতিপয় ইউরোপীয় দার্শনিকের মতে ‘বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে’—এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে এরূপ বালক কখনও কিছুমাত্র মানসিক শক্তি অর্জন করিতে পারিবে না, কারণ তাহার অনুভূতিগুলি মিলাইবার জন্য আর কোন সংস্কার নাই। অতএব দেখিলাম, এই পূর্বসংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার

ব্যতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক আমাদের সকলকেই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞানলাভ হয়, আর কোন পথ নাই। যদি আমরা এখানে ঐ জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকি, অবশ্যই আমরা অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থাকিব। মৃত্যুভয় সর্বত্রই দেখিতে পাই কেন? একটি কুক্কুট এইমাত্র ডিম হইতে বাহির হইয়াছে—একটি বাজপাখি আসিল, অমনি সে ভয়ে মায়ের কাছে পালাইয়া গেল। কোথা হইতে ঐ কুক্কুটশাবকটি শিখিল যে, কুক্কুট বাজের ভক্ষ্য? ইহার একটি পুরাতন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে স্বাভাবিক সংস্কার(instinct) বলা হয়। যে ক্ষুদ্র কুক্কুটটি এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে? ডিম্ব হইতে সদ্য বহির্গত হংস জলের নিকট আসিলেই, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন? উহা কখন সাঁতার দেয় নাই, অথবা কাহাকেও সাঁতার দিতে দেখে নাই। লোকে বলে উহা ‘স্বাভাবিক জ্ঞান’। ‘স্বাভাবিক জ্ঞান’ বলিলে একটা খুব লম্বা-চওড়া কথা বলা হইল বটে, কিন্তু উহা আমাদের নূতন কিছুই শিখাইল না।

এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি, তাহা আলোচনা করা যাক। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে। মনে কর, একজন পিয়ানো বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহাকে প্রত্যেক পরদার দিকে নজর রাখিয়া তবে উহার উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয়; কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা-আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে ইহাতে জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, এখন আর উহার প্রয়োজন থাকে না, জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে, ইহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে ইহা ইচ্ছাসহ কৃত ছিল, পরিশেষে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানের তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ বলা হয় নাই, অর্ধেক কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। যে-সকল কার্য এখন আমাদের স্বাভাবিক, তাহার প্রায় সবগুলিকেই আমাদের ইচ্ছার অধীনে আনা যাইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনা যাইতে পারে। এ বিষয়টি আজকাল সাধারণের ভালভাবেই জানা আছে। অতএব অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী—দুই উপায়েই

প্রমাণিত হইল যে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাকৃত কার্যের অবনত ভাব মাত্র। অতএব যখন সমুদয় প্রকৃতিতেই এক নিয়ম রাজত্ব করিতেছে, তখন সমগ্র সৃষ্টিতে ‘উপমান’-প্রমাণের প্রয়োগ করিয়া অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, নিম্নতর প্রাণীতে এবং মানুষে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাবমাত্র।

আমরা বহির্জগতে যে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান, আর ক্রমসঙ্কোচ হইলেই উহার সঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে—এই নিয়ম খাটাইয়া আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা লাভ করি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচার-পূর্বক কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইয়া দাঁড়াইল। অতএব মানুষে বা পশুতে যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ববর্তী ইচ্ছাকৃত কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে। আর ইচ্ছাকৃত কার্য বলিলেই পূর্বে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, স্বীকার করা হইল। পূর্বকৃত কার্য হইতে ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কার এখনও বর্তমান। এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মিবামাত্র জলে সন্তরণ আর মানুষের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্য রহিয়াছে, সবই পূর্ব কার্য ও পূর্ব অনুভূতির ফল—এখন স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে।

এতক্ষণে আমরা বিচারে বেশ অগ্রসর হইলাম, আর এতদূর পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সহায়। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন ঋষিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের যতটুকু প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মিলে ততটুকুতে কোন গোল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জীবজন্তুই কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাঁহারা ইহাও মানেন যে, মনের এই-সকল কার্য পূর্ব অনুভূতির ফল। কিন্তু তাঁহারা এইখানে আর এক শঙ্কা তুলিয়া থাকেন।

তাঁহারা বলেন, ঐ অনুভূতিগুলি যে আত্মার, ইহা বলিবার আবশ্যিকতা কি? উহা কেবল শরীরেরই ধর্ম বলিলেই তো হয়। উহা ‘বংশানুক্রমিক সঞ্চার’ (Hereditary transmission) এ-কথা বলিলেই তো হয়। ইহাই শেষ প্রশ্ন। আমি যে-সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, ইহাই বলো না কেন? ক্ষুদ্র জীবাণু

হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য পর্যন্ত সকলেরই কর্মসংস্কার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চারবশেই আমাতে আসিয়াছে। এইরূপ হইলে আর কি গোল থাকে? এই প্রশ্নটি অতি সুন্দর। আমরা এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ মানিয়াও থাকি। কতটুকু মানি? মানি কেবল এইটুকু যে উহা আমাদের ভবিষ্যৎ শরীরের উপাদান প্রদান করে; আমরা আমাদের পূর্বকর্মের দ্বারা শরীর বিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকি; আর যে-সকল পিতামাতা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা ঐ আত্মাকে সন্তানরূপে পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই নূতন শরীরের উপাদান সংগৃহীত হয়।

বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ বিনা প্রমাণেই একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া থাকে যে, মনের সংস্কাররাশির ছাপ জড়ে সঞ্চিত হইতে পারে। যখন আমি তোমার দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্তহুদে একটি তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম তরঙ্গাকার থাকে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি। শরীরের সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু শরীর যখন নষ্ট হয়, তখন মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, ইহার প্রমাণ কি? কিসের দ্বারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয়? মনে কর, মনের প্রত্যেক সংস্কারের শরীরে বাস করা সম্ভব; মনে কর, আদিম মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া বংশানুক্রমে সকল পূর্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কেমন করিয়া? তোমারা বলিবে-জীবাণু-কোষের (bio-plasmic cell) দ্বারা। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, কারণ পিতার শরীর তো সন্তানে সম্পূর্ণ আসে না? একই পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি থাকিতে পারে। সুতরাং এই বংশানুক্রমিক সঞ্চার-বাদ স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে যে, পিতা-মাতা প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিজ মনোবৃত্তির কিঞ্চিদংশ হারাইবেন, কারণ তাঁহাদের মতে সঞ্চারক ও সঞ্চার্য এক অর্থাৎ ভৌতিক; আর যদি বলো, তাঁহাদের মনোবৃত্তিই সঞ্চারিত হয়, তবে বলিতে হয় প্রথম সন্তানের জন্মের পরই তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া যাইবে।

আবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনন্ত সংস্কারসমষ্টি থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, উহা কোথায় কিরূপেই বা থাকে? ইহা একটি অত্যন্ত অসম্ভব দৃষ্টিভঙ্গী। আর যতদিন না এই

জড়বাদীরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, এবং ‘মনোবৃত্তি শরীর-কোষে নিদ্রিত থাকে’, এই বাক্যেরই বা অর্থ কি, যতদিন না তাঁহারা বুঝাইতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই সংস্কার মনেরই মধ্যে বাস করে, মনই জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিতে আসে; মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর যে মন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম করিয়াছে, যতদিন পর্যন্ত না সে তাহা নির্মাণ করিবার উপযোগী উপাদান পাইতেছে, ততদিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অতএব আত্মার দেহ গঠনের উপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্যন্তই বংশানুক্রমিক সঞ্চারণবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে। আত্মা কিন্তু জন্মান্তর গ্রহণ করেন—শরীরের পর শরীর নির্মাণ করেন; আর আমরা যে-কোন চিন্তা করি, যে-কোন কার্য করি, তাহাই সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়, আবার সময় হইলেই উহারা স্থূল ব্যক্তভাব ধারণ করিতে উন্মুখ হয়।

আমার যাহা বক্তব্য, তাহা তোমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যখনই আমি তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মনে একটি তরঙ্গ উঠে। উহা যেন চিত্তহৃদের ভিতর ডুবিয়া যায়, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, কিন্তু উহার একেবারে নাশ হয় না। যে-কোন মুহূর্তে স্মৃতিরূপ তরঙ্গাকারে উঠিতে প্রস্তুত হইয়া উহা মনের মধ্যেই বর্তমান থাকে। এইরূপেই এই সমুদয় সংস্কার সমষ্টি আমার মনেই রহিয়াছে, আর মৃত্যুকালে উহাদের সমষ্টি আমার সঙ্গেই বাহির হইয়া যায়। মনে কর, এই ঘরে একটি বল রহিয়াছে, আর আমরা প্রত্যেকেই হাতে একটি ছড়ি লইয়া সব দিক হইতে ইহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলাম; বলটি ঘরের এক ধার হইতে আর এক ধারে যাইতে লাগিল, দরজার কাছে পৌঁছিবামাত্র, উহা বাহিরে চলিয়া গেল। উহা কোন্ শক্তি লইয়া বাহিরে চলিয়া যায়?—যতগুলি ছড়ি মারা হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তি। উহার গতি কোন্ দিকে হইবে, তাহাও ঐ-সকলের সমবেত ফলে নির্ণীত হইবে। এইরূপ, শরীরের পতন হইলে আত্মার কোন্ দিকে গতি হইবে, তাহা কে নির্ণয় করে? ঐ আত্মা যে-সকল কার্য করিয়াছে, যে-সকল চিন্তা করিয়াছে, সেইগুলিই উহাকে কোন

বিশেষ দিকে পরিচালিত করিবে। ঐ আত্মা নিজের মধ্যে ঐ-সকলের সংস্কার লইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। যদি সমবেত কর্মফল এরূপ হয় যে, পুনর্বীর ভোগের জন্য উহাকে একটি নূতন শরীর গড়িতে হইবে, তবে উহা এমন পিতা-মাতার নিকট যাইবে, যাহাদের নিকট হইতে সেই শরীরগঠনের উপযোগী উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, আর সেই-সকল উপাদান লইয়া উহা একটি নূতন শরীর গ্রহণ করিবে। এইরূপে ঐ আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবে, কখন স্বর্গে যাইবে, আবার পৃথিবীতে আসিয়া মানব দেহ পরিগ্রহ করিবে; অথবা অন্য কোন উচ্চতর বা নিম্নতর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে। এইরূপে উহা অগ্রসর হইতে থাকিবে, যতদিন না উহার অভিজ্ঞতা অর্জন শেষ হয়, এবং পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখনই উহা নিজের স্বরূপ জানিতে পারে। তখন সমুদয় অজ্ঞান চলিয়া যায়, নিজের শক্তিসমূহ প্রকাশিত হয়। তিনি তখন সিদ্ধ হইয়া যান, পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষে স্থূলশরীরের সাহায্যে কার্য করার কোন প্রয়োজন থাকে না—সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা কার্য করিবারও প্রয়োজন থাকে না। তখন তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও মুক্ত হইয়া যান; তাঁহার আর জন্ম বা মৃত্যু কিছুই হয় না।

এ সম্বন্ধে আমরা এখন আর বিশেষ আলোচনা করিব না। পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই মতই কেবল আমাদের সমুদয় দুর্বলতার দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপায় না। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানোটা মানুষের সাধারণ দুর্বলতা। আমরা নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখনও নিজেকে দেখিতে পায় না। উহা অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। মানুষ আমরা, যতক্ষণ অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারি, ততক্ষণ নিজেদের দুর্বলতা, নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিতে বড় নারাজ। মানুষ সাধারণতঃ নিজের দোষগুলি, নিজের ভ্রমত্রুটিগুলি তাহার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপাইতে চায়, তাহা যদি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপায়; তাহা না হইলে অদৃষ্ট নামক একটি ভূতের কল্পনা করে এবং তাহারই উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়; কিন্তু কথা এই, ‘অদৃষ্ট’ নামে এই বস্তুটির স্বরূপ কি এবং উহা থাকেই বা কোথায়? আমরা তো যাহা বপন করি, তাহাই পাইয়া থাকি।

আমরাই আমাদের অদৃষ্টের নির্মাতা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হইলে কাহাকেও দোষী করিতে পারা যায় না, আবার ভাল হইলে প্রশংসাও অপর কেহ পায় না। বাতাস সর্বদাই বহিতেছে। যে-সকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেইগুলিতেই বাতাস লাগে-তাহারাই পালভরে অগ্রসর হয়। যাহাদের পাল গুটানো থাকে, তাহাদিগের উপর বাতাস লাগে না। ইহা কি বায়ুর দোষ? আমরা যে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, ইহা কি সেই করুণাময় পিতার দোষ? তাঁহার কৃপা-বাতাস দিবারাত্র অবিরত বহিতেছে, তাঁহার দয়ার শেষ নাই। আমরাই আমাদের অদৃষ্টের রচয়িতা। তাঁহার সূর্য দুর্বল বলবান্-সকলের জন্য উদিত হয়। তাঁহার বায়ু সাধু পাপী-সকলের জন্যই সমানভাবে বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময়, সমদর্শী। তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা কি ক্ষুদ্র ধারণা! আমরা ছোট ছোট কুকুরছানার মতো এখানে জীবন-মরণ সংগ্রাম করিতেছি এবং নির্বোধের মতো মনে করিতেছি, ভগবানও ঐ বিষয়গুলি ঠিক তেমনি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন। এই কুকুরছানার খেলার অর্থ কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার উপর সব দোষ চাপানো, তাঁহাকে দণ্ড-পুরস্কারের কর্তা বলা নির্বুদ্ধিতামাত্র। তিনি কাহারও দণ্ডবিধান করেন না, কাহাকেও পুরস্কার দেন না।^১ সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব অবস্থায় সকলেই তাঁহার অনন্ত দয়া পাইবার অধিকারী। উহার ব্যবহার কিরূপে করিব, তাহা আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। মানুষ, ঈশ্বর বা অপর কাহারও উপর দোষারোপ করিও না। যখন নিজে কষ্ট পাও, তখন তাহার জন্য নিজেকেই দোষী বলিয়া স্থির কর এবং যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা কর।

পূর্বোক্ত সমস্যার ইহাই মীমাংসা। যাহারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের জন্য অপরের উপর দোষারোপ করে-দুঃখের বিষয়, এমন লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে-তাহারা সাধারণতঃ হতভাগ্য দুর্বলমস্তিষ্ক লোক; তাহারা নিজেদের কর্মদোষে এ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, এখন তাহারা অন্যের উপর দোষারোপ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেষ্টা তাহাদিগকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলে। অতএব

তোমার নিজের দোষের জন্য কাহাকেও নিন্দা করিও না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, সমুদয় দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে গ্রহণ কর। বলো, আমি যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্মের ফল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমার দ্বারাই এই দুঃখকষ্ট দূরীভূত হইবে। আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই তাহা ধ্বংস করিতে পারি; অপরে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে, আমি কখনও তাহা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইব না। অতএব উঠ, সাহসী হও, বীর্যবান্ হও। সব দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ কর—জানিয়া রাখো, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা। তুমি যে কিছু শক্তি বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এখন এই জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাকো। ‘গতস্য শোচনা নাস্তি’—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সর্বদা মনে রাখিও, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্যই সঞ্চিৎ থাকিবে; ইহাও স্মরণ রাখিবে, যেমন তোমার কৃত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য তোমার উপর ব্যাঘ্রের মতো লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত, তেমনি তোমার সৎচিন্তা ও সৎকার্যগুলি সহস্র দেবতার শক্তি লইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত।

৯. অমৃতত্ব

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষ যতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ঐ তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে মানুষ সমগ্র জগৎ যত অধিক খুঁজিয়াছে, ঐ প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের যেমন অন্তরতর ও প্রিয়তর, ঐ প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের সহিত যেমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তেমন আর কোন্ প্রশ্ন হইতে পারে? কবিদিগের ইহা কল্পনার বিষয়, সাধু মহাত্মা জ্ঞানী-সকলেরই ইহা মহা চিন্তার বিষয়, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা ইহা আলোচনা করিয়াছেন, পথের ভিখারীও এই অমরত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন—অপকৃষ্ট মানুষেরাও ইহা পাইবার আশা করিয়াছে। এই বিষয়ে লোকের আগ্রহ এখনও চলিয়া যায় নাই এবং যতদিন মানবপ্রকৃতি থাকিবে, ততদিন যাইবে না। জগতে এই সম্বন্ধে অনেকে অনেক উত্তর দিয়াছেন। আবার ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই আলোচনা একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি এই প্রশ্ন তেমনি চিরনূতন রহিয়াছে। অনেক সময় জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া আমরা যেন ভুলিয়া যাই। হঠাৎ কেহ কালগ্রাসে পতিত হইল—এমন কেহ যাহাকে আমি হয়তো খুব ভালবাসিতাম, যে আমার প্রাণের প্রিয়তম ছিল, হঠাৎ মৃত্যু তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল, তখন যেন মুহূর্তের জন্য এই সংসারের দ্বন্দ্ব কোলাহল—সব থামিয়া গেল, আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল—ইহার পরে কি? দেহান্তে আত্মার কি গতি হয়?

অভিজ্ঞতা হইতেই মানুষের জ্ঞান হয়; সুখ দুঃখ সব অনুভব না করিলে আমরা কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি না। আমাদের বিচার, আমাদের জ্ঞান এই—সকল সমান্যীকৃত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। শ্রেনীবদ্ধ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াই আমরা জ্ঞান লাভ করি। চতুর্দিকে চাহিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্তন! বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, আবার ঘুরিয়া উহা বীজরূপে পরিণত হয়। কোন প্রাণী

জন্ম গ্রহণ করিল, কিছুদিন বাঁচিয়া মরিয়া গেল—এইরূপে যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। মানুষ সম্বন্ধেও তেমনি। এমন কি, পর্বতসমূহ পর্যন্ত ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে গুঁড়াইয়া যাইতেছে, নদীসকল ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আসিতেছে, উহা আবার সমুদ্রে যাইতেছে। সর্বত্রই এক একটি বৃত্ত—জন্ম বৃদ্ধি ও নাশ যেন নির্ভুল-ভাবে যথাসময়ে একটির পর আর একটি আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। তথাপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ প্রকারে বিভিন্ন নামরূপযুক্ত বস্তুরাশির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে আমরা এক অখণ্ডভাব দেখিতে পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক্ করিতেছে বলিয়া মনে করা হইত, তাহা আজ ভাঙিয়া যাইতেছে; আধুনিক বিজ্ঞান সমুদয় পদার্থকে একই বস্তু বলিয়া বুঝিতেছে, কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানাভাবে ও নানারূপে আকারে প্রকাশ পাইতেছে, উহা যেন সব কিছুর মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিদ্যমান—এই-সকল বিভিন্ন রূপ যেন তাহার এক একটি অংশ—অনন্তরূপে বিস্তৃত অথচ সেই এক শৃঙ্খলেরই অংশ। ইহাকেই ক্রমোন্নতিবাদ বলে। এই ধারণা অতি প্রাচীন—মনুষ্যসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন। কেবল মানুষের জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাচীনেরা আর একটি বিষয় বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন—‘ক্রমসঙ্কোচ’। কিন্তু আধুনিকেরা এই তত্ত্বটি তত ভালরূপ বুঝেন না। বীজই বৃক্ষ হয়, একবিন্দু বালুকণা কখনও বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাখণ্ড কখন সন্তান-রূপে জন্মে না। প্রশ্ন এই—এই ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্বের অবস্থাটি কি? বীজ পূর্বে কি ছিল? উহা সেই বৃক্ষরূপে ছিল। ঐ বীজে ভবিষ্যৎ একটি বৃক্ষের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে বীজে রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য কি? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে ‘ক্রমসঙ্কোচ’ বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটি ‘ক্রমসঙ্কোচ’-প্রক্রিয়া রহিয়াছে। যাহা পূর্ব হইতেই ছিল না, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করিয়া

থাকেন। গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্বদাই সমান। তুমি একবিন্দু জড় বা একটুকু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না। অতএব শূন্য হইতে কখনই ক্রমবিকাশ হয় না; তবে কোথা থেকে হইতে হয়? অবশ্য ইহার পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্রমসঙ্কোচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎপত্তি। সর্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনা তাহাদের বীজে রহিয়াছে। এখন এই সমস্যা যেন কিছু সরল হইয়া আসিতেছে। এখন এই তত্ত্বটির সঙ্গে পূর্বকথিত সমুদয় জীবনের অখণ্ডত্বের বিষয় আলোচনা কর। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্যন্ত বাস্তবিক একটি সত্তা—একটি জীবনই বর্তমান। যেমন এক জীবনেই আমার শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, সেইরূপ শৈশব-অবস্থার পূর্বে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া দেখ, যতক্ষণ না তুমি জীবাণুতে উপনীত হও। এইরূপে ঐ জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানুষে পর্যন্ত যেন একটি জীবনসূত্র বিদ্যমান। ইহাকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে। যে জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব বা পৃথিবীতে আবির্ভূত ঈশ্বরাবতাররূপে ক্রমবিকাশিত হয়—এই সব গুলি অবশ্যই জীবাণুতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল। এই সমগ্র শ্রেণীটি সেই এক জীবনেরই অভিব্যক্তি মাত্র, আর এই সমুদয় ব্যক্ত জগৎ সেই এক জীবাণুতেই অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। এই সমগ্র প্রাণশক্তি—এমন কি মর্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বর পর্যন্ত উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলেন, অবতার-শ্রেণীর মানব পর্যন্ত অন্তর্নিহিত ছিলেন; কেবল ধীরে ধীরে, অতি ধীরে শ্রেণীর ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র। সর্বোচ্চ চরম অভিব্যক্তি যাহা, তাহাও অবশ্যই জীবভাবে সূক্ষ্মাকারে উহার ভিতরে বর্তমান ছিল—তাহা হইলে যে এক শক্তি হইতে সমগ্র শ্রেণী বা শৃঙ্খলটি আসিয়াছে, উহা কাহার ক্রম-সঙ্কোচ? সেই সর্বব্যাপী প্রাণশক্তির ক্রমসঙ্কোচ আর এই যে ক্ষুদ্রতম জীবাণু নানা জটিল-যন্ত্রসমন্বিত উচ্চতম বুদ্ধিশক্তির আধাররূপ মানবাকারে অভিব্যক্ত হইতেছে, কোন্ বস্তু ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া জীবাণু-আকারে অবস্থান করিতেছিল? উহা সর্বব্যাপী চৈতন্য—উহাই ঐ জীবাণুতে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া

বর্তমান ছিল। উহা প্রথম হইতে পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল। উহা যে একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা নয়। বৃদ্ধির ভাব মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। বৃদ্ধি বলিলেই যেন বোধ হয়, বাহির হইতে কিছু আসিতেছে। বৃদ্ধি মানিলে অস্বীকার করিতে হয়—অনন্ত সকল প্রাণে অন্তর্নিহিত আছে এবং উহা সর্বপ্রকার বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ। এই সর্বব্যাপী চৈতন্যের কখন বৃদ্ধি হয় না, উহা সর্বদাই পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল, কেবল এখানে অভিব্যক্ত হইল মাত্র।

বিনাশের অর্থ কি? এই একটি গ্লাস রহিয়াছে। আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। প্রশ্ন এই—গ্লাসটির কি হইল? উহা সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল মাত্র। তবে বিনাশের কি অর্থ হইল? স্থূলের সূক্ষ্মভাবে পরিণতি। উহার উপাদান-পরমাণুগুলি একত্র হইয়া গ্লাস নামক ‘কার্যে’ পরিণত হইয়াছিল। উহারা আবার উহাদের কারণে চলিয়া যায়, আর ইহার নাম নাশ—কারণে লয়। কার্য কি? না, কারণের ব্যক্তভাব। নতুবা কার্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ঐ গ্লাসের কথাই ধর। উহার উপাদানগুলি এবং উহার নির্মাতার ইচ্ছার সহযোগে উহা উৎপন্ন। এই দুইটিই উহার কারণ এবং উহাতে বর্তমান। নির্মাতার ইচ্ছাশক্তি এখন উহাতে কি ভাবে বর্তমান? —সংহতিশক্তিরূপে। ঐ শক্তি না থাকিলে উহার প্রত্যেক পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাইত। তবে এখন কার্যটি কি? উহা কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহা আর একরূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। যখন কারণ নির্দিষ্ট কালের জন্য বা নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর পরিণত, ঘনীভূত ও সীমাবদ্ধ ভাবে অবস্থান করে, তখন ঐ কারণটিকেই ‘কার্য’ বলে। আমাদের ইহা মনে করিয়া রাখা উচিত। এই তত্ত্বটিকে আমাদের জীবনের ধারণা-সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই যে, জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানুষ পর্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্য সেই বিশ্বব্যাপিনী প্রাণশক্তির সহিত অভেদ।

কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না। আমরা কি পাইলাম? আমরা পূর্বোক্ত বিচার হইতে এইটুকু পাইলাম যে, জগতে কিছুই ধ্বংস হয় না। নূতন কিছুই নাই—কিছু হইবেও না। সেই একই প্রকারের বস্তুরাশি চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতেছে। জগতে যত গতি আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে। কোটি

কোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর রূপ হইতে প্রসূত হইতেছে—স্থূল রূপ ধারণ করিতেছে; আবার ঐ সূক্ষ্মভাব হইতে তাহাদের স্থূলভাবে আগমন—কিছুদিনের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি, আবার ধীরে ধীরে সেই কারণে গমন। তবে কি যায়? না—রূপ, আকৃতি। সেই রূপটি নষ্ট হইয়া যায়, আবার আসে। একভাবে ধরিতে গেলে, এই শরীর পর্যন্ত অবিনাশী। একভাবে দেহসকল এবং রূপসকলও নিত্য। মনে কর, আমরা পাশা খেলিতেছি, ৬/৩/৯ পড়িল। আমরা আবার খেলিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমাগত খেলিতে খেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় আসিবে, যখন আবার ৬/৩/৯ পড়িবে। আবার খেলিতে থাকো, আবার উহা পড়িবে, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে। আমি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটি পাশার সহিত তুলনা করিতেছি। এই গুলিকেই বার বার ফেলা হইতেছে, উহারা বারংবার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে যে-সকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা পরমাণুগুলির এক বিশেষ প্রকার সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজা প্রভৃতি রহিয়াছে। উহারা ঐ পরমাণুগুলির সমবায়বিশেষ—মুহূর্ত পরেই হয়তো ঐ সমবায়গুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন আবার ঠিক ঐ সমবায়গুলি আসিয়া উপস্থিত হইবে—যখন তোমরা এখানে উপস্থিত থাকিবে, এই কুঁজা ও অন্যান্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহারও ঠিক তাহাদের যথাস্থানে থাকিবে, আর ঠিক এই বিষয়েই আলোচনা হইবে। অনন্ত বার এইরূপ হইয়াছে এবং অনন্ত বার এইরূপ হইবে। আমরা স্থূল, বাহ্য বস্তুসমূহের আলোচনা করিয়া উহা হইতে কি তত্ত্ব পাইলাম? পাইলাম, অনন্তকাল ধরিয়া এই ভৌতিক পদার্থসমূহের সমবায়ের পুনরাবৃত্তি হইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসে—ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব কি না? আপনারা অনেকে হয়তো এমন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারেন। যদি ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অতীত ঘটনারই ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাতে কিন্তু আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার কথা মনে কর। উহা অনবরত ঘুরিতেছে। একদল লোক আসিতেছে—তাহার এক একটাতে বসিতেছে। সেটি ঘুরিয়া

আবার নীচে আসিতেছে। সেই দল নামিয়া গেল—আর একদল আসিল। ক্ষুদ্রতম জন্তু হইতে উচ্চতম মানুষ পর্যন্ত প্রকৃতির এই প্রত্যেক রূপটিই যেন এই একটি দল, আর প্রকৃতিই এই বৃহৎ নাগরদোলা ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক একটি ঘরস্বরূপ। এক এক দল নূতন আত্মা উহাদের উপর আরোহণ করিতেছে এবং যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতেছে এবং ঐ নাগরদোলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ নাগরদোলা থামিতেছে না, উহা সর্বদা চলিতেছে—সর্বদাই অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে ; এবং যতদিন শরীরগুলি এই চক্রের ভিতর, এই নাগর দোলার ভিতর রহিয়াছে, ততদিন নিশ্চয়ই গণিতের মতো সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঐগুলি কোথায় যাইবে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহা বলা অসম্ভব। অতএব প্রকৃতির ভূত ও ভবিষ্যৎ গণিতের মতো সঠিকভাবে বলা সম্ভব।

আমরা দেখিলাম, জড়-পরমাণুসকল এখন যে ভাবে সংহত রহিয়াছে, সময়বিশেষে পুনরায় তাহাদের অনুরূপ সংহতি হইয়া থাকে। অনন্তকাল ধরিয়া এই জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য। কিন্তু ইহাতে তো আত্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন হইল না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কোন শক্তিরই নাশ হয় না, কোন জড়বস্তুকে একেবারে ধ্বংস করা যাইতে পারে না।

তবে জড়বস্তুর কি হয়? উহার নানারূপ পরিণাম হইতে থাকে, অবশেষে যেখান হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইখানে উহা পুনরাবৃত্ত হয়। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, কারণ সরলরেখা অনন্তভাবে বর্ধিত করিলে বৃত্তে পরিণত হয়, তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্তকালের জন্য অবনতি হইতে পারে না—উহা হইতেই পারে না। এই জগতে প্রত্যেক জিনিসই শীঘ্র বা বিলম্বে নিজ নিজ বৃত্তগতি সম্পূর্ণ করিয়া আবার নিজের উৎপত্তিস্থানে উপনীত হয়। তুমি, আমি আর এই-সকল আত্মা কি? আমরা পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ-ও ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় দেখিয়াছি, তুমি আমি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বা প্রাণ বা মনের অংশবিশেষ; আমরা উহারই ক্রমসঙ্কোচ। সুতরাং আমরা আবার ঘুরিয়া ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া অনুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে ফিরিয়া যাইব—ঐ বিশ্বব্যাপী

চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে-জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সর্বাতিত বস্তু বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

কিন্তু আত্মার অমরত্ব-প্রমাণে ইহাও পর্যাপ্ত হইল না। এখনও অনেক সংশয়-অনেক আশঙ্কা রহিয়া গেল। কোন শক্তির নাশ নাই-এ-কথা শুনিতে খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমরা যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই মিশ্রণোৎপন্ন; যতরূপ দেখিতে পাই, তাহাও মিশ্রণোৎপন্ন। যদি তুমি শক্তিসম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টিমাত্র বলো, তবে তোমার ‘আমিত্ব’ থাকে কোথায়? যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই শীঘ্র বা বিলম্বে ইহাদের উপাদান-পদার্থে লয় পাইবে; যাহা কিছু কতকগুলি কারণের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহারই মৃত্যু-বিনাশ অবশ্যস্বাভাবী। শীঘ্র বা বিলম্বে উহা বিশ্লিষ্ট হইবে, ভগ্ন হইবে, উহাদের উপাদান-পদার্থে পরিণত হইবে। আত্মা শারীরিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি নহে। উহা চিন্তাশক্তির স্রষ্টা; কিন্তু উহা চিন্তাশক্তি নহে। উহা শরীরের গঠনকর্তা, কিন্তু উহা শরীর নহে। কেন? শরীর কখন আত্মা হইতে পারে না; কারণ শরীর চৈতন্যবান্ নহে। মৃতব্যক্তি অথবা কসাই এর দোকানের একখন্ড মাংস কখন চৈতন্যবান্ নহে। আমরা ‘চৈতন্য’ শব্দে কি বুঝি?—প্রতিক্রিয়া-শক্তি।

আর একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা যাক। সম্মুখে এই কুঁজাটি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি? ঐ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোককিরণ আসিয়া আমার চক্ষু প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (retina) উপর একটি চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইয়া আমার মস্তিষ্কে উপনীত হইতেছে। শরীরতত্ত্ববিদগণ যাহাদিগকে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বলেন, তাহাদিগের দ্বারা ঐ চিত্র ভিতরে মস্তিষ্কে নীত হয়। তথাপি তখন পর্যন্ত দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ পর্যন্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসে নাই। মস্তিষ্কের ভিতর স্নায়ুকেन्द्र উহাকে মনের নিকট লইয়া যাইবে, আর মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া হইবামাত্র ঐ কুঁজা আমার সম্মুখে

ভাসিতে থাকিবে। একটি সহজ উদাহরণের দ্বারা ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। মনে কর, খুব একাগ্র মনে আমার কথা শুনিতেছ, আর একটি মশা তোমার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিতে এতদূর অভিনিবিষ্ট যে, তুমি মশার কামড় মোটেই অনুভব করিতেছ না। এখানে কি ব্যাপার হইতেছে? মশাটি তোমার চামড়ার খানিকটা দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্য কতকগুলি স্নায়ু আছে; ঐ স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; সেই ধারণা সেখানে রহিয়াছে; কিন্তু মন অন্যদিকে নিযুক্ত থাকায় প্রতিক্রিয়া করে নাই, সুতরাং তুমি মশকের দংশন টের পাও নাই। আমাদের সামনে নূতন চিত্র আসিল, কিন্তু মনে প্রতিক্রিয়া হইল না—এরূপ হইলে আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইলেই উহার জ্ঞান আসিবে—তখনই আমরা দেখিতে, শুনিতে এবং অনুভব করিতে সমর্থ হইব। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিতেছি, শরীর প্রকাশ করিতে পারে না, কারণ আমরা দেখিতেছি যে, যখন আমার মনোযোগ ছিল না, তখন আমি অনুভব করি নাই। এমন ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ অবস্থায় একজন—যে-ভাষা কখন শিখে নাই, সেই ভাষা বলিতে সমর্থ হইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবস্থায় এমন জাতির ভিতর বাস করিত, যাহারা ঐ ভাষায় কথা বলিত—সেই সংস্কার তার মস্তিষ্কের মধ্যেই ছিল। সেইগুলি সেখানে সঞ্চিত ছিল; তারপর কোন কারণে মনে প্রতিক্রিয়া হইল—তখনই জ্ঞান আসিল। আর সেই ব্যক্তি সেই ভাষা বলিতে সমর্থ হইল। ইহাতেই আবার দেখা যাইতেছে, কেবল মনই পর্যাপ্ত নয়, মনও কাহারও হাতে যন্ত্র মাত্র। ঐ লোকটির বাল্যকালে তাহার মনের ভিতরই সেই ভাষা ছিল—কিন্তু সে উহা জানিত না, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল, যখন সে উহা জানিতে পারিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন ছাড়া আর কেহ আছেন—লোকটির শৈশবে সেই ‘আর কেহ’ ঐ শক্তির ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু যখন সে বড় হইল তখন তিনি উহার ব্যবহার করিলেন। প্রথম—এই শরীর, তারপর মন অর্থাৎ চিন্তার যন্ত্র, তারপর এই মনের পশ্চাতে সেই ‘আত্মা’। আধুনিক দার্শনিকগণ যেহেতু মনে করেন, চিন্তা মস্তিষ্কস্থ পরমাণুর পরিবর্তনের

সহিত অভিন্ন, সেজন্য তাঁহারা পূর্বোক্ত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; সেই জন্য তাঁহারা সাধারণতঃ উহা একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ সম্বন্ধ এবং শরীরের নাশ হইলে উহা কার্য করিতে পারে না। আত্মাই একমাত্র প্রকাশক—মন উহার যন্ত্রস্বরূপ; বহিঃস্থ চক্ষুরাদি যন্ত্রে বিষয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা আবার ঐ চিত্রকে ভিতরে মস্তিষ্ককেন্দ্রে লইয়া যায়—কারণ তোমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেবল ঐ চিত্রের গ্রাহকমাত্র; ভিতরের যন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহই কার্য করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্রগুলিকেই ইন্দ্রিয় বলে—তাহারা ঐ চিত্রগুলিকে লইয়া মনের নিকট সমর্পণ করে; মনে আবার উহাদিগকে আরও ভিতরে নিজেরই আর এক স্তর চিত্রের মধ্য দিয়া সিংহাসনে আসীন মহামহিমাম্বিত রাজার রাজা আত্মার সম্মুখে স্থাপন করে। তিনি সব দেখিয়া যাহা আবশ্যিক, তাহা আদেশ করেন। তখনই মন ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির উপর কার্য করে, উহারা আবার স্থূল শরীরের উপর কার্য করে। মানুষের আত্মাই বাস্তবিক এই সমুদয়ের অনুভবকর্তা, শাস্তা, স্রষ্টা—সবই। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা শরীর নহে, মনও নহে। আত্মা কোন যৌগিক পদার্থ হইতে পারে না। কেন? কারণ যাহা কিছু যৌগিক পদার্থ, তাহাই আমাদের দর্শন বা কল্পনার বিষয়। যে জিনিস আমরা দর্শন বা কল্পনা করিতে পারি না, যাহাকে আমরা ধরিতে পারি না, যাহা শক্তি বা পদার্থ নহে, যাহা কারণ বা কার্য কিছুই নহে, তাহা যৌগিক হইতে পারে না। মনোজগৎ পর্যন্তই যৌগিক পদার্থের অধিকার—চিন্তাজগৎ আরও ব্যাপক। যৌগিক পদার্থ সমুদয়ই নিয়মের রাজ্যের মধ্যে—নিয়মের রাজ্যের বাহিরে উহারা থাকিতে পারে না; যদি থাকে তবে আর যৌগিক অবস্থায় নয়।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। এই গেলাস একটি যৌগিক পদার্থ—ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কার্যরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই কারণগুলির সংহতি-রূপ গেলাস নামক যৌগিক পদার্থটি কার্যকারণ-নিয়মের অন্তর্গত। এইরূপে যেখানে যেখানে কার্যকারণ-সম্বন্ধ দেখা যাইবে—সেখানে সেখানেই যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহার বাহিরে উহার অস্তিত্বের কথা বলা বাতুলতা মাত্র। উহাদের বাহিরে

আর কার্যকারণ-সম্বন্ধ খাটিতে পারে না—আমরা যে-জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারি, অথবা যাহা দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই ভিতর কেবল নিয়ম খাটিতে পারে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহা আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব বা কল্পনা করিতে পারি, তাহাই আমাদের জগৎ; উহা বাহ্যবস্তু হইলে আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আর ভিতরের বস্তু হইলে উহা মানস-প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করিতে পারি; অতএব যাহা আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে এবং যাহা কল্পনার বাহিরে, তাহা আমাদের মনের বাহিরে, সুতরাং আমাদের জগতের বাহিরে। অতএব কার্যকারণ-সম্বন্ধের বাহিরে স্বাধীন শাস্তা আত্মা রহিয়াছেন; এবং এই আত্মা কার্যকারণ-নিয়মের অন্তর্গত সব কিছু শাসন করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, সুতরাং অবশ্যই তিনি মুক্তস্বভাব; তিনি কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ হইতে পারেন না অথবা কোন কারণের কার্য হইতে পারেন না। তাঁহার কখন বিনাশ হইতে পারে না, কারণ ‘বিনাশ’ অর্থে কোন যৌগিক পদার্থের স্থায়ী মৌলিক উপাদানে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং যাহা কখন সংযোগোৎপন্ন ছিল না, তাহার বিনাশ হইবে কিরূপে? তাহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হয় বলা নিছক প্রলাপোক্তি।

কিন্তু এখানেই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। এইবারে আমরা বড় কঠিন জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি—বড় সূক্ষ্ম সমস্যায় আসিয়া পড়িয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ভয় পাইবে। আমরা দেখিয়াছি—পদার্থ শক্তি ও চিন্তা-রূপ ক্ষুদ্র জগতের অতীত বলিয়া আত্মা একটি মূলবস্তু; সুতরাং উহার বিনাশ অসম্ভব। যাহার মৃত্যু নাই, তাহার জীবনও অসম্ভব। জন্ম ও মৃত্যু একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। মৃত্যুর আর এক নাম জীবন এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্যু। অভিব্যক্তির একটি রূপকে আমরা জীবন বলি, আবার উহারই অন্যপ্রকার রূপকে মৃত্যু বলি। তরঙ্গের উত্থানকে জীবন, আর পতনকে মৃত্যু বলি। যদি কোন বস্তু মৃত্যুর অতীত হয়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তাহা জন্মেরও অতীত। প্রথম সিদ্ধান্তই এখন স্মরণ কর যে, মানবাত্মা সেই সর্বব্যাপী শক্তি অথবা ঈশ্বরের প্রকাশমাত্র। আমরা এখন পাইলাম, আত্মা জন্মমৃত্যু উভয়েরই অতীত। তোমার কখনও জন্ম হয় নাই, তোমার মৃত্যুও কখন হইবে না। জন্মমৃত্যু কি, কাহারই বা হয়? জন্মমৃত্যু দেহের—আত্মা তো সদা সর্বদা বর্তমান। এ কিরূপে সম্ভব? আমরা এই এখানে

এতগুলি লোক বসিয়া রহিয়াছি, আর আপনি বলিতেছেন আত্মা সর্বব্যাপী! নিশ্চয়, যে-জিনিস নিয়মের বাহিরে, কার্যকারণ-সম্বন্ধের বাহিরে, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? এই গেলাসটি সসীম-ইহা সর্বব্যাপী নহে, কারণ চারি-দিকের জড়রাশি উহাকে ঐরূপ বিশেষ আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে-উহাকে সর্বব্যাপী হইতে দিতেছে না। চারিদিকের সমুদয় বস্তুই উহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে-এই হেতু উহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাহা সকল নিয়মের বাহিরে, যাহার উপর কার্য করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? উহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে। তুমি জগতের সর্বত্রই রহিয়াছ। তবে ‘আমি জন্মিলাম, মরিব’-এ-সকল ভাব কি? এগুলি অজ্ঞানের কথা মাত্র, বুঝিবার ভুল। তুমি কখন জন্মাও নাই মরিবেও না। তোমার জন্ম হয় নাই, পুনর্জন্মাও কখন হইবে না। যাওয়া-আসার অর্থ কি? কেবল পাগলামি মাত্র। তুমি সর্বত্রই রহিয়াছ। তবে এই যাওয়া-আসার অর্থ কি? উহা কেবল সূক্ষ্ম শরীর-যাহাকে তোমরা মন বলো, তাহারই নানাবিধ পরিণাম-প্রসূত ভ্রম-মাত্র। যেন আকাশের উপর দিয়া একখণ্ড মেঘ যাইতেছে। উহা যখন চলিতে থাকে, তখন মনে হয় আকাশই চলিতেছে। অনেক সময় তোমরা দেখিয়া থাকিবে চাঁদের উপর মেঘ চলিতেছে। তোমরা মনে কর, চাঁদই এখান হইতে ওখানে যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেঘই চলিতেছে। আরও দেখ, যখন রেলগাড়িতে যাও, মনে হয় সম্মুখের গাছপালা মাঠ-সবই যেন দৌড়াইতেছে; যখন নৌকায় চলিতে থাকো, তখন মনে হয় যে জলই চলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কোথাও যাইতেছ না, আসিতেছ না-তোমার জন্ম হয় নাই, কখন হইবেও না; তুমি অনন্ত, সর্বব্যাপী, সকল কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অজ ও অবিনাশী। যখন জন্মই নাই, তখন বিনাশের আবার অর্থ কি? বাজে কথা মাত্র-তোমরা সকলেই সর্বব্যাপী।

কিন্তু নির্দোষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে আমাদেরকে আর এক ধাপ অগ্রসর হইতে হইবে। মধ্যপথে আপস করা চলিবে না।

তোমরা দার্শনিক, তোমরা যদি খানিক দূর বিচারে অগ্রসর হইয়া বলো, ‘আর পারি না, ক্ষমা করুন,’ তাহা তোমাদের পক্ষে সাজে না। যখন আমরা সমুদয় নিয়মের অতীত,

তখন অবশ্যই আমরা সর্বজ্ঞ, নিত্যানন্দস্বরূপ; অবশ্য সকল জ্ঞানই আমাদের ভিতরে আছে, সর্বপ্রকার শক্তি-সর্বপ্রকার কল্যাণ আমাদের মধ্যে নিহিত আছে অবশ্য তোমরা সকলেই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী; কিন্তু এমন পুরুষ কি জগতে বহু থাকিতে পারে? কোটি কোটি সর্বব্যাপী পুরুষ কেমন করিয়া থাকিবে? অবশ্যই থাকিতে পারে না। তবে আমাদের কি হইবে? বাস্তবিক একজনই আছেন, একটি আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই। এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছে সেই এক আত্মা। এক পুরুষই আছেন-যিনি একমাত্র সত্তা, যিনি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যু-রহিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য কিরণ দিতেছে, সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে। তিনিই প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ; প্রকৃতি সেই সত্যস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি তোমার আত্মারও ভিত্তিস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভেদ। ১ যেখানেই দুই-সেখানেই ভয়, সেখানেই বিপদ, সেখানেই দ্বন্দ্ব, সেইখানেই বিবাদ। যখন সবই এক, তখন কাহাকে ঘৃণা করিব, কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিব? যখন সবই তিনি, তখন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব? ইহাতেই জীবন-সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়, ইহাতেই বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। ইহাই সিদ্ধি বা পূর্ণতা এবং ইহাই ঈশ্বর। যখন তুমি বহু দেখিতেছ, তখনই বুঝিতে হইবে-তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিয়াছ। ২ এই বহুত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরে অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন-নিজের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাখো যে, তুমিই তিনি, তুমিই জগতের ঈশ্বর-'তত্ত্বমসি'; আর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণা-যথা, আমি পুরুষ বা স্ত্রী, দুর্বল বা সবল, সুস্থ বা অসুস্থ, আমি অমুককে ঘৃণা করি বা অমুককে ভালোবাসি, আমার ক্ষমতা অল্প বা আমার অনেক শক্তি আছে, এগুলি ভ্রমমাত্র। এই-সব ভাব ছাড়িয়া দাও। কিসে তোমাকে দুর্বল করিতে পারে? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? একমাত্র তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? অতএব উঠ, মুক্ত হও। জানিয়া রাখো, যে-কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদের দুর্বল করে,

একমাত্র তাহাই অশুভ; যাহা কিছু মানুষকে দুর্বল করে, ভীত করে, একমাত্র তাহাই অশুভ; তাহাই পরিহার করিতে হইবে। কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? যদি শত শত সূর্য স্থানচ্যুত হয়, কোটি কোটি চন্দ্র গুঁড়াইয়া যায়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী। তুমি জগতের আত্মা, ঈশ্বর। বলো, ‘শিবোহং শিবোহং, আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ’। সিংহ যেমন পিঞ্জর ভাঙিয়া ফেলে, সেইরূপ এই শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলো এবং অনন্তকালের জন্য মুক্ত হও। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? কিসে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?—কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম; আর কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না; তুমি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়।

নির্বোধেরাই বলিয়া থাকে—তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বসিয়া হা-হুতাশ কর। এরূপ বলা নির্বুদ্ধিতা—দুষ্টামি ও শঠতা। তোমরা সকলেই ঈশ্বর। তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিতেছ না এবং তাঁহাকেই মানুষ বলিতেছ না? অতএব যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র জীবনকে ঐ ছাঁচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার গলা কাটিতে আসে, তাহাকে ‘না’ বলিও না, কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরীব লোকের যদি কিছু উপকার কর, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কৃত হইও না। উহা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র; উহাতে অহঙ্কারের কিছুই নাই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও? এমন কোথায় কি জিনিস আছে, যাহা তুমি নও? তুমি জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য, চন্দ্র, তারা। সমুদয় জগৎই তুমি। কাহাকে ঘৃণা করিবে? কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিবে? অতএব জানিয়া রাখো, তিনিই তুমি—আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গঠন কর। যে-ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানিয়া এই ভাবে তাহার জীবন গঠন করে, সে আর কখনও অন্ধকারে লুটাইয়া পড়িবে না।

১০. বহুতে একত্ব

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ৩রা নভেম্বর, ১৮৯৬]

পরাঞ্চিঃ খানি ব্যত্ৰণং স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন।

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ।। ১

—‘স্বয়ম্ভূ সৃষ্টিকর্তা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করিয়া দিয়াছেন, সেইজন্যই মানুষ বাহিরের দিকে—বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু সংযতেন্দ্রিয় এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্তরস্থ আত্মাকে দেখিতে থাকেন। আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থে জগতের যে তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছিল, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই জগৎকারণের অনুসন্ধান-চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার পর এই সত্যানুসন্ধিসুগণের হৃদয়ে এক নূতন আলোকের প্রকাশ হইল; তাঁহারা বুঝিলেন, বহির্জগতে অনুসন্ধান দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। তবে কি করিয়া জানিতে হইবে? বাহিরের দিকে চাহিয়া নয়, ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া। আর এখানে আত্মার বিশেষণ-রূপে যে ‘প্রত্যক্’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও বিশেষ ভাবব্যঞ্জক। ‘প্রত্যক্’ কি না, যিনি ভিতর দিকে গিয়াছেন—আমাদের অন্তরতম বস্তু হৃদয়কেন্দ্র, সেই পরমবস্তু যাহা হইতে সব-কিছুই যেন বাহির হইয়াছে, সেই মধ্যবর্তী সূর্য—আত্মা, মন, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং আর যাহা কিছু আমাদের আছে, সবই যেন তাঁহার কিরণজাল।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্ ।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ না প্রার্থয়ন্তে ।। ২

—বালকবুদ্ধি ব্যক্তির বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে। এই জন্যই তাহারা সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞানীরা অমৃতকে জানিয়া অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য বস্তুর অনুসন্ধান করেন না। এখানেও ঐ একই ভাব পরিস্ফুট হইল যে, সসীম-বস্তুপূর্ণ

বাহ্যজগতে অনন্তকে দেখিবার চেষ্টা করা বৃথা—অনন্তেই অনন্তকে অন্বেষণ করিতে হইবে এবং আমাদের অন্তর্বর্তী আত্মাই একমাত্র অনন্ত বস্তু। শরীর, মন—যে জগৎপ্রপঞ্চ আমরা দেখিতেছি, অথবা আমাদের চিন্তারাশি—কিছুই অনন্ত হইতে পারে না। উহাদের সকলেরই কালে উৎপত্তি ও কালে বিলয়। যে দ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষ সব-কিছু দেখিতেছেন, অর্থাৎ মানুষের আত্মা, যিনি সদা জাগ্রত, তিনিই একমাত্র অনন্ত, তিনিই জগতের কারণ-স্বরূপ; অনন্তকে অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদেরকে অনন্ত আত্মাতেই যাইতে হইবে—সেইখানেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাইব।

১ কঠ উপ. , ২/১/১

২ ঐ. , ২/১/২

যদেবহ তদমুত্র তদস্বিহ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি।।১

—যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই এখানে। যিনি এখানে ‘নানা’ দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন। সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আর্যগণের স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। যখন তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন স্বভাবতই তাঁহাদের এমন একস্থানে যাইবার ইচ্ছা হইল, যেখানে কেবল দুঃখসম্পর্কশূন্য সুখ। এই স্থানগুলির নাম স্বর্গ—যেখানে কেবল আনন্দ, যেখানে শরীর অজর অমর হইবে, মনও পরিপূর্ণ হইবে, তাঁহারা সেখানে চিরকাল পিতৃগণের সহিত বাস করিবেন। কিন্তু দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয়ে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্ত কাল স্থানবিশেষে বিদ্যমান—এই ভাবই যে স্ববিরোধী। দেশ অবশ্যই কালে উৎপন্ন ও নষ্ট হইবে, সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হইল। আর্যগণ ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই স্বর্গনিবাসী দেবতাগণ এককালে এই জগতে মনুষ্য ছিলেন, পরে হয়তো কোন

সৎকর্মবশে দেবতা হইয়াছেন; সুতরাং এই দেবত্ব বিশেষ অবস্থা বা বিভিন্ন পদের নাম মাত্র। বৈদিক কোন দেবতাই স্থায়ী ব্যক্তি বিশেষ নন।

ইন্দ্র বা বরুণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। উহারা বিভিন্ন পদের নাম। তাঁহাদের মতে যিনি পূর্বে ইন্দ্র ছিলেন, এখন আর তিনি ইন্দ্র নহেন, তাঁহার এখন আর ইন্দ্রত্ব-পদ নাই, আর একজন এখান হইতে গিয়া সেই পদ অধিকার করিয়াছেন। সকল দেবতার সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে-সকল মানুষ কর্মবলে দেবত্ব-পদের যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই এই-সকল পদে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইহাদেরও বিনাশ আছে। প্রাচীন ঋগ্বেদে দেবতাগণ সম্বন্ধে এই ‘অমরত্ব’ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই বটে কিন্তু পরবর্তীকালে উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ ঋষিরা দেখিতে পাইলেন—এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন শরীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, উহা যতই সূক্ষ্ম হউক। উহা যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ আকৃতির প্রধান উপাদান দেশ। দেশ ব্যতীত আকৃতি ভাবিতে চেষ্টা কর, উহা অসম্ভব। দেশই আকার নির্মাণ করিবার একটি বিশিষ্ট উপাদান—এই আকৃতির নিরন্তর পরিবর্তন হইতেছে। দেশ ও কাল মায়ার ভিতরে। আর স্বর্গ যে এই পৃথিবীরই মতো দেশকালে সীমাবদ্ধ—এই ভাবটি উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে : ‘যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদস্বিহ’২—যাহা এখানে তাহা সেখানে, যাহা সেখানে তাহা এখানে। যদি এই দেবতারা থাকেন, তবে এখানে যে নিয়ম, সেই নিয়ম সেখানেও খাটিবে; আর সকল নিয়মের চরম উদ্দেশ্য—ধ্বংস এবং পুনরায় নূতন রূপ-ধারণ। এই নিয়মের দ্বারা সমুদয় জড় বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে, আবার ভগ্ন হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সেই জড়কণায় পরিণত হইতেছে। যে-কোন বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব যদি স্বর্গ থাকে, তবে তাহাও এই নিয়মের অধীন।

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্বপ্রকার সুখের পশ্চাতে ছায়ার মতো দুঃখ আসিয়া থাকে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহারা সর্বদা একসঙ্গেই থাকে। কারণ উহারা পরস্পর বিরোধী নহে, উহারা দুইটি পৃথক সত্তা নহে, উহারা একই

বস্তুর বিভিন্ন রূপ, সেই এক বস্তুই জীবন-মৃত্যু, দুঃখ-সুখ, ভালো-মন্দ প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মন্দ – এই দুইটি যে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, আর উহারা যে অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, এ ধারণা একেবারেই অসঙ্গত। উহারা বাস্তবিক একই বস্তুর বিভিন্নরূপ – উহা কখন ভালরূপে, কখন বা মন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র।

১ কঠ উপ. , ২/১/১১

২ কঠ উপ. , ২/১/১০

বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। বস্তুতঃ উহাদের প্রভেদ মাত্রার তারতম্যে। আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, একই স্নায়ুপ্রণালী ভাল-মন্দ উভয়বিধ প্রবাহই বহন করিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী যদি কোনরূপে বিকৃত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অনুভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন একটি বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল, তখন তাহার মধ্য দিয়া যে সুখকর অনুভূতি আসিত, তাহা আসিবে না, – আবার দুঃখকর অনুভূতিও আসিবে না। এই সুখ-দুঃখ কখনই পৃথক্ নয়, উহারা সর্বদা যেন একত্র রহিয়াছে। আবার একই বস্তু জীবনে বিভিন্ন সময়ে কখন সুখ, কখন বা দুঃখ উৎপাদন করে। একই বস্তু কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে, মাংসভোজনে ভোক্তার সুখ হয় বটে, কিন্তু যে প্রাণীর মাংস খাওয়া হয়, তাহার তো ভয়ানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকে সমভাবে সুখ দিতেছ। কতকগুলি লোক সুখী হইতেছে, আবার কতকগুলি লোক অসুখী হইতেছে। এইরূপ চলিবে। অতএব স্পষ্টই দেখা গেল, দ্বৈতভাব বাস্তবিক মিথ্যা। ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? আমি পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, জগতে এমন অবস্থা কখন আসিতে পারে না, যখন সবই ভালো হইয়া যাইবে, মন্দ কিছুই থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোষিত আশা চূর্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভয়ও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্য উপায় দেখিতেছি না। অবশ্য আমাকে যদি কেহ বিপরীতটি

বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে আমি বুঝিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যতদিন না কেহ আমাকে উহা বুঝাইয়া দিতেছে, আমি ঐরূপ বলিতে পারি না।

আমার এই দৃঢ় উক্তির বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি আছে : ক্রমবিকাশের গতিক্রমে কালে যাহা কিছু অশুভ দেখিতেছি, সব চলিয়া যাইবে – ইহার ফল এই হইবে যে, ঐরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন সমুদয় অশুভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভ অবশিষ্ট থাকিবে। আপাততঃ ইহা খুবই অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সত্য হইলে বড়ই সুখের হইত, কিন্তু এই যুক্তিতে একটি দোষ আছে। তাহা এই : উহা ধরিয়া লইতেছে যে, শুভ ও অশুভ—এই দুইটির পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০০, আবার ঐরূপ নির্দিষ্ট পরিমাণ শুভও আছে, আর অশুভ ক্রমশঃ কমিতেছে, শুভটি কেবল অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুভের ন্যায় অশুভও একটি ক্রমবর্ধমান সামগ্রী। সমাজের খুব নিম্নস্তরের ব্যক্তির কথা ধর—সে জঙ্গলে বাস করে, তাহার ভোগসুখ অতি অল্প, সুতরাং তাহার দুঃখও অল্প। তাহার দুঃখ কেবল ইন্দ্রিয়বিষয়েই আবদ্ধ। সে যদি প্রচুর আহার না পায়, তবে সে দুঃখিত হয়। তাহাকে প্রচুর খাদ্য দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শিকার করিতে দাও, সে ঠিক ঠিক সুখী হইবে। তাহার সুখ-দুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ। মনে কর, সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাহার সুখ বাড়িতেছে, তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্বে ইন্দ্রিয়ে যে সুখ পাইত, এখন বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া সেই সুখ পাইতেছে। সে এখন একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়া অপূর্ব সুখ আনন্দন করে, গণিতের যে-কোন সমস্যার মীমাংসায় তাহার সারা জীবন কাটিয়া যায়, তাহাতেই সে পরম সুখ ভোগ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব সে করে নাই, তাহার স্নায়ুগণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব সে তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করে। একটি খুব সোজা উদাহরণ লও : তিব্বতে বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে প্রেমের ঈর্ষাও নাই; কিন্তু তথাপি আমরা জানি, বিবাহ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক। তিব্বতীরা নিষ্কলঙ্ক স্বামী ও নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীর

বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেমের সুখ জানে না। কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানে না— একজন ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা হইলে অপরের মনে কি ভয়ানক ঈর্ষা, কি ভয়ানক অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়! একদিকে এই উচ্চ ধারণায় তাহাদের সুখের বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহাতে দুঃখেরও বৃদ্ধি হইল।

তোমাদের নিজেদের দেশের কথাই ধর— পৃথিবীতে ইহার মতো ধনী দেশ, বিলাসিতার দেশ আর নাই—আবার কি গভীর দুঃখকষ্ট এখানে বিরাজ করিতেছে, তাহাও দেখ। অন্যান্য জাতির তুলনায় এদেশে পাগলের সংখ্যা কত অধিক! ইহার কারণ এখানকার লোকের বাসনাসমূহ অতি তীব্র, অতি প্রবল। এখানে লোককে সর্বদাই উঁচু চাল বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। তোমরা এক বছরে যত টাকা খরচ কর, একজন ভারতবাসীর পক্ষে তাহা সারাজীবনের সম্পদ। তোমরা অপরকে উপদেশ দিতে পার না যে অপেক্ষাকৃত অল্প টাকায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চেষ্টা কর, কারণ এখানে সামাজিক অবস্থাই এইরূপ যে, এতটাকার কমে চলিবেই না। এই সমাজ-চক্র দিবারাত্র ঘুরিতেছে—উহা বিধবার অশ্রু বা অনাথের চীৎকারে কর্ণপাতও করিতেছে না। এখানে সর্বত্রই এই অবস্থা। তোমাদের ভোগের ধারণাও অনেক পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদের সমাজও অন্যান্য সমাজ হইতে অনেক সুন্দর। তোমাদের ভোগেরও নানাবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহাদের ঐরূপ ভোগের উপকরণ অল্প, তাহাদের আবার তোমাদের অপেক্ষা দুঃখ অল্প। এরূপই সর্বত্র দেখিতে পাইবে। তোমার মনে যতদূর উচ্চাভিলাষ থাকিবে, তোমার তত বেশী সুখ, আবার সেই পরিমাণেই দুঃখ। একটি যেন অপরটির ছায়াস্বরূপ। অশুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুভও চলিয়া যাইতেছে, বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দুঃখ যেমন একদিকে কমিতেছে, তেমনি কি আবার অন্যদিকে কোটিগুণ বাড়িতেছে না? প্রকৃত কথা এই, সুখ যদি সমযুক্তান্তর নিয়মানুসারে বাড়িতে থাকে, দুঃখ তাহা হইলে সমগুণিতান্তর নিয়মানুসারে বাড়িতেছে, বলিতে হইবে। ইহার নামই মায়া। ইহা কেবল সুখবাদ নহে, কেবল দুঃখবাদও নহে। বেদান্ত বলে না যে, জগৎ কেবল দুঃখময়। এরূপ বলাই ভুল। আবার এই জগৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে। এই জগৎ কেবল মধুময়—এখানে কেবল সুখ, এখানে কেবল ফুল,

এখানে কেবল সৌন্দর্য, কেবল মধু-বালকদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া ভুল। আমরা সারা জীবনটাই এই রূপ স্বপ্ন দেখি। আবার কোন ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা অধিক দুঃখভোগ করিয়াছে বলিয়া সবই দুঃখময়, বলাও ভুল। জগৎ এই দ্বৈতভাবপূর্ণ ভাল-মন্দের খেলা। বেদান্ত আবার ইহার উপর আর একটি কথা বলে। মনে করিও না যে, ভালো-মন্দ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, বাস্তবিক উহারা একই বস্তু, সেই এক বস্তুই বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে বিভিন্ন ভাব সৃষ্টি করিতেছে। অতএব বেদান্তের প্রথম কার্যই হইতেছে, এই বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান বাহ্যজগতের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা। পারসীকদের মত-দুইটি দেবতা মিলিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এ মতটি অবশ্য অতি অনুন্নত মনের পরিচায়ক। তাঁহাদের মতে ভাল দেবতা যিনি, তিনি সব সুখ বিধান করিতেছেন, আর মন্দ দেবতা সব মন্দ বিষয় বিধান করিতেছেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা তো স্পষ্টই বোধ হইতেছে; কারণ বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য হইলে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই দুইটি করিয়া অংশ থাকিবে-কখন একজন দেবতা উহা চালাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন, আবার আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আমরা দেখিতে পাই, যে-শক্তি আমাদের খাদ্য দিতেছে, তাহাই আবার দৈবদুর্বিপাক দ্বারা অনেককে সংহার করিতেছে। এই মত স্বীকার করিলে আর একটি মুশকিল হয় এই যে, একই সময়ে দুই জন দেবতা কার্য করিতেছেন। একস্থানে এক দেবতা কাহারও উপকার করিতেছেন, অন্যস্থানে অন্য দেবতা কাহারও অপকার করিতেছেন। অথচ দুইজনে আপনাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতেছেন-ইহা কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্য এ মত জগতের দ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ করিবার খুব অপরিণত প্রণালীমাত্র-ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এখন উচ্চতর দর্শনসমূহে এই বিষয়ের কি রূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক। ঐগুলিতে স্থূল তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্ম ভাবের দিক দিয়া বলা হয়, জগৎ কতক ভাল, কতক মন্দ। পূর্বে যে যুক্তিপরিম্পরা বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে ইহাও অসম্ভব।

অতএব দেখিতেছি, কেবল সুখবাদ বা কেবল দুঃখবাদ—কোন মতের দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা বা যথার্থ বর্ণনা হয় না। এ জগৎ সুখ-দুঃখের মিশ্রণ। ক্রমশঃ আমরা দেখিব, সমুদয় দোষ প্রকৃতির স্কন্ধ হইতে আমাদের নিজেদের উপর লওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত আমাদের মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে। বেদান্ত অমঙ্গল অস্বীকার না করিয়া জগতের সমুদয় ঘটনার সম্মুখীন হইয়া বিশ্লেষণ করে,—কোন বিষয় গোপন করিতে চাহে না; উহা মানুষকে একেবারে নিরাশা-সাগরে ভাসাইয়া দেয় না। উহা অজ্ঞেয়বাদীও নহে। উহা এই সুখদুঃখ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, আর ঐ প্রতীকারের উপায় বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা এমন কোন উপায়ের কথা বলে না, যাহাতে কেবল ছেলেদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় বা তাহাদের চোখে ধুলি দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা উহা সহজেই ধরিয়া ফেলিবে। আমার মনে আছে—যখন আমি বালক ছিলাম, তখন কোন যুবকের পিতা মারা যায়, সে অতি দরিদ্র হইয়া পড়ে, একটি বড় পরিবার তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই তাহার প্রধান শত্রু। একদিন একজন ধর্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাহার নিজ দুঃখের কাহিনী তাঁহাকে বলিতে লাগিল—তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ধর্মযাজকটি বলিলেন ‘যাহা হইতেছে, সবই মঙ্গলের জন্য; যাহা কিছু হয়, সব ভালোর জন্যই হয়।’ পুরাতন ক্ষতকে সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া রাখা যেমন, ধর্মযাজকের পূর্বোক্ত বাক্যটিও ঠিক তেমনি। ইহা আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। ছয় মাস বাদে সেই ধর্মযাজকের একটি সন্তান হইল, সেই উপলক্ষে উৎসবে যুবকটি নিমন্ত্রিত হইল। ধর্মযাজক ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘ঈশ্বরের কৃপার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।’ তখন যুবকটি উঠিয়া বলিল, ‘কি বলিতেছেন—তাঁহার কৃপা কোথা? এ যে ঘোর অভিশাপ!’ ধর্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেন?’ যুবক উত্তর দিল, ‘যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তাহা আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও উহাকে মঙ্গল বলিয়া ছিলেন। এখন আপনার সন্তানের জন্মও আপাততঃ মঙ্গল কর বলিয়া প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা আমার নিকট মহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হইতেছে।’ এইভাবে জগতের দুঃখ, অমঙ্গলের বিষয় চাপিয়া রাখাই কি জগতের দুঃখনিবারণের উপায়? নিজে ভাল হও এবং যাহারা

কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। জোড়াতালি দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে জাগতিক দুঃখ দূর হইবে না। আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে।

এই জগৎ সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণ। যেখানে ভাল দেখিবে, জানিবে—তাহার পশ্চাতে মন্দও রহিয়াছে। কিন্তু এই-সকল ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে—এই-সকল বিরোধী ভাবের পশ্চাতে—বেদান্ত সেই একত্বই খুঁজিয়া পায়। বেদান্ত বলে, মন্দ ত্যাগ কর, আবার ভালও ত্যাগ কর। তাহা হইলে বাকি রহিল কি? বেদান্ত বলে, শুধু ভালমন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিস রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা তোমার স্বরূপ, যাহা সর্বপ্রকার শুভ ও সর্বপ্রকার অশুভের বাহিরে—সেই বস্তুই শুভ বা অশুভরূপে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে এই তত্ত্ব জানো—তখন, কেবল তখনই তুমি পূর্ণ সুখবাদী হইতে পারিবে। তাহার পূর্বে নহে।

তাহা হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আপাতপ্রতীয়মান ব্যক্তভাবগুলি আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তুমি সেই সত্যবস্তুকে যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। তখনই তুমি উহাকে—শুভরূপেই হউক আর অশুভরূপেই হউক—যে ভাবে ইচ্ছা, প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমেই তোমাকে নিজের প্রভু হইতে হইবে। উঠ, নিজেকে মুক্ত কর, এই-সকল নিয়মের বাহিরে যাও, কারণ এই নিয়মগুলি তোমাকে সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না, উহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি সামান্য মাত্র প্রকাশ করে। প্রথমে জানো—তুমি প্রকৃতির দাস নও, কখনও ছিলে না, কখন হইবেও না; প্রকৃতিকে আপাততঃ অনন্ত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা সসীম, উহা সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র; তুমিই বাস্তবিক সমুদ্রস্বরূপ, তুমি চন্দ্র সূর্য তারা—সকলেরই অতীত। তোমার অনন্ত স্বরূপের তুলনায় উহারা বুদ্ধদমাত্র। ইহা জানিলে তুমি ভালমন্দ দুই-ই জয় করিতে পারিবে। তখনই তোমার সমগ্র দৃষ্টি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তখন তুমি দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে : মঙ্গল কি সুন্দর! অমঙ্গল কি অদ্ভুত!

বেদান্ত ইহাই করিতে বলে। বেদান্ত বলে না, সোনার পাত মুড়িয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখো, আর যতই ক্ষত পচিতে থাকে, আরও বেশী সোনার পাত দিয়া মুড়িতে থাকো। এই জীবন

একটা কঠিন সমস্যা, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা বজ্রবৎ দুর্ভেদ্য মনে হয়, তথাপি যদি পারো, সাহসপূর্বক ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা কর—আত্মা এই দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণে শক্তিমান। বেদান্ত তোমার কর্মফলের জন্য ছোটখাটো দেবতাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে না, তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা। তুমি নিজ কর্মফলে ভালমন্দ দুই-ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই নিজের চোখে হাত দিয়া বলিতেছ—অন্ধকার। হাত সরাইয়া লও—আলো দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিঃ-স্বরূপ—তুমি পূর্ব হইতেই সিদ্ধ। ‘মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি’^১—এখন আমরা এই শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।

কি করিয়া আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারিব? এই মন যাহা এত ভ্রান্ত, এত দুর্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হয়, এই মনকেও সবল করা যাইতে পারে, যাহাতে উহা সেই জ্ঞানের—সেই একত্বের আভাস পায়।

১ কঠ উপ. , ২/১/১০

তখন সেই জ্ঞানই আমাদেরকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। ‘যথোদকং দুর্গে বৃষ্টিং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক পশ্যন্ত্তানেবানু-বিধাবতি ॥’^১—উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্টি হইলে জল যেমন পর্বতসমূহের পার্শ্ব দিয়া বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে শক্তিসমূহকে পৃথক্ করিয়া দেখে সে তাহাদেরই অনুবর্তন করে। বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মায়াতে বহু হইয়াছে। বহুর পিছনে ধাবিত হইও না, সেই একের দিকে অগ্রসর হও।

হংসঃ শচিষদসুরন্তরিক্ষসদ্বোতা বেদিষদতিথির্দুরোগসৎ।

নৃষদ্বরসদৃতসদ্যোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥২

—সেই আত্মা আকাশবাসী সূর্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিতে অবস্থিত অগ্নি ও কলসস্থিত সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পর্বতে আছেন; তিনি সত্য ও মহান্।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ।।
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ।।৩

—যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ লাভ করিয়াছেন, তেমনি সেই এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ ধারণ করিয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।

যখন তুমি এই একত্ব উপলব্ধি করিবে, তখনই এই অবস্থা হয়, তাহার পূর্বে নহে। সর্বত্র তাঁহাকে দর্শন করাই প্রকৃত সুখবাদ। এখন প্রশ্ন এই, যদি ইহা সত্য হয়, যদি সেই শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত আত্মা এই-সকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন সুখদুঃখ ভোগ করেন, কেন তিনি অপবিত্র হইয়া দুঃখভোগ করেন?

১ কঠ উপ. , ২/১/১৪

২ ঐ. , ২/২/২

৩ ঐ. , ২/২/৯-১০

উপনিষদ্ বলেন, তিনি দুঃখ অনুভব করেন না।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।।১

—সর্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অণুটি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা সংসারের দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না, কারণ তিনি আবার জগতের অতীত। আমার এমন রোগ থাকিতে পারে, যাহাতে আমি সবই পীতবর্ণ দেখি, কিন্তু তাহাতে সূর্যের কিছুই হয় না।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্।।২

—যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা; যিনি স্বকীয় এক রূপকে বহুপ্রকার করেন, তাঁহাকে যে-জ্ঞানিগণ নিজেদের মধ্যে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে।

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধেরাস্তেষাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতরেষাম্।।৩

—যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবানদিগের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।

বাহ্য জগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সূর্য চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরূপে পাইবে?

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্ব মদং বিভাতি।৪

—সেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব নিস্প্রভ, বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি সেখানে কোথায়? তাঁহারই আলোতে সকলে আলোকিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সবকিছু দীপ্তি পাইতেছে।

১ কঠ উপ. , ২/২/১১

২ ঐ. , ২/২/১২

৩ ঐ. , ২/২/১৩

৪ ঐ. , ২/২/১৫

‘উর্ধ্বমূলোহবাক্ষাখ এষোহশ্বখঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবা-মৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাতেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।’১ –উর্ধ্বমূল ও নিম্নগামী শাখা সহ এই চিরন্তন অশ্বখবৃক্ষ অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ রহিয়াছে। তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হন। সমুদয় লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে নানাবিধ স্বর্গের কথা আছে। উপনিষদের মত এই যে, এই স্বর্গে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইন্দ্রলোকে, বরুণলোকে যাইলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা নহে, বরং এই আত্মার ভিতরেই ব্রহ্মদর্শন সুস্পষ্টরূপে হইয়া থাকে।

‘যথাদর্শে তথাঅনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।।’২–যেমন আরশিতে মানুষ আপনার প্রতিবিম্ব পরিস্কাররূপে দেখিতে পাই, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন স্বপ্নে আপনাকে অস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন জলে লোকে আপনার রূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধর্বলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন আলোক ও ছায়া পরস্পর পৃথক, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম ও জগতের পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। কিন্তু তথাপি পূর্ণরূপে ব্রহ্মদর্শন হয় না। অতএব বেদান্ত বলে, আমাদের নিজ আত্মাই সর্বোচ্চ স্বর্গ, মানবআত্মাই পূজার

সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, সর্বপ্রকার স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে যেভাবে সেই সত্যকে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়, আর কোথাও তত স্পষ্ট অনুভব হয় না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেলেই যে এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য হয়, তাহা নহে। ভারতবর্ষে যখন ছিলাম, তখন মনে হইত, কোন গুহায় বাস করিলে হয়তো খুব স্পষ্ট ব্রহ্মানুভূতি হইবে; দেখিলাম, তাহা নহে। তারপর ভাবিলাম, হয়তো বনে গেলে সুবিধা হইবে, তারপর কাশীর কথা মনে হইল। সব স্থানই একরূপ, কারণ আমরা নিজেরাই নিজাদের জগৎ গঠন করিয়া লই। যদি আমি অসাধু হই, সমুদয় জগৎ আমার পক্ষে মন্দ বলিয়া মনে হইবে। উপনিষদ্ ইহাই বলেন।

১ কঠ উপ. , ২/৩/১

২ ঐ. , ২/৩/৫

আর সেই একই নিয়ম সর্বত্র খাটিবে। যদি এখানে আমার মৃত্যু হয় এবং যদি স্বর্গে যাই, সেখানেও এখানকারই মতো দেখিব। যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা অরণ্য বারাণসী অথবা স্বর্গে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই; আর যদি তোমার চিত্তদর্পণকে নির্মল করিতে পারো, তবে যেখানেই থাকো না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুভব করিবে। অতএব এখানে ওখানে যাওয়া বৃথা শক্তিক্ষয় মাত্র—সেই শক্তি যদি চিত্তদর্পণের নির্মলতা-সাধনে ব্যয়িত হয়, তবেই ঠিক হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকে আবার ঐভাব বর্ণিত হইয়াছে :

ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।

হৃদা মনীষা মনসাভিকলপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।।১

—ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

যাঁহারা আমার রাজযোগের বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য বলিতেছি, সে-যোগ জ্ঞানযোগ হইতে কিছু ভিন্ন রকমের। জ্ঞানযোগের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে :

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহঃ পরমাং গতিম্॥২

—যখন ইন্দ্রিয়গুলি—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত হয়, মানুষ যখন ঐগুলিকে নিজের দাসের মতো করিয়া রাখে, যখন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তখনই যোগী পরমগতি লাভ করেন।

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোহমৃতো ভতত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে॥
যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যেতাবদ্ব্যনুশসনম্॥৩

—যে-সকল কামনা মর্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হয় এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়—এইমাত্র উপদেশ।

- ১ কঠ উপ. , ২/৩/৯
২ ঐ. , ২/৩/১০
৩ ঐ. , ২/৩/১৪-১৫

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে বেদান্ত, শুধু বেদান্ত কেন, ভারতীয় সকল দর্শন ও ধর্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার বাহিরে যাইতে বলিতেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বয়

হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, আমাদের দার্শনিকগণ স্বর্গ অথবা আর কোথাও যাইতে চাহিতেন না, বরং তাঁহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ ও সুখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। যতদিন আমরা দুর্বল থাকিব, ততদিন আমাদেরকে স্বর্গ-নরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্তু বস্তুতঃ আত্মাই একমাত্র সত্য। তাঁহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দ্বারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করা যায় না। তবে অবশ্য প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় হিন্দুরাও সব হাতে-কলমে করিতে চান; তবে জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্। পাশ্চাত্যগণ বলেন : বেশ ভাল একখানি বাড়ি কর, উত্তম খাদ্য ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চা কর, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি কর। এইগুলি করিবার সময় তাঁহারা খুব কাজের লোক। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, জ্ঞান-অর্থে আত্মজ্ঞান-তাঁহারা সেই আত্মজ্ঞানের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন।

আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা^১ আছেন—তিনি খুব ভালো লোক এবং সুবক্তা। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; তাহাতে তিনি বলেন, ধর্মের কোন প্রয়োজন নাই, পরলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যিকতা নাই। তাঁহার মত বুঝাইবার জন্য তিনি এই উপামাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন : জগৎরূপ এই কমলালেবুটি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহার সব রসটা আমরা বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার সঙ্গে তাঁহার একবারমাত্র সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে বলি, আমিও আপনার সঙ্গে একমত, আমারও নিকট একটি ফল রহিয়াছে—আমিও উহার রসটুকু সব খাইতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল ঐ ফলটি কি, এই লইয়া। আপনি উহাকে কমলালেবু মনে করিতেছেন—আমি ভাবিতেছি আম। আপনি মনে করেন, জগতে আসিয়া খাইতে পরিতে পাইলেই যথেষ্ট হইল এবং কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেই চূড়ান্ত হইল; কিন্তু আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, উহা ছাড়া মানুষের আর কিছু কর্তব্য নাই। আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে কিছুই নয়।’

১ Robert Ingersoll.

আপেল ভূমিতে ক্রিকেটে পড়ে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ ক্রিকেটে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, যদি কেবল এইটুকু জানাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়, তবে তো আমি এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সংকল্প—সকল বস্তুর মর্মস্থল অনুসন্ধান করিব—জীবনের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা জানিব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে চাই। আমার দর্শন বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে হইবে—স্বর্গ নরক প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করিয়া দিতে হইবে, যদিও এই পৃথিবীর মতো ঐগুলির ব্যবহারিক সত্তা রহিয়াছে। আমি এই আত্মার অন্তরাত্মকে জানিব—উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব—উহা কি, তাহা জানিব; শুধু উহা কিভাবে কাজ করিতেছে এবং উহার প্রকাশ কি, তাহা জানিলেই আমার তৃপ্তি হইবে না। আমি সকল জিনিসের ‘কেন?’ জানিতে চাই; ‘কেমন করিয়া হয়?’—এ অনুসন্ধান বালকেরা করুক। বিজ্ঞান আর কি? তোমাদের দেশের একজন বলিয়াছেন, ‘সিগারেট খাইবার সময় যাহা যাহা ঘটে, তাহা যদি আমি লিখিয়া রাখি, তাহাই সিগারেটের বিজ্ঞান হইবে।’ অবশ্য বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের সহায়তা করুন, তাঁহাদের আশীর্বাদ করুন; কিন্তু যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সব, ইহা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, তখন সে নির্বোধের মতো কথা বলিতেছে, বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—সে কখনও জীবনের মূল রহস্য জানিতে চেষ্টা করে নাই, প্রকৃত বস্তু কি, সে-সম্বন্ধে সে কখনও আলোচনা করে নাই। আমি অনায়াসেই যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারি যে, তোমাদের যত কিছু জ্ঞান, সব ভিত্তিহীন। প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া তোমরা আলোচনা করিতেছ, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি, ‘প্রাণ কি?’ বলিবে, জানি না। অবশ্য তোমাদের যাহা ভাল লাগে, তাহা করিতে তোমাদিগকে কেহ বাধা দিতেছে না, কিন্তু আমাকে আমার ভাবে থাকিতে দাও।

আর ইহাও লক্ষ করিও যে, আমি আমার ভাবে খুবই কাজের লোক। অতএব অমুক কাজের লোক নয়, অমুক কাজের লোক, এ-সব বাজে কথা।

তুমি একভাবে কাজের লোক, আমি আর একভাবে। প্রাচ্যদেশে কাহাকেও যদি বলা যায়, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্যবস্তু লাভ করিবে, তবে সে ঐ প্রণালী অবলম্বন করিবে। আর পাশ্চাত্যে কেহ যদি শোনে—অমুক জায়গায় সোনার খনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দিকে অসভ্য লোকের বাস, হাজার লোক সোনার আশায় বিপদের সম্মুখীন হইবে, হয়তো একজন কৃতকার্য হইবে। ঐ-সকল লোক এ-কথাও শুনিয়াছে—আত্মা বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু তাহারা পুরোহিতবর্গের উপর উহার ভার দিয়াই নিশ্চিত। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কিন্তু সোনার জন্য অসভ্যদিগের কাছে যাইতে রাজি নয়। সে বলে, উহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু যদি তাহাকে বলা যায়, এভারেষ্ট পর্বতের শিখরে, সমুদ্র-পৃষ্ঠের ৩০,০০০ ফিট উপরে এমন একজন আশ্চর্য সাধু আছেন, যিনি তাহাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন, অমনি সে কাপড়-চোপড় লইয়া অথবা কিছুমাত্র না লইয়াই একেবারে যাইতে প্রস্তুত; এই চেষ্টায় হয়তো ৪০,০০০ লোক মারা যাইতে পারে, একজন হয়তো সত্য লাভ করিবে। ইহারাও একদিকে খুব কাজের লোক, তবে লোকের ভুল হয় এইটুকু—তুমি যেটুকুকে জগৎ বলো, সেই টুকুই সব, এই চিন্তা করা। তোমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র—উহাতে নিত্য কিছুই নাই, বরং উহা উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে। আমার পথে অনন্ত শান্তি, তোমার পথে অনন্ত দুঃখ।

আমি বলি না যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাজের পথ বলিতেছ, তাহা ভ্রম। তুমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছ, তাহা কর। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে, কিন্তু তা বলিয়া আমার মতকে নিন্দা করিও না। আমার পথও আমার ভাবে আমার পক্ষে কার্যকর পথ। এস আমরা সকলে নিজ নিজ প্রণালীতে কাজ করি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা উভয় দিকেই কর্মকুশল হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল হইত। আমি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, যাঁহারা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব—উভয়দিকেই কাজের লোক; আর আমি আশা করি, কালে সমুদয় মানবজাতি ঐভাবে উভয়ত্র কাজের লোক হইবে। মনে কর, এক কড়া জল গরম হইতেছে—সেই সময় কি হইতেছে, তাহা যদি লক্ষ্য কর, দেখিবে এক কোণে একটি বুদ্বুদ উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটি উঠিতেছে। এই বুদ্বুদগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে—চার-পাঁচটি একত্র হয়, অবশেষে সবগুলি একত্র হইয়া এক প্রবল গতি আরম্ভ হয়। এই জগৎও

এইরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক একটি বুদ্ধ, আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুদ্ধদের সমষ্টি। ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে মিলন হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, এমন একদিন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে না—জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। বাস্তবিক আমাদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা এখন সকলে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি। এমন সময় অবশ্য আসিবে, যখন এই-সকল ভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে—প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাজের লোক হইবে—তখন সেই একত্ব, সেই মিলন জগতে প্রকাশিত হইবে। তখন সকলে জীবনযুক্ত হইবে। আমাদের ঈর্ষা, ঘৃণা, মিলন ও বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটি প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা, খড়কুটা প্রভৃতি এদিকে ওদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে যাইতে হইবে। এইরূপ তুমি আমি—এমন কি সমুদয় প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরার মতো সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর—ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি; আমরা এদিক ওদিক যাইবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে সেই জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পৌঁছিব।

১১. সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন

[লগুনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমরা দেখিয়াছি, আমরা দুঃখ দূর করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের জীবনের বেশীর ভাগই অবশ্য দুঃখপূর্ণ থাকিবে। আর এই দুঃখরাশি আমাদের পক্ষে একরূপ সীমাহীন। আমরা অনাদি কাল হইতে এই দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। আমরা যতই দুঃখ-প্রতিকারের উপায় বাহির করি, ততই আমরা নিজেদের সূক্ষ্মতর দুঃখরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিতে পাই। আমরা আরও দেখিয়াছি, সকল ধর্মই বলিয়া থাকে, এই দুঃখ-চক্রের বাহিরে যাইবার একমাত্র উপায় ঈশ্বর। সকল ধর্মই বলিয়া থাকে—আধুনিক কর্মকুশল লোকদের উপদেশমত জগৎকে যেমন দেখিতেছ, তেমনি গ্রহণ করিলে আমাদের ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্মই বলে—এই জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনই সবটুকু নয়, উহা প্রকৃত জীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র, বাস্তবিক উহা অতি স্থূল ব্যাপার। উহার পশ্চাতে, উহার অতীত প্রদেশে সেই অনন্ত রহিয়াছেন, যেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই—উহাকে কেহ গড়, কেহ আল্লা, কেহ জিহোভা, কেহ জোভ, কেহ বা আর কিছু বলিয়া থাকেন। বেদান্তীরা উহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া থাকেন।

কিন্তু জগতের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, এ-কথা সত্য হইলেও আমাদের কাছে এই জগতে জীবনধারণ করিতে তো হইবে? এখন ইহার মীমাংসা কোথায়?

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে—সকল ধর্মের এই উপদেশ হইতে আপাততঃ এই ভাবই মনে উদিত হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি শ্রেয়ঃ। প্রশ্ন এই—জীবনের দুঃখরাশির প্রতিকার কি? আর তাহার যে উত্তর দেওয়া হয়, তাহাতে আপাততঃ মনে হয়—জীবনটাকে ত্যাগ করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। ইহার উত্তরে আমাদের একটি প্রাচীন গল্পের কথা মনে পড়ে। একজনের মাথার উপরে একটা মশা বসিয়াছিল, তাহার এক বন্ধু ঐ মশাটাকে

মারিতে গিয়া তাহার মস্তকে এমন তীব্র আঘাত করিল যে, সেই লোকটি মারা গেল, মশাটিও মরিল। দুঃখ প্রতিকারের যে উপায়ের কথা ধর্ম বলে, তাহা এইরূপই।

জীবন যে দুঃখপূর্ণ, জগৎ যে দুঃখপূর্ণ—তাহা জগৎকে যে বিশেষরূপে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সকল ধর্ম ইহার প্রতিকারের কি উপায় বলে? ধর্মগুলি বলে, জগৎ কিছুই নয়; এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে, যাহা প্রকৃত সত্য। এই খানেই বিবাদ। উপায়টি যেন আমাদের যাহা কিছু আছে, সবই নষ্ট করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিতেছে। তবে কি করিয়া উহার প্রতিকারের উপায় হইবে? তবে কি কোনই উপায় নাই? প্রতিকারের অন্ততঃ আর একটি উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছে। বেদান্ত বলে, বিভিন্ন ধর্ম যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ কথার যথার্থ তাৎপর্য কি, তাহা বুঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্মের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকে, ধর্মগুলিও ঐ বিষয়ে খুব স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই প্রয়োজন। হৃদয় অবশ্য খুব বড় জিনিস—হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের মহৎ প্রেরণাগুলির স্ফুরণ হয়। হৃদয়শূন্য কেবল মস্তিষ্ক অপেক্ষা যদি আমার মস্তিষ্ক না-ই থাকে, শুধু একটু হৃদয় থাকে, তাহা আমি শতবার পছন্দ করিব। যাহার হৃদয় আছে, তাহারই যথার্থ জীবন—তাহারই উন্নতি সম্ভব; কিন্তু যাহার এতটুকু হৃদয় নাই, কেবল মস্তিষ্ক আছে, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়।

কিন্তু আমরা ইহাও জানি, যিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার প্রায়ই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা চাই—হৃদয় ও মস্তিষ্কের মিলন। আমার কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, কিছুটা হৃদয় ও কিছুটা মস্তিষ্কের মধ্যে আপস করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয়ানুভূতি থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক।

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমা আছে? জগৎ কি অনন্ত নয়? জগতে অনন্তপরিমাণ ভাববিকাশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্তপরিমাণ শিক্ষানুশীলন

ও বিচারের অবকাশ আছে। অব্যাহতভাবে ঐ দুই ভাবই একসঙ্গে আসুক-উভয়েই সমান্তরালভাবে চলিতে থাকুক।

অধিকাংশ ধর্মই, জগতে যে দুঃখরাশি বিদ্যমান-এ ব্যাপারটি বুঝেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই উহার উল্লেখ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকলেই বোধ হয় একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ের দ্বারা, ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। জগতে দুঃখ আছে, অতএব সংসারত্যাগ কর-ইহা খুব বড় উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ, সন্দেহ নাই। ‘সংসারত্যাগ কর’-সত্য জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে-ভালো পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে-এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি এই মতবাদের তাৎপর্য এই হয় যে, পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন-আমরা যাহাকে জীবন বলিয়া জানি, আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর আমাদের থাকে কি? যদি আমরা উহা ত্যাগ করি, তবে তো আমাদের কিছুই থাকে না।

যখন আমরা বেদান্তের দার্শনিক অংশের আলোচনা করিব, তখন আমরা এই তত্ত্ব আরও ভালভাবে বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়। এখানে কেবল বেদান্তের প্রকৃত উপদেশ কি, তাহাই বলিব-বেদান্ত শিক্ষা দেয় জগৎকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করিতে।

বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে-নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের ব্রহ্মভাব-জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখ-বাস্তবিকও উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে-বেদান্ত

সম্বন্ধে লিখিত প্রথম পুস্তকে-দেখিতে পাই, ‘ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ’১-জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।

১ ঈশ উপ.,-১ম শ্লোক

সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে-জগতে যে অশুভ দুঃখ আছে তাহার দিকে না চাহিয়া, মিছিমিছি সবই মঙ্গলময়-সবই সুখময় বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য-এরূপ ভ্রান্ত সুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া। এই ভাবে আমরা দিগকে ‘সংসার’ ত্যাগ করিতে হইবে-আর যখন সংসারত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি?-ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই-তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা নয়; কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ কর-ইহার অর্থ কি? ছেলেগুলিকে লইয়া কি রাস্তায় ফেলিয়া দিতে হইবে-যেমন সকল দেশে নর-পশুরা করিয়া থাকে? কখনই নয়; উহা তো পৈশাচিক কাণ্ড-উহা তো ধর্ম নহে। তবে কি? সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে-সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। বেদান্ত ইহাই বলে; তুমি জগৎকে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর; কারণ তোমার অনুমান আংশিক অনুভূতির উপর-খুব সামান্য যুক্তির উপর-মোট কথা, তোমার নিজের দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর-আমরা এতদিন জগৎকে যেরূপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন যে-জগতে আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট মিথ্যা জগৎ মাত্র; উহা ত্যাগ কর। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, আমরা যেভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃত পক্ষে কখনই উহার সেরূপ অস্তিত্ব ছিল না-আমরা স্বপ্নে ঐরূপ দেখিতেছিলাম-মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের ঐরূপ ভ্রম হইতেছিল, অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই সন্তান-সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই

ভালয় মন্দে, তিনিই পাপে ও পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং মরণেও তিনিই রহিয়াছেন।

বিষম প্রস্তাব বটে! কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার করিতে চায়। ইহা তো শুধু বেদান্তের আরম্ভ!

আমরা এইভাবে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ ও দুঃখরাশি এড়াইতে পারি। কিছু চাহিও না। আমাদেরকে অসুখী করে কিসে? আমরা যে-সকল দুঃখভোগ করিয়া থাকি, বাসনা হইতেই সেগুলির উৎপত্তি। তোমার কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল-দুঃখ। অভাব যদি না থাকে, তবে দুঃখও থাকিবে না। যখন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব, তখন কি হইবে? দেয়ালের কোন বাসনা নাই, উহা কখন দুঃখ ভোগ করে না। ইহা সত্য, কিন্তু দেয়ালের কোনরূপ উন্নতিও হয় না। এই চেয়ারের কোন বাসনা নাই, কোন কষ্টও নাই কিন্তু উহা যে চেয়ার, সেই চেয়ারই থাকে। সুখভোগের ভিতরেও এক মহান্ ভাব আছে, দুঃখভোগের ভিতরেও আছে। যদি সাহস করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, দুঃখেরও উপকারিতা আছে। আমরা সকলেই জানি, দুঃখ হইতে কি মহৎ শিক্ষা হয়। জীবনে শত শত কাজ করিয়াছি; পরে বোধ হয়, না করিলেই ছিল ভাল, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ-সকল কাজ আমাদের মহান্ শিক্ষকের কাজ করিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়া আমি আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কাজ করিয়াছি বলিয়াও সুখী-আমি কিছু সৎকার্য করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত, আবার অনেক ভ্রমে পড়িয়াছি বলিয়াও সুখী, কারণ উহাদের প্রত্যেকটিই আমাকে মহৎ শিক্ষা দিয়াছে।

আমি এখন যাহা, তাহা আমার পূর্ব কর্ম ও চিন্তাসমষ্টির ফলস্বরূপ। প্রত্যেক কার্য ও চিন্তারই একটি না একটি ফল আছে, এবং এই ফলগুলির সমষ্টি আমার এই অগ্রগতি-এই উন্নতি। তবেই এখন সমস্যা কঠিন হইয়া পড়িল। আমরা সকলেই বুঝি-বাসনা বড় খারাপ জিনিস, কিন্তু বাসনা-ত্যাগের অর্থ কি? বাসনা ত্যাগ করিলে দেহযাত্রা নির্বাহ হইবে কিরূপে? ইহাও কি সেই মশা মারার জন্য মানুষ মারা নয়? বাসনাকে সংহার কর, তাহার

সঙ্গে বাসনায়ুক্ত মানুষটাকেও মারিয়া ফেলো! তবে শোন ইহার উত্তর কি : তোমার যে বিষয়-সম্পত্তি থাকিবে না, তাহা নহে; প্রয়োজনীয় জিনিস, এমন কি বিলাসের জিনিস পর্যন্ত রাখিবে না, তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্যিক, এমন কি তদতিরিক্ত জিনিস পর্যন্ত তুমি রাখিতে পারো—তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এই যে, সত্যকে জানিতে হইবে—প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

এই ধন—ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্বামিত্বের ভাব রাখিও না। তুমি তো কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই কিছু নহে। সবই সেই প্রভুর বস্তু; ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে—ঈশ্বরকে সর্ববস্তুর ভিতরে স্থাপন কর। ঈশ্বর তোমার ভোগ্য ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে-সকল বাসনা উঠিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন; তোমার বাসনা থাকাতে তুমি যে যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছ, সেগুলির মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর বস্ত্রের মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর অলঙ্কারেও তিনি। এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এইভাবে সকল জিনিস দেখিতে আরম্ভ করিলে তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। যদি তোমার প্রত্যেক চালচলনে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্তায়, তোমার শরীরে—আকৃতিতে, সকল জিনিসে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে তোমার চক্ষে সকল দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে এবং জগৎ দুঃখরূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।

যীশু বলিয়াছিলেন, ‘স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে’। বেদান্তও বলে, উহা পূর্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত। সকল ধর্মই এই কথা বলিয়া থাকে, সকল মহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন। ‘যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার শুনিবার কর্ণ আছে, সে শুনুক।’ আমরা যে-সত্য এতদিন অন্বেষণ করিতেছি, তাহা পূর্ব হইতেই আমাদের অন্তরে বর্তমান, আর বেদান্ত শুধু যে উহার উল্লেখমাত্র করে তাহা নহে, ইহা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত। অজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা সত্য হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং উহা পাইবার জন্য কেবল কাঁদিয়া, কষ্টে ভুগিয়া সমগ্র জগতে ঘুরিতেছিলাম, কিন্তু উহা সর্বদাই আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে বর্তমান ছিল। এই তত্ত্বদৃষ্টি-সহায়ে জগতে জীবনযাপন করিতে হইবে।

‘সংসার ত্যাগ কর’—এই উপদেশ যদি সত্য হয়, আর যদি झूल এবং प्रतीयमान অর্থে ইহা গ্রহণ করা যায়, তবে এই দাঁড়ায়—আমাদের কোন কাজ করিবার আবশ্যিকতা নাই, অলস হইয়া মাটির টিপির মতো বসিয়া থাকিলেই হইল, কিছু চিন্তা করিবার বা কোন কাজ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যিকতা নাই; অদৃষ্টবাদী হইয়া, ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেই হইল। ইহাই ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত উপদেশের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদেরকে অবশ্য কার্য করিতে হইবে। সাধারণ মানুষ, যাহারা বৃথা বাসনায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা কাজের কি জানে? যে-ব্যক্তি নিজের ভাবরাশি ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত, সে কাজের কি বুঝে? তিনিই কাজ করিতে পারেন, যিনি কোনরূপ বাসনা দ্বারা, কোনরূপ স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত নন। তিনিই কাজ করিতে পারেন, যাঁহার অন্য কোন কামনা নাই। তিনিই কাজ করিতে পারেন, যাঁহার কোন লাভের প্রত্যাশা নাই।

একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রদ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব-কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই মগ্ন। ঐ-সকল বিষয়ই তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন, যাঁহার বেচা-কেনার কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্র স্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই : তিনিই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, এবং নানা শ্লোকে নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনা-ত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। আনাচ-কানাচ, গলি-

ঘুজি, অন্ধকার স্থান-যাহা আমরা পূর্বে এত অপবিত্র ভাবিয়াছিলাম, উহাদের উপর যে-সকল দাগ এত কালো বোধ হইয়াছিল, সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে। তখন আমরা নিজেরাই নিজেদের পূর্ব আচরণের কথা ভাবিয়া হাসিয়া উঠিব-এই-সকল কান্না-চীৎকার কেবল ছেলেখেলা মাত্র, আর আমরা জননীর মতো বরাবর কাছে দাঁড়াইয়া ঐ খেলা দেখিতেছিলাম।

বেদান্ত বলে, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমরা ঠিক ঠিক কার্য করিতে সক্ষম হইব। বেদান্ত আমাদের কার্য করিতে নিষেধ করে না, তবে ইহাও বলে যে, প্রথমে ‘সংসার’ ত্যাগ করিতে হইবে, এই আপাতপ্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের অর্থ কি? পূর্বে বলা হইয়াছে, ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য-সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য করিতে সক্ষম হইবে। যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা কর, যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে ভোগ করিয়া লও, কেবল ঐ গুলিকে ব্রহ্মরূপে দর্শন কর, স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর শতবর্ষ জীবনযাপন কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্য করিয়া জীবন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্য করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যে-ব্যক্তি সত্য কি, না জানিয়া নির্বোধের ন্যায় সংসারের বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয়, বুঝিতে হইবে সে প্রকৃত পথ পায় নাই, তাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। অপরদিকে যে-ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটি শুষ্ক মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, কঠোর বীভৎস শুষ্ক হইয়া যায়, সেও পথ ভুলিয়াছে-বুঝিতে হইবে। এই দুইটি বাড়াবাড়ি-দুইটিই ভ্রম, এদিক আর ওদিক । উভয়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট-উভয়েই পথভ্রষ্ট।

বেদান্ত বলে, এইভাবে কার্য কর-সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সর্বভূতেই তিনি আছেন জানো, নিজের জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত, এমন কি ঈশ্বর-স্বরূপ চিন্তা কর-জানিয়া রাখো, ইহাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহাই আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য, কারণ ঈশ্বর

সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইবে? প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া আমাদিগকে অবশ্য কার্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ—আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্মফল আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না। কর্মফল আর আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যত কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, তাহার কারণ এই-সকল বৃথা বাসনা। কিন্তু যখন এই বাসনাগুলি ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে, ঈশ্বর-স্বরূপ হইয়া যায়, তখন উহারা আর কোন অনিষ্ট করে না। যাহারা এই রহস্য জানে নাই, তাহাদিগকে ইহা না জানা পর্যন্ত এই আসুরিক জগতে বাস করিতে হইবে। লোকে জানে না, এখানে তাহাদের চতুর্দিকে সর্বত্র কি অনন্ত আনন্দের খনি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আসুরিক জগতের অর্থ কি? বেদান্ত বলে—অজ্ঞান।

বেদান্ত বলে, আমরা বিশাল স্রোতস্বতীর তীরে বসিয়া তৃষ্ণায় মরিতেছি। রাশীকৃত খাদ্যের সম্মুখে বসিয়া আমরা ক্ষুধায় মরিতেছি। এইখানেই আনন্দময় জগৎ রহিয়াছে, আমরা উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা উহার মধ্যে রহিয়াছি, উহা সর্বদাই আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা সর্বদাই উহাকে অন্য কিছু বলিয়া ভুল করিতেছি। বিভিন্ন ধর্ম আমাদিগকে সেই আনন্দময় জগৎ দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। সকল হৃদয়ই এই আনন্দময় জগতের অন্বেষণ করিয়াছে। সকল জাতিই ইহার অন্বেষণ করিয়াছে, ইহাই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামান্য মতভেদ আছে, সেগুলি ভাষার বিভিন্নতা মাত্র—বাস্তবিক কিছু নয়। একজন একটি ভাব একরূপে প্রকাশ করিতেছে, আর একজন একটু অন্যভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়তো অন্য ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। কেহ হয়তো সুখ্যাতি-লাভের আশায় অথবা সবকিছু নিজের মনের মতো করিতে চায় বলিয়া বলে, ‘এ আমার মৌলিক মত।’ ইহা হইতেই আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের উৎপত্তি।

এ-সম্বন্ধে আবার এখন নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বলা হইল, তাহা মুখে বলা তো খুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি : সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি কর-সব ব্রহ্মময় দেখ, তবেই ঠিকঠিক এ সংসার সম্ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু যখনই সংসারক্ষেত্রে নামিয়া কয়েকটি ধাক্কা খাই, অমনি ব্রহ্মবুদ্ধি উড়িয়া যায়। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, সকল মানুষেই ঈশ্বর বিরাজমান-একজন বলবান লোক আসিয়া আমায় ধাক্কা দিল, অমনি চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলাম, চটপট উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল-মুষ্টি বদ্ধ হইল-বিচারশক্তি হারাইলাম, একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, স্মৃতিভ্রংশ হইল-সেই ব্যক্তির ভিতর ঈশ্বর না দেখিয়া শয়তান দেখিলাম। জন্মিবামাত্র উপদেশ পাইতেছি, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। সকল ধর্মই ইহা শিখাইয়াছে-সর্ববস্তুতে, সর্বপ্রাণীর ভিতরে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। নিউ টেস্টামেন্টে যীশুখ্রীষ্টও এ-বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই আমরা এই উপদেশ পড়িয়াছি, কিন্তু কাজের বেলাতেই আমাদের অসুবিধা শুরু হয়।

ঈশপ-রচিত একটি গল্পে আছে: এক বৃহৎ সুন্দর হরিণ হ্রদে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার শাবককে বলিতেছিল, ‘দেখ, আমি কেমন বলবান, আমার মাথা দেখ-কেমন চমৎকার! আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখ-কেমন দৃঢ় ও মাংসল! আমি কত শীঘ্র দৌড়াইতে পারি!’ সে এ-কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দূর হইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইল। যাই শোনা, অমতি দ্রুতপদে পলায়ন। অনেক দূরে দৌড়িয়া গিয়া আবার হাঁপাইতে হাঁপাইতে শাবকের নিকট ফিরিয়া আসিল। হরিণশাবক বলিল, ‘এইমাত্র বলিতেছিলে, তুমি খুব বলবান-তবে কুকুরের ডাকে পলাইলে কেন?’ উত্তরে হরিণ বলিল, ‘তাই তো, কুকুর ডাকিলেই আমার আর কিছু জ্ঞান থাকে না।’ আমরাও সারাজীবন এরূপ করিতেছি। আমরা দুর্বল মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি, কিন্তু কুকুর ডাকিলেই হরিণের মতো পলাইয়া যাই। তাই যদি হইল, তবে এ-সকল শিক্ষার কি প্রয়োজন? বিশেষ প্রয়োজন আছে। বুঝিয়া রাখা উচিত, একদিনে কিছু হয় না।

‘আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।’^১-আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, পরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই

আকাশ দেখিতে পায়, এমন কি, যে সামান্য কীট ভূমিতে বিচরণ করে, সেও উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু উহা আমাদের নিকট হইতে কত-কত দূরে রহিয়াছে, বলো দেখি! ইচ্ছা করিলে তো মন সর্বস্থানে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে শিখিতেই কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধেও এইরূপ। আদর্শগুলি আমাদের অনেক দূরে রহিয়াছে, আর আমরা কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। তথাপি আমরা জানি, আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যিক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ ছাড়াই জীবনের অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। যাহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি হাজারটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে তবে পঞ্চাশ হাজার ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত বেশী পারা যায়, শুনিতে হইবে; ততদিন শুনিতে হইবে—যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের প্রতি শোণিতবিন্দুতে ধ্বনিত হয়, যতদিন না উহা আমাদের শরীরের রক্তে রক্তে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদের প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। কথিত আছে যে, ‘হৃদয় পূর্ণ হইলেই মুখ কথা বলে’, সেইরূপ হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে।

১ বৃহ. উপ., ২/৪/৫; ৪/৫/৬

চিন্তাই আমাদের কর্মপ্রবৃত্তির প্রেরণাশক্তি। মনকে সর্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখো, দিনের পর দিন ঐ-সকল ভাব শুনিতে থাকো, মাসের পর মাস উহা চিন্তা করিতে থাকো। প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, এই বিফলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা মানব জীবনের সৌন্দর্য। এরূপ বিফলতা না থাকিলে জীবনটা কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্টা না থাকিত, তবে জীবন ধারণ করিবার কোন মূল্য থাকিত না। উহা না

থাকিলে জীবনে কবিত্ব কোথায় থাকিত? এই বিফলতা, এই ভ্রম থাকিলই বা; গরুকে কখন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা চিরকাল গরুই থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব বার বার বিফল হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; সহস্রবার ঐ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই মানুষের আদর্শ-উদ্দেশ্য। যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে না পারো, অন্ততঃ যাহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসো, এমন এক ব্যক্তির মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে চেষ্টা কর-তারপর আর এক ব্যক্তির মধ্যে; এইরূপে অগ্রসর হইতে পারো। আত্মার সম্মুখে তো অনন্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে,-অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলে তোমার শুভ বাসনা পূর্ণ হইবে।

‘অনেকজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদেবা আপুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্বাবতোহন্যানত্যেতি নিষ্ঠং তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥
তদেজতি তন্মৈজতি তদুরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥
যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥’ ১

—তিনি অচল, এক, মন অপেক্ষাও দ্রুত কম্পনশীল! ইন্দ্রিয়গণ পূর্বে গমন করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও অন্যান্য দ্রুত গামী পদার্থের অগ্রবর্তী। তাঁহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ভ সকলের কর্মফল বিধান করিতেছেন। তিনি সচল, তিনি স্থির; তিনি দূরে, তিনি নিকটে; তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সর্বভূত আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় কি থাকে?

সর্ব পদার্থের এই একত্ব বেদান্তের আর একটি প্রধান বিষয়। আমরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করে যে, আমাদের সমুদয় দুঃখ অজ্ঞান-প্রসূত; অজ্ঞান আর কিছুই নয়—এই বহুত্বের ধারণা—এই ধারণা যে, মানুষে মানুষে ভিন্ন, নর নারী ভিন্ন, যুবা ও শিশু ভিন্ন, জাতি হইতে জাতি পৃথক্, চন্দ্র হইতে পৃথিবী পৃথক্, সূর্য হইতে চন্দ্র পৃথক্, একটি পরমাণু হইতে আর একটি পরমাণু পৃথক্। এই পৃথক্ জ্ঞানই সকল দুঃখের কারণ। বেদান্ত বলেন, এই প্রভেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ প্রাতিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। বস্তুর অন্তস্তলে সেই একত্ব এখনও বিরাজমান। যদি ভিতরে চলিয়া যাও, তবে এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মানুষে মানুষে একত্ব, নরনারীতে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চনীচে একত্ব, ধনী-দরিদ্রে একত্ব, দেবতা-মনুষ্যে একত্ব, সকলেই এক; যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর—দেখিবে ইতর জীবজন্তু—সবই এক। যিনি এইরূপ একত্বদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পৌঁছিয়াছেন, ধর্মবিজ্ঞানে যাহাকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া থাকে। তাঁহার আর মোহ কিরূপে থাকিবে? কিসে তাঁহার মোহ জন্মাইতে পারে? তিনি সকল বস্তুর আভ্যন্তরিক সত্য জানিয়াছেন, তিনি সকল বস্তুর রহস্য জানিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর দুঃখ থাকিবে কিরূপে? তিনি আর কি বাসনা করিবেন? তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করিয়া জগতের কেন্দ্রস্বরূপ ঈশ্বরে পৌঁছিয়াছেন, তিনি সকল বস্তুর একত্ব-স্বরূপ; তিনিই অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ। সেখানে মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই। আছে কেবল পূর্ণ একত্ব—পূর্ণ আনন্দ। তখন তিনি কাহার জন্য শোক করিবেন? বাস্তবিক সেই কেন্দ্রে, সেই পরম সত্যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, কাহারও জন্য শোক করিবার নাই, কাহারও জন্য দুঃখ করিবার নাই।

১ ঈশোপনিষৎ, ৪, ৭

‘স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাতাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।।’ ১

—তিনি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জ্বল দেহশূন্য ব্রণশূন্য স্নায়ুশূন্য পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু; তিনিই চিরকাল যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন।

যাহারা এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা এই জগৎকে ব্রহ্মের ন্যায় সত্যজ্ঞান করিয়া উহার উপাসনা করে, তাহারাও অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু যাহারা চিরজীবন এই সংসারের উপাসনা করে, উহা হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।^২ যিনি এই পরমসুন্দর প্রকৃতির রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব সম্ভোগ করেন।

১ ঈশ উপ. , ৮

২ ঈশ উপ. , ৯-১২

‘হিরণ্যেন পাত্রেণ সত্যস্যাপোহিতং মুখম্।

তত্ত্বং পৃষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।

...তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি

যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।।’ ১

—হে সূর্য, হিরণ্য পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্যধর্মা আমি যাহাতে তাহা দেখিতে পারি, এই জন্য আবরণ অপসারিত কর। ...আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখিতেছি—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমিই।

১২. অপরোক্ষানুভূতি

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৯৬]

আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ্ হইতে পাঠ করিয়া শুনাইব। ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ; ইহার নাম ‘কঠোপনিষদ্’। তোমাদের অনেকে বোধ হয়, সার এডুইন আর্নল্ড-কৃত ইহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জগতের আদি কোথায়, সৃষ্টি কি ভাবে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর বহির্জগৎ হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য সন্ধান-চেষ্টা অন্তর্জগতে প্রবেশ করিল। কঠোপনিষদে এই মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে প্রশ্ন হইতেছিল, ‘কে এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিল? ইহার উৎপত্তি কি করিয়া হইল?’ ইত্যাদি। কিন্তু এখন এই প্রশ্ন আসিল, মানুষের ভিতর এমন কি বস্তু আছে, যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, যাহা তাহাকে চালাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বা মানুষের কি হয়? পূর্বে লোকে এই জড় জগৎ লইয়া ক্রমশঃ ইহার অন্তর্দেশে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল বড় জোর জগতের একজন শাসনকর্তা—একজন ব্যক্তি—একজন মনুষ্য মাত্র; হইতে পারে—মানুষের গুণরাশি অনন্ত পরিমাণে বর্ধিত করিয়া তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যতঃ তিনি একটি মনুষ্যমাত্র। এই মীমাংসা কখনই পূর্ণসত্য হইতে পারে না। খুব জোর আংশিক সত্য বলিতে পারো। আমরা মনুষ্যদৃষ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি, আর আমাদের ঈশ্বর ইহারই মানবীয় ব্যাখ্যা মাত্র।

মনে কর, একটি গরু যেন দার্শনিক ও ধর্মজ্ঞ হইল—সে জগৎকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে এই সমস্যার মীমাংসা গরুর ভাবেই করিবে, সে যে আমাদের ঈশ্বরকেই দেখিবে, তা না-ও হইতে পারে। বিড়ালেরা যদি দার্শনিক হয়, তাহারা ‘বিড়াল-জগৎ’ দেখিবে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিবে, এক বিরাট বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে।

অতএব আমরা দেখিতেছি, জগৎ সম্বন্ধে মানবীয় ধারণা সবটুকু ব্যাখ্যা করিতে পারে না, জগৎসমস্যার সমাধান করা তো দূরের কথা! জগৎ সম্বন্ধে মানুষ যে দারুণ স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ করিলে প্রচণ্ড ভ্রমে পড়িতে হইবে। বাহ্যজগৎ হইতে জগৎসম্বন্ধে যে মীমাংসা পাওয়া যায়, তাহার দোষ এই যে, আমরা যে-জগৎ দেখি, তাহা আমাদের নিজেদের জগৎমাত্র, সত্য সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু দৃষ্টি, ততটুকু মাত্র। প্রকৃত সত্য—সেই পরমার্থ বস্তু কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি, যতটুকু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। মনে কর, আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় হইল— তাহা হইলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই আর একরূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমাদের একটি চৌম্বক ইন্দ্রিয় হইল, জগতে হয়তো এমন লক্ষ লক্ষ শক্তি আছে, যাহা অনুভব করিবার জন্য আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই—তখন সেইগুলির উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমাবদ্ধ—বাস্তবিক অতি সীমাবদ্ধ, আর ঐ সীমার মধ্যেই আমাদের সমগ্র জগৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগতের মীমাংসা মাত্র। কিন্তু তাহা কখনও যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না কিন্তু মানুষ তো থামিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উচ্চ নীচ সর্বপ্রকার স্তরের সাধারণ ভূমি—সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি—বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসা কাছাকাছি হইল বলা যাইতে পারে; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে মীমাংসার সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহা সমগ্র ভাবের আংশিক অনুভূতি মাত্র।

অতএব এই সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায়—অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। অতি প্রাচীন মননশীল ব্যক্তির বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাঁহারা যতদূরে যাইতেছেন, ততই বিভেদ বাড়িতেছে, আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, ততই একত্ব বাড়িতেছে। আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হই, ততই আমরা একটি সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, আর যতই উহা ইহতে দূরে সরিয়া যাই, ততই অপরের সহিত আমাদের পার্থক্য আরম্ভ হয়। এই বাহ্যজগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেখানে সকল অস্তিত্বের একটি সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে। যত কিছু ব্যাপার আছে, এই জগৎ বড় জোর, তাহার একটি অংশ মাত্র। আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে, মনোজগতের ব্যাপার নৈতিক জগতের ব্যাপার বুদ্ধিরাজ্যের ব্যাপার—এইরূপ আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র লইয়া তাহা হইতে সমুদয় জগৎ-সমস্যার মীমাংসা করা অসম্ভব। এতএব আমাদের প্রথমতঃ কোথাও এমন একটি কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে, যেখান হইতে অন্যান্য বিভিন্ন ‘লোক’ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কেন্দ্র হইতে আমরা এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিব। ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয়। সেই কেন্দ্র কোথায়? উহা আমাদের ভিতরে—এই মানুষের ভিতর যে-মানুষ রহিয়াছেন, তিনিই সেই কেন্দ্র। ক্রমাগত অন্তরের অন্তরে যাইয়া, মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন, জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যত প্রকার অস্তিত্ব আছে, সবই আসিয়া সেই এক কেন্দ্রে মিলিত হইতেছে। এখানেই বাস্তবিক সবকিছুর একটি সাধারণ ভূমি—এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নটিই বড় দার্শনিকযুক্তি-সিদ্ধ নহে, এবং উহার মীমাংসাও বিশেষ কিছু কাজের নহে।

পূর্বে কাঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে, উহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ। অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সময়ে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে, সর্বস্ব দান করিতে হইবে। এই ব্যক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না। তিনি যজ্ঞ করিয়া খুব মান-যশ পাইবার ইচ্ছা করিতেন। এদিকে কিন্তু তিনি যেমন সব জিনিস দান করিতেছিলেন, যাহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী—তিনি কতকগুলি জরাজীর্ণ

মৃতপ্রায় বক্ষ্যা কানা খোঁড়া গাভী লইয়া সেগুলিই ব্রহ্মগণকে দান করিতেছিলেন। নচিকেতা নামে তাঁহার এক অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। পিতা ঠিক ঠিক তাঁহার ব্রত পালন করিতেছেন না, বরং উহা ভঙ্গ করিতেছেন দেখিয়া সে মর্মে মর্মে পীড়িত হইল। ভারতবর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, সন্তানেরা তাঁহাদের সম্মুখে কিছু বলিতে বা করিতে সাহস পায় না, কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অতএব সেই বালক পিতার সম্মুখীন হইয়া অতিশয় শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাঁহাকে কেবলমাত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, ‘পিতা, আপনি আমায় কাহাকে দিবেন? আপনি তো যজ্ঞে সর্বস্ব-দানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।’ পিতা অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ‘ও কি বলিতেছ বৎস! পিতা নিজ পুত্রকে দান করিবে—এ কেমন কথা?’ বালকটি দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিল; তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করিব—যমকে দিব।’ তারপর আখ্যায়িকা এইঃ

বালকটি সত্যই যমের নিকট গেল। মৃত্যুমুখে পতিত প্রথম মানব যমদেবতা হন—তিনি স্বর্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের অধিপতি হইয়াছেন। সাধু-ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা ইঁহার নিকট গিয়া অনেক দিন ধরিয়া বাস করেন। এই যম একজন অতি শুদ্ধস্বভাব সাধুপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। বালকটি যমলোকে গমন করিল। দেবতারা সময়ে সময়ে বাড়ি থাকেন না, অতএব নচিকেতাকে তিন দিন সেখানে তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম বাড়ি ফিরিলেন।

যম কহিলেন, ‘হে বিদ্বন্, তুমি পূজার যোগ্য অতিথি হইয়াও তিন দিন আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রাহ্মণ, তোমাকে প্রণাম, আমার কল্যাণ হউক! আমি গৃহে ছিলাম না বলিয়া বড় দুঃখিত। কিন্তু এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাকে আমি প্রতিদিনের জন্য একটি করিয়া তিনটি বর দিতে প্রস্তুত, তুমি বর প্রার্থনা কর।’ বালক এই প্রার্থনা করিল, ‘আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার প্রতি পিতার ক্রোধ যেন চলিয়া যায়, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আর আপনি আমাকে এস্থান হইতে বিদায় দিলে যখন পিতার নিকট যাইব, তিনি যেন আমায় চিনিতে পারেন।’ যম বলিলেন, ‘তথাস্তু’ ।

নচিকেতা দ্বিতীয় বরে স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-বিশেষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথা পাই—সেখানে সকলের জ্যোতির্ময় শরীর, সেখানে তাঁহারা পিতৃপুরুষদিগের সহিত বাস করেন। ক্রমশঃ অন্যান্য ভাব আসিল, কিন্তু এ-সকলে কিছুতেই মানুষ সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইল না। এই স্বর্গ অপেক্ষা আরও উচ্চতর কিছুর আবশ্যক। স্বর্গে বাস এই জগতে বাস হইতে বড় কিছু ভিন্ন রকমের নহে। বড় জোর একজন সুস্থকায় ধনীর জীবন যেরূপ, ইহা সেইরূপই—সন্তোষের জিনিস অপরিপূর্ণ, আর নিরোগ সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর। উহা তো এই জড়জগৎই হইল, না হয় আর একটু উঁচু স্তরের; আর আমরা পূর্বেই যখন দেখিয়াছি, এই জড়জগৎ পূর্বোক্ত সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে পারে না, তখন এই স্বর্গ হইতেই বা উহার কি মীমাংসা হইবে? অতএব যতই স্বর্গের উপর স্বর্গ কল্পনা কর না কেন, কিছুতেই সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। যদি এই জগৎ ঐ সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল, তবে এইরূপ কতকগুলি জগৎ কেমন করিয়া উহার মীমাংসা করিবে? কারণ, আমাদের মনে রাখা উচিত—স্থূল প্রপঞ্চ প্রাকৃতিক সমুদয় ব্যাপারের অতি সামান্য অংশমাত্র।

আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে দেখ না কেন, ইহাতে কতটা আমাদের চিন্তার ব্যাপার, আর কতটাই বা বাহিরের ঘটনা! কতটা তুমি কেবল অনুভব কর, আর কতটাই বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর! এই জীবন-প্রবাহ কি প্রবল বেগেই চলিতেছে—ইহার কার্যক্ষেত্রও কি বিস্তৃত—কিন্তু ইহাতে মানসিক ঘটনাবলীর তুলনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহ কতটুকু! স্বর্গবাদের ভ্রম এই যে, উহা বলে, আমাদের জীবন ও জীবনের ঘটনাবলী কেবল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই স্বর্গে, যেখানে জ্যোতির্ময় দেহ পাইবার কথা, অধিকাংশ লোকের তৃপ্তি হইল না। তথাপি এখানে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছে। বেদের প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতারা যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া মানুষকে স্বর্গে লইয়া যান। সকল ধর্ম আলোচনা করিলে নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কালে পবিত্রতা-মণ্ডিত হইয়া থাকে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভূর্জ-ত্বকে লিখিতেন, অবশেষে তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু আজও ভূর্জ-ত্ব পবিত্র

বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রায় নয় দশ সহস্র বর্ষ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কাষ্ঠ কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, সেই প্রণালী আজও বর্তমান। যজ্ঞের সময় অন্য কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করিল চলিবে না। এশিয়াবাসী আর্যগণের আর এক শাখা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এখনও তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ বৈদ্যুত্যাগ্নি রক্ষা করিতে ভালবাসে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, ইহারা পূর্বে এইভাবে অগ্নি উৎপন্ন করিত ; ক্রমে ইহারা দুইখানি কাষ্ঠ ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিল; পরে যখন অগ্নি উৎপাদন করিবার অন্যান্য উপায় শিখিল, তখনও প্রথমোক্ত উপায় গুলি তাহারা ত্যাগ করিল না; সেগুলি পবিত্র আচার হইয়া দাঁড়াইল।

হিব্রুদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাহারা পূর্বে পার্চমেন্টে লিখিত। এখন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে, কিন্তু পার্চমেন্টে লেখা তাহাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ সকল জাতি সম্বন্ধেই। এখন যে-আচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই যজ্ঞগুলিও সেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যখন মানুষ পূর্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের ধারণাসকল পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইল, কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল। সময়ে সময়ে ঐগুলির অনুষ্ঠান হইত—উহারা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত হইত। তারপর একদল লোক এই যজ্ঞকার্য নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহারাই পুরোহিত। ইহারা যজ্ঞ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন—যজ্ঞই তাঁহাদের যথাসর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের এই ধারণা তখন বদ্ধমূল হইল—দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আহ্বাণ করিতে আসেন, যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে। যদি নির্দিষ্টসংখ্যক আহুতি দেওয়া যায়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তোত্র গীত হয়, বিশেষাকৃতিবিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রস্তুত হয়, তবে দেবতারা সব করিতে পারেন, এই প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইল। নচিকেতা এই জন্যই দ্বিতীয় বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিভাবে যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপাশ্চি হইতে পারে।

তারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এখান হইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ। নচিকেতা বলিলেন, ‘কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে; কেহ বলেন, থাকে না; আপনি আমাকে এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।’

যম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার অন্য দুইটি বর পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি বলিলেন, ‘প্রাচীনকালে দেবতাদের এ বিষয়ে সংশয় ছিল। এই সূক্ষ্ম ধর্ম সুবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতা, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, এ বিষয়ে আমাকে আর অনুরোধ করিও না—আমাকে ছাড়িয়া দাও।’

নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি বলিলেন, ‘হে যমরাজ! মৃত্যু! দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর ইহা বুঝাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে! কিন্তু আমি আপনার ন্যায় এ বিষয়ের বক্তাও পাইব না, আর এই বরের তুল্য অন্য বরও নাই।’

যম বলিলেন, ‘শতায়ু পুত্র-পৌত্র, পশু-হস্তী, সুবর্ণ-অশ্ব প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীতে রাজত্ব কর এবং যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, ততদিন বাঁচিয়া থাকো। অন্য কোন বর যদি তুমি ইহার সমান মনে কর, তবে তাহা প্রার্থনা কর—অর্থ এবং দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমণ্ডলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার কাম্যবস্তুর অধিকারী করিব। পৃথিবীতে যে-সকল কাম্যবস্তু দুর্লভ, সেগুলি প্রার্থনা কর। এই রথাধিরূঢ়া গীতবাদ্যনিপুণা রমণীগণকে মানুষ লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেতা, আমার প্রদত্ত এই-সকল কামিনী তোমার সেবা করুক, কিন্তু তুমি মৃত্যু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না।’

নচিকেতা বলিলেন, ‘এ-সকল বস্তু কেবল দুদিনের জন্য—ইহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ জীবনও অনন্তকালের তুলনায় বাস্তবিক অতি অল্প। অতএব এই-সকল হস্তী অশ্ব রথ গীতবাদ্য আপনারই থাকুক। মানুষ বিভ্রম্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না। আপনাকে যখন দেখিতে হইবে—মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত, তখন কি এই ধনসম্পদ রাখিতে পারিব?

আপনি যতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদিনই আমরা জীবিত থাকিব। আমি যে-বর প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা ছাড়া আর কিছু চাহি না।’

বালকের সঙ্কল্পে সন্তুষ্ট হইয়া যম বলিলেন, ‘পরম কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) ও আপাতরম্য ভোগ (প্রেয়ঃ)-এই দুইটির উদ্দেশ্য ভিন্ন ; কিন্তু ইহারা উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে। যিনি দুইটির মধ্যে ‘শ্রেয়’কে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে আপাতরম্য ‘প্রেয়ঃ’ গ্রহণ করে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-উভয়েই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি বিচার করিয়া একটি হইতে অপরটি পৃথক্ বলিয়া জানেন। তিনি শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ অপেক্ষা বড় বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু অ-জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ দেহের সুখের জন্য ‘প্রেয়ঃ’কেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতা, তুমি আপাতরম্য বিষয়গুলির নশ্বরতা চিন্তা করিয়া সেগুলি পরিত্যাগ করিয়াছ।’ এই কথার পর নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া অবশেষে যম তাঁহাকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

এখন আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির এই সমুন্নত ধারণা পাইলাম যে, যতদিন না মানুষ ভোগবাসনা জয় করিতেছে, ততদিন তাহার হৃদয়ে সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হইবে না। যতদিন এই-সকল বৃথা বিষয়-বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে, যতদিন উহারা প্রতিমুহূর্তে আমাদের যেন বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং আমাদের প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর-এক বিন্দু রূপের, একবিন্দু আশ্বাদের, একবিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে, ততদিন আমরা যতই জ্ঞানের গরিমা করি না কেন, সত্য কিভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে?

যম বলিতেছেন, ‘যে-আত্মার সম্বন্ধে, যে-পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা চিন্তাশূন্য বালকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে, পরলোকের অস্তিত্ব নাই-এরূপ চিন্তা করিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে।’

আবার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই বিষয় শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, এ বিষয়ের বক্তাও ‘আশ্চর্য’ হইবেন, শ্রোতাও অনুরূপ হইবেন। গুরুর অদ্ভুত

শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক, শিষ্যেরও তেমনি হওয়া চাই। মনকে আবার বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করা উচিত নহে। কারণ পরমার্থতত্ত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্মই বিশ্বাসের উপর খুব জোর দেয়। আমরা অন্ধবিশ্বাস করতে শিক্ষা পাইয়াছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিস, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটিকে একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিব, ইহার পশ্চাতে একটি মহান্ সত্য আছে। যাহারা অন্ধবিশ্বাসের কথা বলে, তাহাদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য এই অপরোক্ষানুভূতি-আমরা এখন ইহার আলোচনা করিতেছি। মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্কদ্বারা কখন ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় যুক্তি ও তর্কই কতকগুলি অনুভূতির উপর স্থাপিত। এইগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্বে যে-সকল বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি বিষয়ের তুলনার প্রণালীকে যুক্তি বলে। এই সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে যুক্তি সম্ভব নয়। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেই বা তাহা না হইবে কেন?

আমরা পুনঃ পুনঃ এই মহাভ্রমে পড়িয়া থাকি, আমরা স্বীকার করিয়া লই, বহির্বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। সেখানে কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-বিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তি উপর নির্ভর করে না; প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারাই উহারা লব্ধ হয়। আবার সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিদ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন-তাহা হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদরাও তাহাই করিয়া থাকেন-সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুক্তি-বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক বিশেষতঃ বর্তমানকালে ভাবিয়া থাকে, ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই; যদি ধর্ম লাভ করিতে হয় তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে। ধর্ম কিন্তু কথোপকথনের ব্যাপার নয়-প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার

ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আর যাহা বুঝিব, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই কথা বলো না কেন, তাহা দ্বারা ধর্ম লাভ হইবে না। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা বৃথা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ যুক্তি উভয় দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখন তাহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। জগতের অস্তিত্ব আছে কি না-এই প্রশ্ন এখনও মীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদের (Realism and Idealism) তর্ক অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জানি-জগৎ রহিয়াছে এবং চলিতেছে। আমরা কেবল একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল প্রশ্ন সম্বন্ধেও তাই-আমাদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইবে। যেমন বহির্বিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত সেগুলির উপরই স্থাপিত হইবে। অবশ্য ধর্মের যে-কোন মতবাদ হউক না, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে-এই অযৌক্তিক দাবী স্বীকার করা অসম্ভব, ইহা মানুষের মন অবনত করে। যে-ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে বলে, সে নিজেকে অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় বিশ্বাস কর, তুমিও অবনত হইবে। জগতের সাধুপুরুষদের আমাদিগকে শুধু এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপলব্ধি সত্যের কথাই তাঁহারা বলিতেছেন; তাঁহারা আশ্বাস দেন যে, আমরা সত্য লাভ করিব। ঐরূপ করিলে তখনই আমরা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্বে নহে। ধর্মের মূল ভিত্তি এইখানে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিবে যাহারা ধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তাহাদের মধ্যে শতকার নিরানব্বইজনে নিজেদের মন বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টাই করে নাই। অতএব ধর্মের বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মূল্য নাই। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে, 'তোমরা, যাহারা সূর্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত'-তাহার কথার যতটুকু মূল্য, ইহাদের কথারও মূল্য ততটুকু। অতএব যাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ

করে নাই, অথচ ধর্মকে একেবারে উড়াইয়া দিতে-লোপ করিতে অগ্রসর, তাহাদের কথায় আমাদের কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্বদা মনে জাগরুক রাখা উচিত। ধর্ম লইয়া এই-সকল গণ্ডগোল, মারামারি, বিবাদ-বিসম্বাদ তখনই চলিয়া যাইবে, যখনই আমরা বুঝিব, ধর্ম-গ্রন্থ বা মন্দিরে আবদ্ধ নয় অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারাও উহার অনুভূতি সম্ভব নয়। ধর্ম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি। যিনি ঈশ্বর ও আত্মা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। প্রত্যক্ষানুভূতিশূন্য উচ্চতম ধর্মশাস্ত্রবিৎ, যিনি অনর্গল ধর্মবক্তৃত্তা করিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই। আমরা সকলেই নাস্তিক-ইহা স্বীকার করি না কেন? কেবল তর্ক বিচার করিয়া ধর্মের তত্ত্বগুলিতে সম্মতি দিলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। একজন খ্রীষ্টান বা মুসলমান অথবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর কথা ধর; খ্রীষ্টের সেই ‘শৈলোপদেশের’ কথা মনে কর; যে-কোন ব্যক্তি ঐ উপদেশ কার্যে পালন করে, সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইয়া যায়, সিদ্ধ হইয়া যায়; তথাপি লোকে বলে, পৃথিবীতে কোটি কোটি খ্রীষ্টান আছে। তুমি কি বলিতে চাও, ইহারা সকলে খ্রীষ্টান? বাস্তবিক ইহার অর্থ এই, ইহারা কোন-না-কোন সময়ে এই উপদেশানুযায়ী কার্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে। দুই কোটি লোকের ভিতর একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও বলা হয়, ত্রিশ কোটি বৈদান্তিক আছেন; যদি প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রে একজনও থাকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা সকলেই নাস্তিক, কিন্তু যে-ব্যক্তি উহা স্পষ্ট স্বীকার করে, তাহার সহিতই আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হই। সকলেই আমরা অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। ধর্ম আমাদের কাছে যেন কিছু নয়, কেবল বিচারলব্ধ কতকগুলি মতের অনুমোদন মাত্র, কেবল কথার কথা-অমুক বেশ ভাল বলিতে পারে, অমুক পারে না। কিন্তু ইহা ধর্ম নয়; ‘শব্দ-যोजना করিবার সুন্দর কৌশল, আলঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, নানাপ্রকারে শাস্ত্রের শ্লোকব্যাখ্যা-এই-সকল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের নিমিত্ত, মুক্তির জন্য নয়।’^১ যখনই আত্মা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত

হইবে, তখনই ধর্ম আরম্ভ হইবে। তখনই তুমি ধার্মিক হইবে, তখন—কেবল তখনই নৈতিক জীবনও আরম্ভ হইবে। আমরা এখন পশুদের অপেক্ষা বড় বেশী নীতি-পরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসন-ভয়েই বড় উচ্চবাচ্য করি না। যদি সমাজ আজ বলে, চুরি করিলে আর শাস্তি হইবে না, আমরা অমনি অপররের সম্পত্তি চুরি করিতে ছুটিব। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার কারণ পুলিশ। সামাজিক প্রতিপত্তি-লোপের আশঙ্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমরা পশুদের চেয়ে অতি সামান্যই উন্নত। আমরা যখন নিজ নিজ গৃহের নিভৃত কোণে বসিয়া নিজেদের ভিতরটা অনুসন্ধান করি, তখনই বুঝিতে পারি, এ-কথা কতদূর সত্য। অতএব এস, আমরা এই কপটতা ত্যাগ করি। এস, স্বীকার করি—আমরা ধার্মিক নই এবং অপরের প্রতি ঘৃণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ আর আমাদের ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতি হইলেই আমরা নীতিপরায়ণ হইবার আশা করিতে পারি।

মনে কর, তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমায় কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি নিজের অন্তরের অন্তরে কখন এ-কথা বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই দেশ দেখ নাই। অবশ্য অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্রয়োগ করিলে তুমি মুখে বলিতে পারো বটে—আমি সেই দেশ দেখি নাই; কিন্তু তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি তাহা দেখিয়াছ। বাহ্যজগৎকে তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও ঐকান্তিকভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবে, তখন কিছুই তোমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিবে না, তখনই প্রকৃত বিশ্বাস আরম্ভ হইবে। বাইবেলের কথা, ‘যাহার একসর্ষপ-পরিমাণ বিশ্বাস আছে, সে পাহাড়কে সরিয়া যাইতে বলিতে পাহাড় তাহার কথা শুনিবে’^২—একথার তাৎপর্য এই, তখন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই সত্যকে জানিতে পারিবে, কেবল বিচারপূর্বক সত্যে সম্মতি দেওয়াতে কোন লাভ নাই।

১ বিবেকচূড়ামণি, ৬০

২ St. MattHew, Ch. 17,V. 20

একমাত্র প্রশ্ন এই—প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? ইহাই বেদান্তের মূলকথা—ধর্ম সাক্ষাৎ কর, কেবল কথায় কিছু হইবে না; কিন্তু সাক্ষাৎকার বড় কঠিন। যিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে অতি গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ পুরুষ প্রত্যেক মানবহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন।^১ সাধুগণ তাঁহাকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সুখ দুঃখ উভয়েরই পারে গিয়াছেন। আমরা যাহাকে ধর্ম বলি, আমরা যাহাকে অধর্ম বলি—শুভশুভ সকল কর্ম, সৎ-অসৎ—সকলেরই পারে তিনি গিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তিনি যথার্থই সত্য দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে স্বর্গের কথা কি হইল? স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উহা দুঃখশূন্য সুখ; অর্থাৎ আমরা চাই সংসারের সব সুখ, উহার দুঃখগুলিকে কেবল বাদ দিতে চাই। অবশ্য ইহা অতি সুন্দর ধারণা বটে, ইহা স্বভাবিকভাবেই আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ ধারণাটি একেবারে আগাগোড়াই ভুল, কারণ চরম সুখ বা চরম দুঃখ বলিয়া কোন জিনিস নাই।

রোমে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন জানিলেন, তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, ‘তবে আমি কাল কি করিব?’—বলিয়াই আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ পাউণ্ড তাঁহার পক্ষে দারিদ্র, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। উহা আমার সারা জীবনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বাস্তবিক সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? উহারা ক্রমাগত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন আমার মনে হইত—কোচোয়ান হইতে পারিলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। এখন তাহা মনে হয় না। এখন তুমি কোন সুখ কে ধরিয়া থাকিবে? এইটি আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

১ কঠ উপ., ১/২/২০; শ্বেতাশ্ব উপ., ৩/২০

এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে; প্রত্যেকের সুখের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটি লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন একতাল আফিম না খাইলে সুখী হয় না। সে হয়তো ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিম-নির্মিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে-স্বর্গ বড় সবিধাজনক হইবে না। আমরা আরবী কবিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উদ্যানে পূর্ণ, সেখানে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমার জীবনের অধিকাংশ সময় আমি এমন এক দেশে বাস করিয়াছি, যেখানে অত্যন্ত অধিক জল, প্রতি বৎসর অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি জলপ্লাবনে মারা যায়। অতএব আমরা স্বর্গ নিম্নদেশে নদী-প্রবাহযুক্ত উদ্যানপূর্ণ হইলে চলিবে না; আমার স্বর্গে অল্প স্বল্প বৃষ্টি হইবে। আমাদের জীবন সম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমাদের সুখের ধারণা ক্রমাগত বদলাইতেছে। যুবক যদি স্বর্গের ধারণা করিতে যায়, তবে তাহার কল্পনায় উহা পরমাসুন্দরী স্ত্রীগণের দ্বারা পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক। সেই ব্যক্তিই আবার বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্যিকতা থাকিবে না। আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্মাতা, আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনন্ত ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে না—যাহারা বিষয়ভোগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে, তাহারাই এইরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি আমাদের চরম গতি—একটু হাসিকান্না, তারপর কুকুরের মতো মৃত্যু? যখন এই-সকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তখন তোমরা মাববজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছ, তাহা জান না। বাস্তবিক ঐহিক সুখভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই করিতেছ, কারণ তুমি জান না, প্রকৃত আনন্দ কি। বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্র আনন্দ বা সুখ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি তাহাই শিক্ষা দেয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা—উহা একটি ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে সকলে ওডিন (Odin) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে—কিয়ৎকাল পরে বন্যবরাহ-শিকার আরম্ভ হয়। পরে তাহারা নিজেরাই যুদ্ধ করে এবং পরস্পরকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলে। কিন্তু এরূপ যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতগুলি আরোগ্য হইয়া যায়—তাহারা

তখন একটি বৃহৎ কক্ষে গিয়া সেই শূকরের মাংস পোড়াইয়া ভোজন করে ও আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকে। পরদিন আবার সেই বরাহটি জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শিকারদি হইয়া থাকে। এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণাটি না হয় একটু মার্জিত। আমরা সকলেই এইরূপ ‘শূকর’ শিকার করিতে ভালবাসি-আমরা এমন এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে; প্রত্যেকের সুখের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটি লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন একতাল আফিম না খাইলে সুখী হয় না। সে হয়তো ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিম-নির্মিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে-স্বর্গ বড় সবিধাজনক হইবে না। আমরা আরবী কবিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উদ্যানে পূর্ণ, সেখানে অসংখ্য

১ কঠ উপ., ১/২/২০; শ্বেতাশ্ব উপ., ৩/২০

নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমার জীবনের অধিকাংশ সময় আমি এমন এক দেশে বাস করিয়াছি, যেখানে অত্যন্ত অধিক জল, প্রতি বৎসর অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি জলপ্লাবনে মারা যায়। অতএব আমরা স্বর্গ নিম্নদেশে নদী-প্রবাহযুক্ত উদ্যানপূর্ণ হইলে চলিবে না; আমার স্বর্গে অল্প স্বল্প বৃষ্টি হইবে। আমাদের জীবন সম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমাদের সুখের ধারণা ক্রমাগত বদলাইতেছে। যুবক যদি স্বর্গের ধারণা করিতে যায়, তবে তাহার কল্পনায় উহা পরমাসুন্দরী স্ত্রীগণের দ্বারা পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক। সেই ব্যক্তিই আবার বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্যিকতা থাকিবে না। আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্মাতা, আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনন্ত ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে না-যাহারা বিষয়ভোগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে, তাহারাই এইরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি আমাদের চরম গতি-একটু হাসিকান্না, তারপর কুকুরের মতো মৃত্যু? যখন এই-সকল

বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তখন তোমরা মাববজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছ, তাহা জান না। বাস্তবিক ঐহিক সুখভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই করিতেছ, কারণ তুমি জান না, প্রকৃত আনন্দ কি। বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্র আনন্দ বা সুখ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি তাহাই শিক্ষা দেয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা-উহা একটি ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে সকলে ওডিন (Odin) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে-কিয়ৎকাল পরে বন্যবরাহ-শিকার আরম্ভ হয়। পরে তাহারা নিজেরাই যুদ্ধ করে এবং পরস্পরকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলে। কিন্তু এরূপ যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতগুলি আরোগ্য হইয়া যায়-তাহারা তখন একটি বৃহৎ কক্ষে গিয়া সেই শূকরের মাংস পোড়াইয়া ভোজন করে ও আমোদ-প্রমোদ করিতে থাকে। পরদিন আবার সেই বরাহটি জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শিকারদি হইয়া থাকে। এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণাটি না হয় একটু মার্জিত। আমরা সকলেই এইরূপ ‘শূকর’ শিকার করিতে ভালবাসি-আমরা এমন একস্থানে যাইতে চাই, যেখানে এই ভোগ পূর্ণমাত্রায় ক্রমাগত চলিবে, যেখানে ঐ নরওয়েবাসীরা যেমন কল্পনা করে-যাহারা স্বর্গে যায়, তাহারা প্রতিদিন বন্যশূকর শিকার করিয়া উহা খাইয়া থাকে, আবার পরদিন শূকরটি পুনরায় বাঁচিয় উঠে-সেইরূপ ঘটবে।

দর্শনশাস্ত্রের মতে, নিরপেক্ষ অপরিণামী আনন্দ বলিয়া কিছু আছে, অতএব আমরা সাধারণতঃ যে ঐহিক সুখভোগ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে এ-সুখের কোন সম্বন্ধ নাই। আবার বেদান্তই প্রমাণ করে যে, এই জগতে যাহা কিছু আনন্দকর আছে, তাহা সেই প্রকৃত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ বাস্তবিক সেই ব্রহ্মানন্দেরই অস্তিত্ব আছে। আমরা প্রতিমুহূর্তেই সেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছি,কিন্তু উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া জানি না। যেখানেই দেখিবে কোনরূপ আনন্দ, এমন কি চোরের চৌর্য-কার্যে যে আনন্দ, তাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণানন্দ,কেবল উহা কতকগুলি বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে। কিন্তু সেই আনন্দ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে আমরাইগকে সমুদয় ঐহিক সুখভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। উহা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দ লাভ হইবে। প্রথমে অজ্ঞান এবং যাহা কিছু মিথ্যা তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে। যখন আমরা সত্যকে

দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একরূপ ধারণা করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সবই-সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই-ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে, তখন সবই উন্নত ভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সকল পদার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব। কিন্তু প্রথমে আমাদেরকে সে-সব ত্যাগ করিতেই হইবে; পরে সত্যের অন্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্যরূপে-ব্রহ্মাকারে পরিণতরূপে। অতএব আমাদেরকে ছোটখাটো সুখ দুঃখ-সব ত্যাগ করিতে হইবে। এগুলি একই অনুভূতির বিভিন্ন মাত্রা। ‘বেদসকল যাঁহাকে ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপস্যা যাঁহাকে পাওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে তোমাকে বলিব-তিনি ওঁ ।’^১ বেদে এই ওঁকারের অতিশয় মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষিত হইয়াছে।

১ কঠ উপ. , ১/২/১৫

যম নটিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেনঃ মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হয়?— ‘বিপশ্চিৎ’ বা অবিলুপ্তচৈতন্য আত্মা কখন মরেন না, কখন জন্মানও না; ইনি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন না; ইনি অজ নিত্য শাস্বত ও পুরাণ। দেহ নষ্ট হইলেও ইনি নষ্ট হন না।।’^১ ‘হস্তা যদি মনে করেন ,আমি কাহাকেও হনন করিতে পারি,অথবা হত ব্যক্তি যদি মনে করেন ,আমি হত হইলাম , তবে উভয়কেই সত্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুঝিতে হইবে। আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না অথবা নিজেও হত হন না।’এ তো ভয়ানক কথা দাঁড়াইল। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ ‘বিপশ্চিৎ’-শব্দটি বিশেষ-ভাবে লক্ষ কর। ক্রমশঃ দেখিবে, বেদান্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়তো উহার বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। এই মাত্র প্রভেদ। মানুষের সহিত মানুষের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন বস্তুর পার্থক্য প্রকারগত নয়, পরিমানগত। প্রত্যেকের অন্তরে অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনন্ত নিত্যানন্দময় নিত্যশুদ্ধ নিত্যপূর্ণ ব্রহ্ম। তিনিই সেই আত্মা-তিনি পুণ্যবান্ পাপী, সুখী

দুঃখী, সুন্দর কৎসিত, মনুষ্য পশু-সর্বত্র একরূপ। তিনিই জ্যোতির্ময়। তাঁহার প্রকাশের তারতম্যেই নানারূপ প্রভেদ। কাহারও ভিতর তিনি বেশী প্রকাশিত, কাহারও ভিতর অল্প; কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেদের কোন অর্থই নাই। কাহারও পোশাকর ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর এক জনের পোশাকর ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অল্পাংশ দেখা যাইতেছে—ইহাতে শরীরে কোন পার্থক্য হইতেছে না। কেবল দেহের অধিকাংশ বা অল্পাংশ আবরণকারী পরিচ্ছদেই ভেদ দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ দেহ ও মনের তারতম্য অনুসারে আত্মার শক্তি ও পবিত্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে। অতএব এখানেই বুঝিয়া রাখা ভাল যে বেদান্ত দর্শনে ভাল মন্দ বলিয়া দুইটি পৃথক্ বস্তু নাই। সেই এক জিনিষই ভাল মন্দ—দুই হইতেছে, আর উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল পরিমানগত, এবং বাস্তবিক কার্যক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। আজ যে-জিনিসকে আমি সুখকর বলিতেছি, কাল আবার একটু ভাল অবস্থা হইলে তাহা দুঃখকর বলিয়া ঘৃণা

১ কঠ উপ. , ১/২/১৮

করিব। অতএব বাস্তবিক বস্তুটির বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার জন্যই ভেদের উপলব্ধি হয়, সেই জিনিসটিতে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভাল-মন্দ বলিয়া কিছু নাই। যে-অগ্নি আমার শীতনিবারন করিতেছে, তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি অগ্নির দোষ? অতএব যদি আত্মা শুদ্ধরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে যে-ব্যক্তি অসৎকার্য করিতে যায়, সে স্বরূপের বিপরীত আচরণ করিতেছে—সে নিজ স্বরূপ জানে না। ঘাতক-ব্যক্তির ভিতরেও শুদ্ধস্বভাব আত্মা রহিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উহাকে আবৃত রাখিয়াছে মাত্র, উহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে দিতেছে না। আর যে-ব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা হত হন না। আত্মা নিত্য—কখন তাঁহার ধ্বংস হইতে পারে না। ১ ‘অণুর অণু, বৃহতেরও বৃহৎ, সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানবহৃদয়ের গভীরে অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি বিধাতার কৃপায় তাঁহাকে দেখিয়া শোক-শূন্য হন। যিনি দেহশূন্য হইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেশবিহীন হইয়াও দেশে অবস্থিতের ন্যায়, সেই অনন্ত ও সর্বব্যাপী

আত্মাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির একেবারে দুঃখশূন্য হন।’২ ‘এই আত্মাকে বক্তৃতাশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না।’ ৩

এই যে ‘বেদের দ্বারা লাভ করা যায় না,’ এ-কথা বলা ঋষিদের পক্ষে বড় সাহসের কার্য। পূর্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা চিন্তাজগতে বড় সাহসী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই থামিবার পত্র ছিলেন না। হিন্দুরা বেদকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন খ্রীষ্টানরা বাইবেলকে কখন সেরূপ ভাবে দেখে নাই। খ্রীষ্টানের ঈশ্বরবাণীর ধারণা এই, কোন মনুষ্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া উহা লিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের ধারণা জগতে যে-সকল বিভিন্ন পদার্থ রহিয়াছে, তাহার কারণ-বেদে ঐ-সকল বস্তুর নাম উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস-বেদের দ্বারাই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই বেদে আছে। যেমন জীবাত্মা অনাদি অনন্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেকটি শব্দ পবিত্র ও অনন্ত। সৃষ্টিকর্তার মনের সমুদয় ভাবই যেন এই গ্রন্থে

১ কঠ উপ. , ১/২/২০

২ ঐ ১/২/২২

৩ ঐ ১/২/২৩

প্রকাশিত। তাঁহারা এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এই কার্য নীতিসঙ্গত কেন? না, বেদ উহা বলিতেছেন। এই কার্য অন্যায় কেন? না, বেদ বলিতেছেন। বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতটা শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই ঋষিগণের সত্যানুসন্ধানে কি সাহস দেখ, তাঁহারা বলিলেন, ‘না, বারংবার বেদ পাঠ করিলেও সত্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সেই আত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার নিকটেই তিনি নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন।’১ কিন্তু ইহাতে এই এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, তাঁহার পক্ষপাতিত্বদোষ হইল। এইজন্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও এই সঙ্গে কথিত হইয়াছে। ‘যাহারা অসৎ-কর্মকারী ও যাহাদের মন শান্ত নহে, তাহারা

কখন আত্মারকে লাভ করিতে পারে না।’^২ কেবল যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, যাঁহাদের কার্য পবিত্র, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, তাঁহাদিগের নিকটেই সেই আত্মা প্রকাশিত হন।^৩

আত্মা সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে রশ্মি এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। যে-রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, যে-রথের লাগাম খুব মজবুত ও সারথির হস্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, সেই রথই বিষ্ণুর সেই পরমপদে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যে-রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত থাকে না, মনরূপ রশ্মিও দৃঢ়ভাবে সংযত থাকে না, সেই রথ অবশেষে বিনষ্ট হয়।^৪ সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মা—চক্ষু অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁহাদের মন পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান।^৫ যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, যাহার আদি অন্ত নাই, যিনি প্রকৃতির অতীত অপরিণামি, তাঁহাকে যে উপলব্ধি করে সে মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়।^৬ কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন—এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। পথ বড় দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হও, ‘উঠ, জাগো এবং যে পর্যন্ত না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারো, সে পর্যন্ত নিবৃত্ত হইও না।’^৭

১ কঠ উপ. , ১/২/২৩

২ ঐ ১/২/২৪

৩ ঐ ১/৩/৮

৪ ঐ ১/০৩/৩-৯

৫ ঐ ১/৩/১২

৬ ঐ ১/৩/১৫

৭ ঐ ১/৩/১৪

এখন দেখিতেছি, সমগ্র উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই ‘অপরোক্ষানুভূতি’। এই বিষয়ে সময়ে সময়ে মনে নানা প্রশ্ন উঠিবে—বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের মনে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিবে— আরও নানা সন্দেহ উঠিবে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে দেখিব, আমরা আমাদের পূর্ব-সংস্কারের দ্বারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্ব সংস্কারের প্রভাব খুব বেশী। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের এবং মনের ব্যক্তিত্বের কথা শুনিতেছ, তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত কথাগুলি অবশ্য কৰ্কশ লাগিবে, কিন্তু যদি আমরা ঐগুলি শ্রবণ করি, আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করি, তবে সেগুলি আমাদের প্রাণে গাঁথিয়া যাইবে, আমরা আর ভয় পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্য দর্শনের উপকারিতা— কার্যকারিতা সম্বন্ধে। উহার কেবল একই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি প্রয়োজন-বাদীদের মতে সুখের অন্বেষণ করা মানুষের কর্তব্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় যাহাদের সুখ, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় সুখ অন্বেষণ করিবে? অনেকে বিষয়ভোগে সুখী হয় বলিয়া বিষয়-সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু আবার এমন লোক থাকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর ভোগের অন্বেষণ করে। কুকুর সুখী কেবল আহারে ও পানে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কয়েকটি তারার অবস্থান জানিবার জন্য হয়তো কোন পর্বতচূড়ায় বাস করিতেছেন; তিনি যে অপূর্ব সুখের আনন্দ লাভ করিতেছেন, কুকুর তাহা বুঝিতে অক্ষম। কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিবে, তাঁহাকে পাগল মনে করিবে। হয়তো বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ পর্যন্ত করিবার সঙ্গতি নাই। তিনি হয়তো কয়েকটুকরা রুটি ও একটু জল খাইয়াই পর্বতচূড়ায় বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিলেন, ‘ভাই কুকুর, তোমার সুখ কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ; তুমি ঐ সুখ ভোগ করিতেছ; উহা হইতে উচ্চতর সুখ তুমি কিছুই জান না; কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা সুখকর। আর তোমার যদি নিজের ভাবে সুখ-অন্বেষণ করিবার অধিকার থাকে, তবে আমারও আছে।’ এইটুকু আমাদের ভ্রম হয় যে, আমরা সমগ্র জগৎকে নিজের ভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমরা আমাদের মনকেই সমগ্র জগতের মাপকাঠি করিতে চাই। তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ, কিন্তু আমার সুখও যে ঐ ভাবেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন তুমি ঐ বিষয় লইয়া জেদ কর, তখন তোমার সহিত আমার

এক অঙ্গ হইতে তাড়াইয়া দিলে বাত পায়ে যাইবে, পা হইতে তাড়াইয়া দিলে অন্যত্র যাইবে। যাহা কিছু কর না কেন, উহা কোনমতে দূর হইবে না, কোথাও না কোথাও থাকিবেই। দুঃখও সেইরূপ। অতি প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়া খাইয়া ফেলিত। বর্তমান-কালে পরস্পরের মাংস খায় না বটে, কিন্তু পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। লোকে প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। অবশ্য ইহা খুব উন্নতির পরিচায়ক নহে। আর তোমরা যাহাকে উন্নতি বলো, তাহাও তো আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না—উহা তো বাসনারই ক্রমাগত বৃদ্ধি। যদি আমি কোন বিষয় অতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা এই যে, বাসনা কেবল দুঃখই আনে—উহা তো ভিক্ষুকের অবস্থা। সর্বদা কিছু চাওয়া—কোন দোকানে গিয়া কিছু দেখিয়া তৃপ্তি হইতে পারে না—অমনি কিছু পাইবার ইচ্ছা হয়, কেবল চাই—চাই—সব জিনিস চাই। সমগ্র জীবন কেবল তৃষ্ণাতুর যাচকের অবস্থা—বাসনার দূরপন্থায় তৃষ্ণা। বাসনা পূরণ করিবার শক্তি যে-নিয়মে বর্ধিত হয়, বাসনার শক্তি তদপেক্ষা বহুগুণ বেগে বর্ধিত হইয়া থাকে। অনন্ত জগতের সমুদয় সুখদুঃখের সমষ্টি সর্বদাই সমান। সমুদ্রে কোথাও যদি একটি তরঙ্গ উত্থিত হয়, আর কোথাও নিশ্চয়ই একটি গহ্বর উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মানুষের সুখ উৎপন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই অন্য কোন মানুষের অথবা কোন জীবজন্তুর দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে—পশুর সংখ্যা কমিতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি কাড়িয়া লইতেছে; আমরা তাহাদের সমুদয় খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছি। তবে কেমন করিয়া বলিব—সুখ ক্রমাগত বাড়িতেছে? প্রবল জাতি দুর্বল জাতিকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু তোমরা কি মনে কর, প্রবল জাতি বেশী সুখী হইবে? না, তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার করিবে। কিভাবে সুখের যুগ আসিবে, তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না। এ তো প্রত্যক্ষের বিষয়। আনুমানিক বিচার দ্বারাও আমি দেখিতে পাই, ইহা কখনও হইবার নয়।

পূর্ণতা সর্বদাই অনন্ত। আমরা বাস্তবিক সেই অনন্তস্বরূপ—সেই নিজস্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। তুমি, আমি—সকলেই সেই নিজ নিজ অনন্ত স্বরূপ অভিব্যক্তি করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ পর্যন্ত বেশ কথা, কিন্তু ইহা হইতে কয়েকজন

জার্মান দার্শনিক বড় এক অদ্ভুত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা এই যে, এইরূপে অনন্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমরা পূর্ণ ব্যক্ত হই, যতদিন না আমরা সকলে পূর্ণমানব হইতে পারি। পূর্ণ অভিব্যক্তির অর্থ কি? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ সীমা—অতএব ইহার এই তাৎপর্য দাঁড়াইল যে, আমরা অসীমভাবে সসীম হইব—এ-কথা তো অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। শিশুগণ এ মতে সন্তুষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে মিথ্যা বিষয়ে জর্জরিত করা হয়—ধর্মের পক্ষে ইহা মহা অনিষ্টকর। আমাদের জানা উচিত, জগৎ এবং মানব—ঈশ্বরের অবনত ভাবমাত্র; তোমাদের বাইবেলেও আছে—আদম প্রথমে পূর্ণমানব ছিলেন, পরে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্মই নাই, যাহা শিক্ষা দেয় না যে, মানুষ পূর্বাবস্থা হইতে হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। আমরা পশু হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমরা আবার উন্নতির পথে যাইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমরা কখনও অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু দেখিব—ইহা অসম্ভব। এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিব যে, যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব; তখন আমরা যে-দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই দিক হইতে ফিরিয়া মূল অবস্থা—অনন্তের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব।

ইহারই নাম ত্যাগ। আমরা যে-জালের ভিতর পড়িয়াছি, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে—তখনই নীতি ও দয়াধর্ম আরম্ভ হইবে। সমুদয় নৈতিক অনুশাসনের মূলমন্ত্র কি? ‘নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।’ আমাদের পশ্চাতে যে অনন্ত রহিয়াছেন, তিনি নিজেকে বহির্জগতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই ‘অহং’-এর আকার ধারণ করিয়াছেন। সেই অনন্ত হইতেই এই ক্ষুদ্র আমি-তুমির উৎপত্তি। অভিব্যক্তির চেষ্টায় ইহার উৎপত্তি—এখন এই ‘আমি’কে আবার পিছু হঠিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ অনন্তে মিশিতে হইবে। তিনি বুঝিবেন, এতদিন তিনি বৃথা চেষ্টা করিতে- ছিলেন; নিজেকে চক্রে ফেলিয়াছেন—তঁাহাকে ঐ চক্র হইতে বাহির হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। যতবার তুমি বলো—‘নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু,’ ততবারই ফিরিবার চেষ্টা কর, আর যতবার তুমি

অনন্তকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর, ততবারই তোমাকে বলিতে হয়—‘আমি’ আমি; তুমি নও।’ ইহা হইতে জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ ও অনিশ্চয়ের উৎপত্তি, কিন্তু অবশেষে ত্যাগ—অনন্ত ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হইবে। ‘আমি, মরিয়া যাইবে। আমার জীবনের জন্য তখন কে যত্ন করিবে? এখানে থাকিয়া এই জীবন সম্ভোগ করিবার যে-সব বৃথা বাসনা, আবার তারপর স্বর্গে গিয়া এইরূপভাবে থাকিবার বাসনা—সর্বদা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত থাকিবার বাসনাই মৃত্যু আনয়ন করে।

আমরা যদি পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে-বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থামাত্র। তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাহা নয়? তোমরা দেখিয়াছ, ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল এইঃ নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সকল দেহই পরস্পর সদৃশ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর প্রাণী জন্মিয়াছে এবং উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর জন্মে নাই? দুদিকেই যুক্তি সমান—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে যাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন হইতেছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিভাবে সত্য হইতে পার? যাহা হউক, আমি যে-কথা বলিতেছিলাম যে, মানুষের ক্রমাগত অনন্ত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা বেশ বুঝা গেল।

‘অনন্ত’—জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে ইহা যদি আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা বুঝিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমরা ক্রমাগত সরলরেখায় উন্নতি করিয়া চলিতেছি, এ-কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি তুমি তোমার সম্মুখদিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে, যখন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনন্তরূপে বর্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে? অবশ্য ইহা এইরূপই হইবে, তবে হয়তো পথে ঘুরিবার সময় একটু এদিক ওদিক হইতে পারে। এই কারণে আমি সর্বদা পুরাতন ভাবকেই ধরিয়া থাকি। যখন দেখি—কি

খ্রীষ্ট, কি বুদ্ধ, কি বেদান্ত, কি বাইবেল সকলেই বলিতেছেনঃ এই অপূর্ণ জগৎকে ত্যাগ করিয়াই কালে আমরা পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগৎ কিছুই নয়। খুব জোর, উহা সেই সত্যের একটি ভয়ানক বিসদৃশ অনুকৃতি-ছায়ামাত্র। সকল জ্ঞানহীন ব্যক্তিই এই ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য দৌড়াইতেছে।

ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ-আমাদের পুরাতন অভ্যাসের বশবর্তী থাকিয়া কেবল পানাহারে মত্ত থাকা। কিন্তু আমাদের আধুনিক দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন, এই-সকল সুখকর ভাব লইয়া তাহার উপর ধর্মের ছাপ দিতে। কিন্তু ঐ মত সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ের মৃত্যু আছে -আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত হইতে হইবে। মৃত্যু কখনই সত্য নহে। ত্যাগই আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাইবে। নীতির অর্থই ত্যাগ। আমাদের প্রকৃত জীবনের ভিত্তিই ত্যাগ। আমার জীবনের সেই সেই মুহূর্তেই বাস্তবিক সাধু-ভাবাপন্ন হই এবং প্রকৃত জীবন যাপন করি, যে যে মুহূর্তে আমরা ‘আমি’র চিন্তা হইতে বিরত হই। ‘আমি’র যখন বিনাশ হয়-আমাদের ভিতরের ‘পুরাতন মানুষ’-ক্ষুদ্র আমিত্বের মৃত্যু হয়, তখনই আমরা সত্যে উপনীত হই। আর বেদান্ত বলেন-সেই সত্যই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ-তিনি সর্বদাই আমাদের সহিত আছেন, শুধু তাহাই নহে, আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন। তাঁহাতেই আমরা সর্বদা বাস করিব। যদিও ইহা বড় কঠিন বোধ হয়, তথাপি ক্রমশঃ ইহা সহজ হইয়া আসিবে। তখন আমরা দেখিব, তাঁহাতে অবস্থানই একমাত্র আনন্দপূর্ণ অবস্থা-আর সকল অবস্থাই মৃত্যু। আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন-আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র। আমাদের বর্তমান জীবনকে কেবল শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় বলিতে পারা যায়। প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে।

১৩. আত্মার মুক্তস্বভাব

[লণ্ডনে প্রদত্ত-৫ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমরা পূর্বে যে কঠোপনিষদের আলোচনা করিতেছিলাম তাহা এখন যাহার আলোচনা করিব, সেই ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিন্তাপ্রণালীও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রণালীবদ্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদগুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন-অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মতো। আবার উহাদের মধ্যে-অনেক সময় অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদটিতে বেদের কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট প্রভাব আছে-এই কারণে ইহার অর্ধাংশের বেশী এখনও কর্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদগুলি পাঠ করিলে একটি পরম লাভ হইয়া থাকে। লাভ এই যে, ঐগুলি অধ্যয়ন করিলে আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের ঐতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদগুলিতে আধ্যাত্মিক ভাবগুলি একত্র সংগৃহীত ও সজ্জিত-উদাহরণস্বরূপ আমরা ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিতে পারি। এই ভগবদ্গীতাকে সর্বশেষ উপনিষদ্ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, উহাতে কর্মকাণ্ডের লেশমাত্র নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন নাকোন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত-যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটি তোড়া নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে তুমি ঐ-সকল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইবে না।

এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধাই অনেকে বেদপাঠের একটি বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা সত্য কথা; কারণ বেদকে লোকে এত পবিত্র চক্ষে দেখে যে, জগতের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের ভিতর যেমন নানাবিধ গোঁজামিল আছে, বেদে তাহা নাই। বেদে অতি উচ্চ চিন্তা, আবার অতি নিম্ন চিন্তার সমাবেশ-সার, অসার, অতি উন্নত চিন্তা, আবার সামান্য খুঁটিনাটি-সবই সন্নিবেশিত আছে, কেহই উহার কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্য টীকাকারেরা আসিয়া ব্যাখ্যার

বলে অতি প্রাচীন বিষয়সমূহ হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন ভাব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে তাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মূল যেমন তেমনই রহিয়া গেল—এই মূলের ভিতর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। আমরা জানি, লোকের চিন্তাশক্তি যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহারা প্রত্যেকটি ধর্মের পূর্বভাব পরিবর্তিত করিয়া তাহাতে নূতন নূতন উচ্চ ভাবের সংযোজন করিতে থাকে। এখানে একটি, ওখানে একটি নূতন কথা বসানো হয়—কোথাও বা এক-আধটি কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়—তারপর টিকাকারে তা তো আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কখন করা হয় নাই—আর যদি হইয়া থাকে, তাহা ধরাই যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই যে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তিস্থলে যাইতে পারি—দেখিতে পাই, কি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্থূল আধিভৌতিক ধারণা হইতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক ধারণাগুলির বিকাশ হইতেছে—অবশেষে কিভাবে বেদান্তে ঐগুলি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে অনেক প্রাচীন আচার-ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায়, তবে উপনিষদে ঐ-সকল বর্ণনা বড় বেশী নাই। উহা এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের লেখকগণ যেন কেবল কতকগুলি ঘটনা মনে রাখিবার উপায়-স্বরূপ লিখিতেছেন; তাঁহাদের যেন ধারণা—এ-সকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুশকিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার কারণ এই—ঐগুলি যাঁহাদের সময়ে লেখা, তাঁহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এখন সেগুলির কিংবদন্তী পর্যন্ত নাই—আর সামান্য যেটুকু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। ঐগুলির এত নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে ঐ-সকলের বিবরণ পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই সেগুলি উচ্ছ্বাসাত্মক কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলির রাজনীতিক উন্নতির বিষয়ে আমরা একটি বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি যে, তাহারা কোনপ্রকার স্বেচ্ছাতন্ত্র বা একনায়কত্ব সহ্য করিতে পারে না; সর্বপ্রকার

বন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রাম করিয়া তাহারা ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, বাহ্য স্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে; ভারতেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তবে দর্শন ও আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে—এইমাত্র প্রভেদ। বহুদেববাদ হইতে ক্রমশঃ মানুষ একেশ্বরবাদে উপনীত হয়—উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছে। জগতের অনেক শাসনকর্তা তাঁহাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, শুধু এই ধারণাই তাঁহাদের অসহ্য হইল তাহা নহে, একজন তাঁহাদের অদৃষ্টের বিধাতা হইবেন, এ ধারণাও তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। উপনিষদ্ আলোচনা করিতে গিয়া এইটিই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ধারণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে চরম পরিনতি লাভ করিয়াছে। প্রায় সকল উপনিষদের শেষেই দেখিতে পাই—জগতের ‘একেশ্বর’ সিংহাসনচ্যুত!

ঈশ্বরের সগুণ ধারণা দূর হইয়া নির্গুণ ধারণা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর আর জগতের শাসনকর্তা একজন ব্যক্তি নন, তিনি আর অনন্তগুণসম্পন্ন মনুষ্যধর্মবিশিষ্ট কেহ নন, তিনি তখন ভাব-মাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূপে জ্ঞাত হন—আমাদের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদয় জগতে সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্য যখন ঈশ্বরের সগুণ ধারণা হইতে নির্গুণ ধারণায় পৌঁছানো গেল, তখন মানুষও আর সগুণ থাকিতে পারে না। অতএব মানুষের সগুণত্বও তিরোহিত হইল, মানুষেরও একটি ভাবরূপ গড়িয়া উঠিল। সগুণ ব্যক্তি বাহিরে দৃশ্যমান, প্রকৃত তত্ত্ব অন্তরে। এইরূপে উভয় দিক হইতেই ক্রমশঃ সগুণভাব চলিয়া যাইতে থাকে এবং নির্গুণ ভাবের আবির্ভাব হয়। সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ নির্গুনের কাছে আসিতে থাকেন; এবং সগুণ মানুষও নির্গুণ মানুষভাবের কাছে আসিতে থাকে; তারপর নির্গুণ মানুষভাব ও নির্গুণ ঈশ্বর-ভাব ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কয়েকটি স্তরের অনুভূতির পর মিলিত হয়। আর এই দুইটি ধারা যে-যে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মিলিত হয়, উপনিষদ্ তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উপনিষদের শেষ বাণী—‘তত্ত্বমসি’। একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই আছেন, এবং সেই পরমতত্ত্বই এই জগৎরূপে—বহুভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।

এইবার দার্শনিকেরা আসিলেন। উপনিষদের কার্য এইখানেই ফুরাইল—দার্শনিকেরা তাহার পর অন্যান্য প্রশ্ন লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। উপনিষদে মুখ্য কথাগুলি পাওয়া গেল—বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিচার দার্শনিকদিগের জন্য রহিল। স্বভাবতই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদ্ভূত হয়। যদিই স্বীকার করা যায়, এক নির্গুণভাবেই পরিদৃশ্যমান নানারূপে প্রকাশপাইতেছে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাস্য—‘এক’ কেন ‘বহু’ হইল? এ সেই প্রাচীন প্রশ্ন—যাহা মানুষের অমার্জিত বুদ্ধিতে স্থূলভাবে উদ্ভূত হয়ঃ জগতে দুঃখ—অশুভ রহিয়াছে কেন? সেই প্রশ্নটিই স্থূলভাবে পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন আর আমাদের বাহ্যদৃষ্টি বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছে না, এখন ভিতর হইতে—দার্শনিক দৃষ্টিতে ঐ প্রশ্নের বিচার। সেই এক তত্ত্ব কেন বহু হইল? আর উহার উত্তর—শ্রেষ্ঠ উত্তরভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর—মায়াবাদ; বাস্তবিক সেই এক তত্ত্ব বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই এই বহুত্ব আপাত-প্রতীয়মান মাত্র, মানুষ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্গুণ। ঈশ্বরও আপাততঃ সগুণ বা ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, বাস্তবিক তিনি এই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত নির্গুণ পুরুষ।

এই উত্তরও একেবারে আসে নাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান আছে। এই উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আছে। মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের সম্মত নয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এ মত স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদীরা আছেন—তাঁহাদের মত দ্বৈতবাদ, অবশ্য তাঁহাদের ঐ মত বড় উন্নত বা মার্জিত নয়। তাঁহারা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন না—ঐ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে তাঁহারা উহাকে চাপিয়া দেন। তাঁহারা বলেন : তোমার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই—কেন এরূপ হইল, ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার অধিকার নাই। উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা—শান্তভাবে আমাদিগকে উহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। জীবাত্মার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। সবই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট—আমরা কি করিব, আমাদের কি কি অধিকার, কি কি সুখ-দুঃখ ভোগ করিব—সবই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট আছে; আমাদের কর্তব্য—ধীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়া যাওয়া। যদি তাহা না করি, আমরা আরও বেশী

কষ্ট পাইব। কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে?—বেদ বলিতেছেন। তাঁহারাও বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেন; তাঁহাদের মতানুযায়ী বেদের অর্থও আছে; প্রমাণ বলিয়া তাঁহারা সেইগুলিই সকলকে মানিতে বলেন এবং তদনুসারে উপদেশ দেন।

আরও অনেক দার্শনিক আছেন, তাঁহারা মায়াবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের মত মায়াবাদী ও দ্বৈতবাদিগণের মাঝামাঝি। তাঁহারা পরিণাম-বাদী। তাঁহারা বলেন : সমুদয় জগৎ যেন ভগবানের শরীর। ঈশ্বর সমগ্র প্রকৃতির ও সকল আত্মার আত্মা। সৃষ্টির অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপের বিকাশ—কিছুকাল এই বিকাশ চলিয়া আবার সঙ্কোচ হইতে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মার পক্ষে এই সঙ্কোচের কারণ অসৎকর্ম। মানুষ অসৎকার্য করিলে তাহার আত্মার শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—যতদিন না সে আবার সৎকর্ম করিতে আরম্ভ করে, তখন আবার উহার বিকাশ হইতে থাকে। ভারতীয় এই-সকল বিভিন্ন মতের ভিতর—এবং আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগতের সকল মতের ভিতরই—একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আমি উহাকে ‘মানুষের দেবত্ব’ বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে এমন কোন মত নাই, এমন কোন যথার্থ ধর্ম নাই, যাহা কোন-না-কোনরূপে—পৌরাণিক বা রূপকভাবে হউক অথবা দর্শনের মার্জিত সুস্পষ্ট ভাষায় হউক, এই ভাব প্রকাশ না করে যে, জীবাত্মা যেই হউক অথবা ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উহা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ। জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ আনন্দ ও শক্তি—দুঃখ ও দুর্বলতা নয়। এই দুঃখ কোনরূপে তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অমার্জিত মতগুলি এই দুঃখকে মূর্তিমান্ অশুভ, শয়তান বা আহুমান বলিয়া কল্পনা ও ব্যাখ্যা করে পারে। অন্যান্য মত একাধারে ঈশ্বর ও শয়তান দুইয়ের ভাব আরোপ করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাকেও সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী করিতেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ‘মায়াবাদ’ প্রভৃতি দ্বারা উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় সকল মতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—উহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়—আত্মার মুক্তস্বভাব। এই-সকল দার্শনিক মত ও প্রণালী কেবল মনের ব্যায়াম—বুদ্ধির চালনামাত্র। একটি মহৎ উজ্জ্বল ধারণা—যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা সকল দেশের ও সকল ধর্মের

কুসংস্কাররাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের স্বভাব—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত বলেন, অন্য যাহা কিছু তাহা উপাধি মাত্র। কিছু যেন তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেবভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতি সাধু প্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিত ব্যক্তিতেও তেমনি উহা বর্তমান। ঐ দেবস্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবেই উহার কার্য হইতে থাকিবে। আমাদের ঐ দেবভাবকে আহ্বান করিতে হইবে, তবেই উহা নিজে নিজেই প্রকাশিত হইবে। প্রাচীনেরা ভাবিতেন, চকমকি-পাথরে আগুন ঘুমাইয়া থাকে, সেই আগুনকে বাহির করিতে হইলে কেবল ইস্পাতের ঘর্ষণ আবশ্যিক। আগ্নি দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে বাস করে, উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য কেবল ঘর্ষণ আবশ্যিক। অতএব এই অগ্নি—এই স্বাভাবিক মুক্তভাব ও পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার স্বভাব, আত্মার গুণ নহে; কারণ গুণ উপার্জন করা যাইতে পারে, সুতরাং উহা আবার নষ্টও হইতে পারে। মুক্তি বা মুক্তস্বভাব বলিতে যাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুঝায়—এইরূপ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার স্বরূপ—আত্মার সহিত অভেদ। এই সৎ-চিৎ- আনন্দ আত্মার স্বভাব—আমাদের জন্মগত অধিকার; আমরা যে-সকল অভিব্যক্তি দেখিতেছি, সেগুলি আত্মার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—উহা কখন নিজেকে মৃদু, কখন বা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিতেছে। এমন কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্রকৃত সত্তার প্রকাশমাত্র। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি—সকলই সেই এক অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এইরূপ আমাদের সাধারণ জ্ঞানও—উহা বিদ্যা বা অবিদ্যা যেরূপেই প্রকাশিত হউক না, সেই চিৎ-এর—জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ মাত্র; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা তোমার পায়ের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞান এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। এই কারণে বৈদান্তিক মনীষিগণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের জীবনে আমরা যে-সকল সুখভোগ করি, এমন কি অতি ঘৃণিত সুখ পর্যন্ত আত্মার স্বরূপ সেই এক ব্রহ্মানন্দের প্রকাশমাত্র।

এই ভাবটিই বেদান্তের সর্বপ্রধান ভাব বলিয়া বোধ হয়; আর আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয়, সকল ধর্মেরই এই মত। আমি এমন কোন ধর্মের কথা জানি না, যাহার মূলে এই ভাব নাই। সকল ধর্মের ভিতরেই এই সার্বভৌম ভাব রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বাইবেলের কথা ধর—উহাতে রূপকভাবে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব আদম অতি পবিত্র ছিলেন, অবশেষে পাপকার্যের দ্বারা তাঁহার ঐ পবিত্রতা নষ্ট হইল। এই রূপক-বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয়, ঐ গ্রন্থলেখক বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানবের—অথবা তাঁহারা উহা যে ভাবেই বর্ণনা করুন না কেন—অথবা প্রকৃত মানবের স্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে-সকল দুর্বলতা দেখিতেছি, আমরা যে-সকল অপবিত্রতা দেখিতেছি, সেগুলি উহার উপর আরোপিত আবরণ বা উপাধিমাাত্র এবং খৃষ্টধর্মেরই পরবর্তী ইতিহাস ইহা দেখাইতেছে—খৃষ্টানরা সেই পূর্ব অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সম্ভাবনায়, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেন। পুরাতন ও নূতন টেস্টামেন্ট লইয়া সমগ্র বাইবেলেরও এই ইতিহাস। মুসলমানদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারাও আদম ও আদমের জনের পবিত্রতায় বিশ্বাসী, আর তাঁহাদের ধারণা—মহম্মদের আগমনের পর হইতে সেই লুপ্ত পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাহাই; তাঁহারাও নির্বাণনামক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী; উহা এই দ্বৈতজগতের অতীত অবস্থা। বৈদান্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, ঐ নির্বান অবস্থাও ঠিক তাই; আর বৌদ্ধদের সমুদয় উপদেশের মর্ম এই—সেই বিনষ্ট নির্বান-অবস্থা পুনরায় লাভ করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সকল ধর্মেরই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে—যাহা তোমার নয়, তাহা তুমি কখন পাইতে পার না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি ঋণী নও। তুমি তোমার নিজের জন্মগত অধিকারই প্রার্থনা করিবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য এই ভাবটি তাঁহার নিজকৃত কোন গ্রন্থের নামপ্রদানচ্ছলে বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম ‘স্বারাজ্যসিদ্ধি’ অর্থাৎ আমার নিজের রাজ্য, যাহা হারাইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি। সেই রাজ্য আমাদের; আমরা উহা হারাইয়াছি, আমরাদিগকে পুনরায় উহা লাভ করতে হইবে। তবে মায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ একটি ভ্রমমাত্র, তুমি কখনও রাজ্যভ্রষ্ট হও নাই—এই মাত্র প্রভেদ।

যদিও সকল ধর্মপ্রণালীই এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের যে রাজ্য ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তথাপি তাঁহারা উহা ফিরিয়া পাইবার উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা-অর্চনা করিলে এবং নিজে কোন বিশেষ নিয়মে জীবনযাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, ‘প্রকৃতির অতীত কোন পুরুষের সম্মুখে তুমি যদি পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।’ আবার কেহ কেহ বলেন, ‘তুমি যদি ঐরূপ পুরুষকে সর্বান্তকরণে ভালবাসিতে পারো, তবে তুমি ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।’ উপনিষদে এ বিভিন্ন রকমের উপদেশই পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোমাদিগকে উপনিষদ্ বুঝাইব, ততই ইহা বুঝিতে থাকিবে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ শেষ উপদেশ এই : রোদনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমাদের এই-সকল ক্রিয়াকলাপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কি করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমাদের কিছুমাত্র আবশ্যিকতা নাই, কারণ তোমাদের রাজ্য কখন নষ্ট হয় নাই। যাহা তোমরা কখনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্য আবার চেষ্টা করিবে কি? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমরা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব। যদি তোমরা নিজদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পারো, তোমরা এই মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবে; আর যদি নিজেদের বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা কর, তবে বদ্ধই থাকিবে। শুধু তাহাই নহে; এইবার যাহা বলিব, তাহা আমাকে অতি সাহসের সহিত বলিতে হইবে—এই-সকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বেই তোমাদিগকে সে-কথা বলিয়াছি। ইহা শুনিয়া তোমাদের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা যতই চিন্তা করিবে এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে, ততই দেখিবে আমার কথা সত্য কিনা। মনে কর, মুক্ত ভাব তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়; তবে তোমরা কোনরূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর, তোমরা মুক্ত ছিলে, এখন কোনরূপে সেই মুক্তভাব হারাইয়া বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতে মুক্ত ছিলে না। যদি মুক্ত ছিলে, তবে কিসে তোমায় বদ্ধ করিল? যে স্বতন্ত্র, সে কখন পরতন্ত্র হইতে পারে না; যদি হয়, তবে প্রমাণিত হইল, সে কখন স্বতন্ত্র ছিল না—এই স্বাতন্ত্র-প্রতীতিই ভ্রম ছিল।

তাহা হইলে এই দুই পক্ষের কোনটি গ্রহণ করিবে? উভয় পক্ষের যুক্তিপরম্পরা বিবৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়: যদি বলো, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্তস্বরূপ ও মুক্ত, তবে অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু যদি জগতে এমন কিছু থাকে, যাহা আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে আত্মা মুক্তস্বভাব ছিলেন না, সুতরাং তুমি যে আত্মাকে মুক্তস্বভাব বলিয়াছিলে, তাহা তোমার ভ্রমমাত্র। অতএব অবশ্যই তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতই মুক্ত। অন্যরূপ হইতে পারে না। মুক্তস্বভাবের অর্থ—বাহ্য সকল বস্তুর অধীনতা হইতে মুক্ত। অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কারণরূপে কোন কার্য করিতে পারে না। আত্মা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, ইহা হইতেই আত্মা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণা আসিয়া থাকে। আত্মার অমরত্বের কোন ধারণা স্থাপন করা যাইতে পারে না, যদি না স্বীকার করা যায় যে, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই আত্মার উপর কার্য করিতে পারে না। কারণ মৃত্যু আমার বহিঃস্থঃ কোন কিছু র দ্বারা কৃত কার্য। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, আমার শরীরে উপর বহিঃস্থ অপর কিছু কার্য করিতে পারে; আমি খানিকটা বিষ খাইলাম, তাহাতে আমার মৃত্যু হইল—ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার শরীরের উপর বিষনামক বহিঃস্থ কোন বস্তু কার্য করিতে পাতে। যদি আত্মা সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে আত্মাও বদ্ধ। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় যে, আত্মা মুক্ত-স্বভাব, তবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কার্য করিতে পারে না, কখনও পারিবে না। তাহা হইলে আত্মা কখনও মরিবেন না, আত্মা কার্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত। আত্মার মুক্তভাব, অমরত্ব এবং আনন্দ সকলই এই ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে যে আত্মা কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত, মায়ার অতীত। ভাল কথা; যদি বলো, আত্মার স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এখন বদ্ধ হইয়াছে; তাহাতে ইহাই বোধ হয়, বাস্তবিক উহা মুক্তস্বভাব ছিল না। তুমি যে বলিতেছ, উহা মুক্তস্বভাব ছিল, তাহা অসত্য। কিন্তু অপর পক্ষে পাইতেছি, আমরা বাস্তবিক মুক্তস্বভাব; এই যে বদ্ধ হইয়াছি বোধ হইতেছে, ইহাই ভ্রান্তিমাাত্র। এই দুই পক্ষের কোন পক্ষ লইব? হয় বলিতে হইবে—প্রথমটি ভ্রান্তি, নতুবা দ্বিতীয়টিকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি অবশ্য দ্বিতীয়টিকে ভ্রান্তি বলিব।

ইহাই আমার সমুদয় ভাব ও অনুভূতির সহিত অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। আমি সম্পূর্ণরূপে জানি, আমি স্বভাবতঃ মুক্ত; বদ্ধভাব সত্য ও মুক্তভাব ভ্রমাত্মক—ক্ষণকালের জন্যও আমি এ-কথা মানিয়া লইতে পারি না।

সকল দর্শনেই স্থূলভাবে এই বিচার চলিতেছে। এমন কি, খুব আধুনিক দর্শনেও এই আলোচনার সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। দুই দল আছেন; এক দল বলিতেছেন, আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, আত্মার ধারণা ভ্রান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তির কারণ জড়কণাগুলির পুনঃ পুনঃ স্থানপরিবর্তন; এই সংহতি—যাহাকে তোমরা শরীর মস্তিষ্ক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেছে, তাহারই স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশগুলির ক্রমাগত স্থান-পরিবর্তনে এই মুক্তস্বভাবের ধারণা আসিতেছে। কয়েকটি বৌদ্ধসম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন—একটি মশাল লইয়া চতুর্দিকে দ্রুত ঘুরাইতে থাকিলে একটি আলোকের বৃত্ত দেখা যাইবে। বাস্তবিক এই আলোকবৃত্তের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ ঐ মশাল প্রতি মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করিতেছে। সেইরূপ আমরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিমাত্র, উহাদের দ্রুত ঘূর্ণনে এই ‘অহং’-ভ্রান্তি জন্মিতেছে।

অতএব একটি মত হইল এই যে, শরীরই সত্য, আত্মার অস্তিত্ব নাই। অপর মত এই যে, চিন্তাশক্তির দ্রুত স্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রান্তির উৎপত্তি হইতেছে, বাস্তবিক জড়ের অস্তিত্ব নাই। এই দুই পক্ষ আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিতেছে—একজন বলিতেছেন আত্মা ভ্রমমাত্র, অপর আবার জড়কে ভ্রম বলিতেছেন। কোন্ মতটি লইব? অবশ্যই আত্মবাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া জড়বাদ অস্বীকার করিব। যুক্তি দুইদিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অস্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষকৃত প্রবল; কারণ জড় কি, তাহা কেহ কখন দেখে নাই। আমরা কেবল নিজদিগকেই অনুভব করিতে পারি। আমি এমন লোক দেখিনাই, যিনি নিজের বাহিরে গিয়া জড়কে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। কেহ কখন লাফাইয়া নিজ আত্মার বাহিরে যাইতে পারে না। অতএব আত্মার দিক যুক্তি একটু দৃঢ়তর হইল। দ্বিতীয়তঃ আত্মবাদ জগতের সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারে, জড়বাদ পারে না। অতএব জড়বাদের দিক হইতে জগতের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। পূর্বে যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্ত ও

বদ্ধভাব-সম্বন্ধীয় বিচারের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, জড়বাদ ও আত্মবাদের তর্ক তাহারই স্থূলভাব মাত্র। দর্শনসমূহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, তাহাদের মধ্যেও এই দুইটি মতে সংঘর্ষ চলিয়াছে। খুব আধুনিক দর্শনসমূহে ও আমরা অন্য আকারে সেই প্রাচীন বিচারই দেখিতে পাই। এক দল বলেন, মানবের তথাকথিত পবিত্র ও মুক্ত স্বভাব ভ্রমমাত্র—অপরে আবার বদ্ধভাবকেই ভ্রমাত্মক বলেন। এখানেও আমরা দ্বিতীয় দলের সহিত একমত, বদ্ধভাব যে ভ্রমাত্মক—আমরা এই মতই পোষণ করি।

অতএব বেদান্তের সিদ্ধান্তই এই— আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিত্যমুক্ত। শুধু তাই নয়, আমরা বদ্ধ—এই কথা বলা বা ভাবাই অনিষ্টকর, উহা ভ্রম—উহা নিজেকে নিজে সম্মোহিত করে মাত্র। যখনই তুমি বলো আমি বদ্ধ, আমি দুর্বল, আমি অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগ্য আরম্ভ, তুমি নিজের পায়ে আর একটি শিকল জড়াইতেছ মাত্র। এরূপ বলিও না, এরূপ ভাবিও না।

আমি এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি—তিনি বনে বাস করিতেন এবং দিবা-রাত্র ‘শিবোহং, শিবোহং’ উচ্চারণ করিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর অপর পারের লোকে ইহা দেখিল আর শুনিল—সেই ব্যক্তির কণ্ঠনিঃসৃত ‘শিবোহং শিবোহং’ ধ্বনি। যতক্ষণ তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল, ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়াও তিনি ‘শিবোহং’ উচ্চারণ করিতে বিরত হন নাই। এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়। এমন অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়, যাঁহারা শত্রু কর্তৃক খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। ‘সোহং সোহং’—আমি সেই, আমি সেই, তুমিও সেই। আমি নিশ্চয়ই মুক্ত পূর্ণস্বরূপ, আমার সকল শত্রুও তাই। ‘তুমিই তিনি; আমিও তিনি’—ইহাই বীরের কথা।

তথাপি দ্বৈতবাদীদের ধর্মে অনেক অপূর্ব মহৎ ভাব আছে—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আমাদের উপাস্য ও প্রেমাস্পদ সগুণ ঈশ্বরবাদ অতি অপূর্ব—অনেক সময় এগুলি প্রাণ শীতল করিয়া দেয়; কিন্তু বেদান্ত বলেন, প্রাণের এই শীতলতা আফিং-এর নেশার মতো অস্বাভাবিক। ইহা আবার দুর্বলতা আনয়ন করে, আর পূর্বে যত না প্রয়োজন ছিল, এখন তদপেক্ষা

বেশী প্রয়োজন এই বলসঞ্চার-শক্তিসঞ্চার। বেদান্ত বলেন, দুর্বলতাই সংসারের সমুদয় দুঃখের কারণ, দুর্বলতাই দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলিয়াই এত দুঃখভোগ করি। আমরা দুর্বল বলিয়াই চুরি ডাকাতি মিথ্যা জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করিয়া থাকি। দুর্বল বলিয়াই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। যেখানে আমরা দিগকে দুর্বল করিবার কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারে না। আমরা ভ্রান্তিবশতই দুঃখভোগ করিতেছি। এই ভ্রান্তি ত্যাগ কর, সব দুঃখ চলিয়া যাইবে। ইহা তো খুব সহজ সাদা কথা। এই-সকল দার্শনিক বিচার ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের ভিতর দিয়া আমরা সমুদয় জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

অদ্বৈত বেদান্ত যে ভাবে আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল। ভারতে এবং অন্যত্র এ-বিষয়ে একটি গুরুতর ভুল হইয়াছিল। বেদান্তের আচার্যগণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা সর্বজনীন করা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহারা যে-সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছিলেন, সেইগুলির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যে-প্রণালীতে তাঁহারা ঐ-সকল সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিলেন-অবশ্য ঐ প্রণালী অতিশয় জটিল। এই ভয়ানক দার্শনিক ও নৈয়ায়িক উক্তিগুলি দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্বদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাত্যহিক কর্মজীবনে শিক্ষা করা যাইতে পারে না, আর এরূপ দর্শনের আবরণে অত্যন্ত নৈতিক শিথিলতা দেখা দিবে।

কিন্তু আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলে দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে। বরং ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, ইহাই দুর্দুর্নীতি ও দুর্বলতা নিবারণ করিবার একমাত্র ঔষধ। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যখন নিকটে অমৃতের স্রোত বহিতেছে, তখন লোকে পঙ্কিল জল পান করিতেছে কেন? যদি ইহাই সত্য হয় যে, সকল শুদ্ধস্বরূপ, তবে এই মুহূর্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা দাও না কেন? সাধু-অসাধু, নর-নারী, বালক-বালিকা, বড়-ছোট-সকলকেই বজ্রনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও না কেন? যে-কোন ব্যক্তি জগতে দেহধারণ করিয়াছে, যে-কেহ করিবে-সিংহাসনে উপবিষ্ট

রাজা, ঝাড়ুদার, ধনী, দরিদ্র—সকলকেই ইহা শিক্ষা দাও না কেন?—আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নাই। আমি দেবাতার দেবতা, আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নাই।

এখন ইহা বড় কঠিন কার্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে ইহা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কুসংস্কারের জন্য, অন্য কারণে নহে। সকল প্রকার কদর্য ও দুস্পাচ্য খাদ্য খাইয়া এবং উপবাস করিয়া করিয়া আমরা নিজদিগকে সুখাদ্য খাইবার অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতে দুর্বলতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। এ ঠিক ভূত-মানার মতো। লোকে সর্বদা বলিয়া থাকে আমরা ভূত মানি না—কিন্তু খুব কম লোক দেখিবে, যাহাদের অন্ধকারে একটু গা ছমছম না করে। ইহা কুসংস্কার। ঠিক এইরূপেই লোকে বলিয়া থাকে, আমরা ইহা মানি না, উহা মানি না ইত্যাদি, কিন্তু কার্যকালে অবস্থা বিশেষে অনেকেই মনে মনে বলিয়া থাকেন—যদি কেহ দেবতা বা ঈশ্বর থাকো, আমায় রক্ষা কর। বেদান্ত হইতে এই অদ্বৈত ভাব পাওয়া যায়, এবং এই ভাবটিই চিরদিন থাকিবে। বেদান্তগ্রন্থগুলি কালই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই তত্ত্ব প্রথমে হিব্রুদের মস্তিষ্কে অথবা উত্তরমেরুনিবাসীদের মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইহা সত্য, আর যাহা সত্য তাহা সনাতন, আর সত্য আমাদের কাছে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়। মানুষ পশু দেবতা—সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী। তাহা দিগকে এই সত্য শিখাও, জীবনকে দুঃখময় করিবার প্রয়োজন কি? লোককে নানাপ্রকার কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন? কেবল এখানে(ইংলান্ড) নয়, এই তত্ত্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে বেদান্তের উপদেশ দাও, তাহারা ভয় পাইবে। তাহারা বলে : ইহা সন্ন্যাসীদের জন্য—সংসার ত্যাগ করিয়া যাহারা বনে বাস করে, তাহাদের পক্ষে ইহা ঠিক; কিন্তু আমরা সামান্য গৃহস্থ লোক; ধর্ম করিতে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার ভয়ের দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার ইত্যাদি।

দ্বৈতবাদ অনেক দিন জগৎকে শাসন করিয়াছে, আর ইহাই তাহার ফল। ভাল, একটি নূতন পরীক্ষা কর না কেন? হয়তো সক ব্যক্তির ইহা ধারণা করিতে লক্ষ বৎসর লাগিবে, কিন্তু

এখনই আরম্ভ কর না কেন? যদি আমরা আমাদের জীবনে কুড়িটি লোককে ইহা বলিতে পারি, আমরা খুব বড় কাজ করিলাম।

ভারতবর্ষে আবার একটি মহতী শিক্ষা প্রচলিত আছে, যাহা পূর্বোক্ত তত্ত্বপ্রচারের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। তাহা এই : ‘আমি শুদ্ধ, আমি আনন্দস্বরূপ; এ কথা মুখে বলা বেশ, কিন্তু জীবনে তো আমি সর্বদা ইহা দেখাইতে পারি না।’ এ কথা আমরা স্বীকার করি। আদর্শ সকল সময়েই বড় কঠিন। প্রত্যেক শিশুই আকাশকে নিজের মস্তকের অনেক উপরে দেখে, কিন্তু তাই বলিয়া সে আকাশে পৌঁছিতে পারে না, এই জন্যই কি আমরা সে দিকে যাইতে চেষ্টা করিব না? কুসংস্কারের দিকে গেলেই কি সব ভাল হইবে? যদি অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারি, তবে কি বিষপান করিলেই মঙ্গল হইবে? আমরা সত্য কখনই অনুভব করিতে পারিতেছি না বলিয়া কি অন্ধকার, দুর্বলতা ও কুসংস্কারের দিকে গেলেই মঙ্গল হইবে?

নানাপ্রকারের দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে-কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর-নারী, বালক-বালিকা যখন দৈহিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ আমি জানি, একমাত্র সত্যই বল বা শক্তি প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে আমরা কিছুতেই বীর্যবান হইব না, আর বীর না হইলে সত্যেও যাওয়া যাইবে না। এইজন্যই যে-কোন মত, যে-কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্কে দুর্বল করিয়া ফেলে, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া তোলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্বদাই মানুষকে সকলপ্রকার বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত অসম্ভব আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়—আমি সেই প্রণালীগুলি পছন্দ করি না, কারণ মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি নিতান্ত নিষ্ফল।

যাঁহারা ঐগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ঐগুলি মানুষকে বিকৃত ও দুর্বল করিয়া ফেলে—এত দুর্বল করে যে, ক্রমশঃ

তাহার পক্ষে সত্যলাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব আমাদের আবশ্যিক একমাত্র বল বা শক্তি। শক্তি এই পার্থিব দুর্ভোগের একমাত্র মহৌষধ। দরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিই দরিদ্রদের একমাত্র ঔষধ। মূর্থ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখনও শক্তিই মুর্থের একমাত্র ঔষধ। আর যখন পাপীরা অন্য পাপীদের দ্বারা, উৎপীড়িত হয়, তখনও শক্তিই একমাত্র ঔষধ। আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল, যেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আমাদেরকে যেরূপ নীতিপরায়ণ করে, আর কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। যখন সকল দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ে, তখন আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যত ভালভাবে কাজ করিতে পারি, আর কোন অবস্থাতেই তেমন পারি না। আমি তোমাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি, বলো দেখি, যদি একটি ছোট শিশুকে তোমাদের হাতে দিই, তোমরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে? মুহূর্তে তোমাদের জীবন বদলাইয়া যাইবে। তোমাদের স্বভাব যেমন হউক না কেন, তোমরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব চাপাইলে তোমাদের পাপবৃত্তি সব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। এইরূপ যখনই সমুদয় দায়িত্ব আমাদের উপর পড়ে, তখনই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবের স্ফূরণ হইবে; যখন আমাদের সমুদয় দোষ অপর কাহারও উপর চাপাইতে হয় না, যখন শয়তান বা ঈশ্বর—কাহাকেও আমরা আমাদের দোষের জন্য দায়ী করি না, তখনই আমরা যথাশক্তি ভালভাবে কাজ করি। আমিই আমার অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমিই নিজের শুভাশুভের কর্তা, আমিই শুদ্ধ ও আনন্দস্বরূপ। বিরোধী ভাবগুলি বর্জন করিতে হইবে।

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ব মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জনু।

ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।।

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ণ ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।। ১

বেদান্ত বলেন, এই স্তবই সাধারণের একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহাই সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র উপায়—নিজেকে এবং সকলকে বলা যে, আমিই সেই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে শক্তি আসে। যে প্রথমে খোঁড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ পায় বলা পাইয়া মাটির উপর পা সোজা রাখিয়া চলিতে থাকে। ‘শিবহং’-রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করে—পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়—প্রতি ধমনীতে—শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া জ্ঞান-সূর্যের কিরণ যতই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, ততই মোহ চলিয়া যায়, অজ্ঞানরাশি দূর হয়—ক্রমশঃ এমন এক সময় আসে, যখন সমুদয় অজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায় এবং একমাত্র জ্ঞান-সূর্যই অবশিষ্ট থাকে।

অবশ্যই এই বেদান্ততত্ত্ব অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ যে কুসংস্কার, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই দেশেই (ইংলণ্ডেই) এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগকেই আমি যদি বলি শয়তান বলিয়া কেহ নাই, তাঁহারা ভাবিবেন, যাঃ—সব ধর্ম গেল। অনেক লোক আমাকে বলিয়াছেন, শয়তান না থাকিলে ধর্ম কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা বলেন, আমাদের পিচালিত করিবার কেহ না থাকিলে আর ধর্ম কি হইল? কেহ আমাদের শাসন করিবার না থাকিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব কিরূপে? বাস্তবিক কথা এই, আমরা ঐভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে চাই। আমরা এইভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমাদের ভাল লাগে। প্রতিদিন কেহ না কেহ আমাদের তিরস্কার না করিলে আমরা সুখী হইতে পারি না। সেই কুসংস্কার! কিন্তু এখন ইহা যত ভয়ানক বলিয়া বোধ হউক, এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সকলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে যে-সকল কুসংস্কার আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলির প্রত্যেকটি স্মরণ করিয়া হাসিব, এবং আনন্দ ও দৃঢ়তার সহিত সত্যই বলিব—আমিই তিনি, চিরকাল তাহাই ছিলাম এবং সর্বদা তাহাই থাকিব।

১৪. কর্মজীবনে বেদান্ত (প্রথম প্রস্তাব)

[লণ্ডনে প্রদত্ত, ১০নভেম্বর, ১৮৯৬]

কর্মজীবনে বেদান্তদর্শনের উপযোগীতা সম্বন্ধে অনেকে আমাকে কিছু বলিতে বলিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মতবাদ খুব ভাল বটে, কিন্তু কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করা যাইবে, তাহাই প্রকৃত সমস্যা। যদি কার্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধির একটু ব্যায়াম ব্যতীত কোন মতবাদের কোন মূল্যই নাই। অতএব বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ দেন—বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত। ধর্মের আদর্শসমূহ সমগ্র জীবনকে যেন আচ্ছাদন করে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে যেন প্রবেশ করে এবং কার্যেও যেন ঐগুলির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমি ক্রমশঃ কর্মজীবনে বেদান্তের প্রভাবের কথা বলিব। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি ভবিষ্যৎ বক্তৃতাসমূহের উপক্রমণিকারূপে সঙ্কলিত, সুতরাং আমাদিগকে প্রথমে মতবাদগুলির বিষয়েই আলোচনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, পর্বতগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কিরূপে মতবাদগুলি আবার কর্মমুখর নগরীর রাজপথে কার্যে পরিণত হইতেছে। আমরা এই মতগুলির আরও একটু বিশেষত্ব দেখিব যে, চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জন অরণ্যবাসের ফলে নহে, পরন্তু যে-সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্বাপেক্ষা বেশী কর্মে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজারাই এগুলির প্রণেতা।

শ্বেতকেতু^১ আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বানপ্রস্থী ছিলেন। শ্বেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পঞ্চাল-জনপদের সভায় রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এ

লোক হইতে গমন করে, তাহা কি তুমি জানো?’-‘না’। ‘কিভাবে তাহারা এখানে পুনরায় আসিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জানো?’-‘না’। ‘তুমি কি পিতৃহান ও দেবহানির বিষয় অবগত আছ?’ রাজা এই রূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, ‘তুমি কিছুই জান না।’ বালক পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, ‘আমিও এ-সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিখাইতাম না?’ তখন পিতা-পুত্র রাজসম্মিলনে উপনীত হইয়া রাজাকে এই রহস্য-বিদ্যা শিখাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, ‘এই বিদ্যা-এই ব্রহ্মবিদ্যা কেবল রাজারাই জানেন, যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণেরা কখনই ইহা জানিতেন না।’ যাহা হউক, তিনি এ-সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদান্ত দর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নয়, পরন্তু ইহার সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক সার্বভৌম রাজা অপেক্ষা অধিকতর কর্ম-ব্যস্ত মানুষ আর কল্পনা করা যায় না; কিন্তু তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।

১ ছান্দোগ্য উপ.-৫/৩

এইরূপে নানাদিক হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবনগঠন ও জীবনযাপন করা অবশ্যই সম্ভব, আর যখন আমরা পরবর্তী কালের ভগবদ্গীতা আলোচনা করি-আপনারা অনেকেই বোধ হয় ইহা পড়িয়াছেন, ইহা বেদান্তদর্শনের একটি সর্বোত্তম ভাষ্যস্বরূপ-তখন দেখিতে পাই, আশ্চর্যের বিষয় যুদ্ধক্ষেত্রে এই উপদেশের স্থান বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে-তীব্র কর্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার চির শান্ততাব! এই তত্ত্বকে ‘কর্মরহস্য’ বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা অকর্ম বলিতে

সচরাচর যাহা বুঝি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহা অবশ্য আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে তো আমাদের চতুর্পার্শ্ববর্তী দেয়ালগুলিই পরমজ্ঞানী হইত, তাহারা তো নিশ্চেষ্ট। মৃত্তিকাখণ্ড, গাছের গুঁড়ি—এই গুলিই তো তাহা হইলে জগতে মহাতপস্বী বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারাও তো নিশ্চেষ্ট। আবার কামনায়ুক্ত হইলেই যে নিশ্চেষ্টতা কর্মে পরিণত হয়, তাহাও নয়, বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরতা কখন নষ্ট হইবার নয়—চিত্তের সে সমতা কখন নষ্ট হইবার নয়। আর আমরা বহুদর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি, কার্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্বাপেক্ষা ভাল।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা কার্যের জন্য যেমন একটা আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, তেমন আগ্রহ না থাকিলে কেমন করিয়া কাজ করিব? আমিও পূর্বে এইরূপ মনে করিতাম, কিন্তু যতই আমার বয়স হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই দেখিতেছি, উহা সত্য নহে। কার্যের ভিতরে যত কম আগ্রহ বা কামনা থাকে, আমরা ততই সুন্দরভাবে কাজ করিতে সমর্থ হই। আমরা যতই শান্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, ততই আমরা আরও বেশী কাজ করিতে পারি। যখন আমরা ভাববশে পরিচালিত হই, তখনই আমাদের শক্তির বিশেষ অপব্যয় হয়, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হয়, মন চঞ্চল হইয়া উঠে, কিন্তু কার্য খুব কমই হয়, যে-শক্তি কার্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা শুধু হৃদয়াবেগেই পর্যবসিত হয়। মন যখন খুব শান্ত ও স্থির থাকে, কেবল তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু সৎকার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। যদি তোমরা জগতে বড় বড় কর্মকুশল ব্যক্তির জীবনী পাঠ কর, দেখিবে তাঁহারা অদ্ভুত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুই তাঁহাদের চিত্তের সমতা নষ্ট করিতে পারিত না। এই জন্য যে-ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা কাজ করতে পারে না। আর যে কিছুতেই রাগে না, সে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। যে-ব্যক্তি ক্রোধ ঘৃণা বা কোন রিপূর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ-জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে নিজেকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, সে বড় একটা কাজের লোক হয় না। কেবল শান্ত ক্ষমাশীল স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকেন।

বেদান্ত আমাদেরকে আদর্শ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদর্শ অবশ্য বাস্তব হইতে অর্থাৎ যাহাকে আমরা কার্যকর বলিতে পারি, তাহা হইতে অনেক উচ্চে। আমাদের জীবনে দুইটি প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়—একটি আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করা, আর অপরটি এই জীবনকে আদর্শের উপযোগী করা। এই দুইটির পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, কারণ আমাদের আদর্শকে জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে—নিজেদের মতো করিয়া লইতে—আমরা অনেক সময় প্রলুব্ধ হই। আমার ধারণা, আমি কোন এক বিশেষ ধরনের কাজ করিতে পারি; হয়তো তাহার অধিকাংশই মন্দ। অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়তো ক্রোধ, ঘৃণা অথবা স্বার্থপরতারূপ অভিসন্ধি আছে। এখন কোন ব্যক্তি আমাকে কোন বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন—অবশ্য তাঁহার প্রথম উপদেশ এই হইবে যে, স্বার্থপরতা—আত্মসুখ ত্যাগ কর। আমি ভাবিলাম, ইহা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ে উপদেশ দেন, যাহা আমার সমুদয় স্বার্থপরতার—সমুদয় অসাধু ভাবের সমর্থন করে, আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ। আমি সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যেমন ‘শাস্ত্রীয়’ ‘অশাস্ত্রীয়’ কথা লইয়া লোকে গোলযোগ করিয়া থাকে; আমি যাহা বুঝি তাহাই শাস্ত্রীয়, আর তোমার মত অশাস্ত্রীয়। কার্যকর (practical) কথাটি লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। আমি যাহাকে কাজে লাগাইবার মতো বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র কার্যকর। যদি আমি দোকানদার হই, আমি মনে করি, দোকানদারিই একমাত্র কার্যকর ধর্ম। আমি যদি চোর হই, আমি মনে করি, চুরি করিবার উত্তম কৌশলই সর্বোত্তম কার্যকর ধর্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা কেমন এই ‘কার্যকর’ শব্দটি—কেবল আমরাই বর্তমান অবস্থায় যাহা করিতে পারি, সেই বিষয়েই প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই হেতু আমি তোমাদিগকে বুঝিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে কার্যকর বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে; উহা আদর্শ-হিসাবে কার্যকর। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদর্শ আমাদের আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শই ‘আদর্শ’ নামের উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ ‘তত্ত্বমসি’—‘তুমিই সেই ব্রহ্ম’—ইহাই সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি। নানাবিধ তর্ক বিচারের পর এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়

যে, মানবাত্মা শুদ্ধস্বভাব ও সর্বজ্ঞ। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আত্মা কখন জন্মান নাই, কখন মরিবেন না; আর আমি মরিব বা মরিতে ভীত-এ-সব কুসংস্কার মাত্র। আমি ইহা করিতে পারি বা পারি না-ইহাও কুসংস্কার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম বলে-যে-ব্যক্তি নিজ হইতে পৃথক সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে নাস্তিক; সেইরূপ বেদান্ত বলেন-যে-ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলে। অনেকের পক্ষে এই ধারণা বড় ভয়ানক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আর আমরা অনেকেই মনে করি, আমরা কখনই এই আদর্শে পৌঁছিতে পারিব না, কিন্তু বেদান্ত দৃঢ়ভাবে বলেন যে প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই, বালক-বলিকার ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই-অবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্মনির্বিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে-কোন কিছুই ইহাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব হইতেই অনুভূত হইয়াছে-পূর্ব হইতেই রহিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের রহিয়াছে। আমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে হাত দিয়া ‘অন্ধকার, অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে সেখানে প্রথম হইতেই আলোক ছিল। অন্ধকার কখনই ছিল না, দুর্বলতা কখনই ছিল না, আমরা নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি-‘আমরা দুর্বল’; আমরা নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি-‘আমরা অপবিত্র’। এইরূপে বেদান্ত শুধু যে বলেন-আদর্শকে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা নহে, উপরন্তু বলেন- উহা পূর্ব হইতেই আমাদের উপলব্ধ; আর যাহাকে আমরা এখন আদর্শ বলিতেছি, তাহাই বাস্তব সত্তা-তাহাই আমাদের স্বরূপ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সবই মিথ্যা। যখনই তুমি বলো, ‘আমি মর্ত্য ক্ষুদ্র জীবমাত্র’, তখনই তুমি মিথ্যা বলিতেছ; তুমি যেন যাদুবলে নিজেকে অসৎ, দুর্বল দুর্ভাগ্য করিয়া ফেলিতেছ।

বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই : নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা; এরূপ বলা যে, আমার কোন

শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না। কারণ যখনই তুমি ঐরূপ চিন্তা কর, তখনই তুমি যেন বন্ধন-শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করিতেছ, তোমার আত্মাকে পূর্ব হইতে অধিক মায়ার আবরণে আবৃত করিতেছ। অতএব যে-কেহ নিজেকে দুর্বল বলিয়া চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত; যে কেহ নিজেকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত; সে জগতে একটি অসৎ চিন্তার স্রোত বিস্তার করে। আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে : বেদান্তে আমাদের এই বর্তমান জীবনকে—এই মায়াময় মিথ্যা জীবনকে আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেষ্টা নাই। কিন্তু বেদান্ত বলেন, এই মিথ্যা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ইহার অন্তরালে যে সত্যজীবন সদা বর্তমান, তাহা প্রকাশিত হইবে। মানুষ পূর্বে কিছুটা পবিত্র ছিল, আরও পবিত্র হইল—এমন নহে। কিন্তু বাস্তবিক সে পূর্ব হইতেই শুদ্ধ—তাহার সেই শুদ্ধস্বভাব একটু একটু করিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। আবরণ চলিয়া যায় এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। এই অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তস্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য পূর্ব হইতেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

বেদান্ত আরও বলেন ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্বতগুহায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে যাঁহারা এই-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা বনে অথবা পর্বতগুহায় বাস করিতেন না, অথবা তাঁহারা সাধারণ মানুষও ছিলেন না, কিন্তু—আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—তাঁহারা অত্যন্ত কর্মময় জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদিগকে সৈন্যপরিচালনা করিতে হইত, সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত। তখনকার কালে রাজারাই সর্বময় কর্তা ছিলেন, এখনকার মতো সাক্ষীগোপাল ছিলেন না; তথাপি তাঁহারা এই-সকল তত্ত্ব চিন্তা এবং সেগুলি জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের ঐ-সকল তত্ত্ব অনুভব করা তো অনেক সহজ, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের জীবনে অনেক অবসর, সুতরাং আমাদের যখন কাজ এত কম, আমরা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন, তখন আমরা যে ঐ-সকল সত্য অনুভব করিতে পারি না, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। পূর্বকালীন সর্বময় সম্রাটগণের প্রয়োজনের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব তো কিছুই নয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণিত অশ্বোহিণী-পরিচালক অর্জুনের তুলনায় আমার প্রয়োজন কিছুই নয়, তথাপি এই যুদ্ধকোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা শুনবার এবং উহা কার্যে পরিণত করিবার সময় পাইলেন; সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ও আরামের জীবনে ইহা পারা উচিত। আমরা যদি বাস্তবিক সদ্ভাবে সময় কাটাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেখিব, আমরা যতটা ভাবি তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের যতটা অবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি, তবে একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটি আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি, কিন্তু আদর্শকে কখনই নীচু করা উচিত নয়। এ আমাদের জীবনের একটি প্রলোভন। অনেকে আছে—তাহারা আমাদের মিথ্যা অভাব ও বাসনাগুলির জন্য নানাপ্রকার আপত্তি দেখায় আর আমরা মনে করি, উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বুঝি আর নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। বেদান্ত এরূপ শিক্ষা কখনই দেন না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে হইবে, বর্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে।

তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বেদান্তের মূলকথা—এই একত্ব বা অখণ্ডত্ব। দুই কোথাও নাই, দুইপ্রকার জীবন নাই, অথবা দুইটি জগৎও নাই। তোমরা দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষে যখন দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ও-সকল কথা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। একমাত্র জীবন আছে, একমাত্র জগৎ আছে, একমাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই একসত্তা; প্রভেদ শুধু পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে প্রভেদ প্রকারগত নহে। পশুগণ মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে আমাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—বেদান্ত এরূপ কথা একেবারে অস্বীকার করেন।

কতকগুলি লোক দয়াপরবশ হইয়া ‘জীবিত-ব্যবচ্ছেদ-নিবারণী সভা’(Anti-vivisection Society) স্থাপন করিয়াছেন। আমি এই সভার জনৈক সভ্যকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘বন্ধু, আপনারা খাদ্যের জন্য পশুহত্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য দুই-একটি পশুহত্যার এত বিরোধী কেন?’ তিনি উত্তর

দিলেন, ‘জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগুলি আমাদের খাদ্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে।’ কি ভয়ানক কথা! বাস্তবিক পশুগুলিও তো সেই অখণ্ড সত্তারই অংশ। যদি মানুষের জীবন অমর হয়, পশুর জীবনও অমর। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। আমিও যেমন, একটি ক্ষুদ্র জীবাণুও তেমন—প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আর সেই সর্বোচ্চ সত্তার দিক হইতে দেখিলে এ প্রভেদও দেখা যায় না। অবশ্য তৃণ ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু যদি অতি উচ্চে আরোহণ কর, তবে ঐ তৃণ ও বৃহত্তম বৃক্ষ সমান বোধ হইবে। এইরূপ সেই উচ্চতম সত্তার দৃষ্টিতে এ-সবই সমান; আর যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বসী হও, তবে তোমাকে মানিতে হইবে, নিম্নতম পশু এবং উচ্চতম প্রাণী সমান, তাহা না হইলে প্রতিপন্ন হয়—ভগবান মহা পক্ষপাতী। যে-ভগবান মনুষ্যনামক তাঁহার সন্তাগণের প্রতি এত পক্ষপাতসম্পন্ন, আর পশুনামক তাঁহার সন্তানের প্রতি এত নির্দয়, তিনি মানুষ অপেক্ষাও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করা অপেক্ষা বরং আমি শত শত বার মরিতেও প্রস্তুত। আমার সমুদয় জীবন এরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর তো এরূপ নহেন। যাহারা এরূপ বলে, তাহারা জানে না, তাহার কত দায়িত্বহীন—হৃদয়হীন! তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জানে না। এক্ষেত্রে আবার ‘কার্যকর’ শব্দটি ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বাস্তবিক কথা এই, আমরা খাইতে চাই, তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ-ভোজনের আদর্শটি বুঝি। যখন আমি মাংস খাই, তখন আমি জানি, আমি অন্যায় করিতেছি। ঘটনাবিশেষে আমাকে উহা খাইতে বাধ্য হইতে হইলেও আমি জানি—উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এই—মাংসভোজন না করা, কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা; কারণ পশুমাংসই আমার ভাই, বিড়াল কুকুরও। যদি তাহাদিগকে এরূপ ভাবিতে পারো, তবে তুমি সর্বপ্রাণীর প্রতি ভ্রাতৃত্বাবের দিকে একধাপ অগ্রসর হইয়াছ—মনুষ্যজাতির প্রতি ভ্রাতৃত্বাবের তো কথাই নাই! উহা তো ছেলেখেলা মাত্র। তোমর সচরাচর দেখিবে, এরূপ উপদেশ অনেকের রুচিসঙ্গত হয় না—কারণ তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আদর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তুমি যদি এমন কোন মতের

কথা বলো, যাহাতে তাহাদের বর্তমান কার্যের –বর্তমান আচরণের সহিত খাপ খায়, তবেই তাহারা বলে ইহা কার্যকর।

মনুষ্য-স্বভাবে ভয়ানক রক্ষনশীল প্রবৃত্তি রহিয়াছে; আমরা সম্মুখে এক পা-ও অগ্রসর হইতে চাহি না। তুষারমগ্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যেমন পড়া যায়, মনুষ্যজাতির সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই বোধ হয়। শুনা যায়, ঐরূপ অবস্থায় লোক ঘুমাইতে চায়। যদি তাহাদিগকে জোর করিয়া জাগাইতে চাও, তাহারা নাকি বলে, ‘আমাদের ঘুমাইতে দাও—বরফে ঘুমাইতে বড় আরাম!’ তাহাদের সেই নিদ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হয়। আমাদের প্রকৃতিও তেমনি। আমরাও সারাজীবন তাহাই করিতেছি—পা হইতে উপরের দিক বরফে জমিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা ঘুমাইতে চাহিতেছি। অতএব সর্বদাই আদর্শে পৌঁছবার চেষ্টা করিবে; যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে খাটো করিয়া তোমার স্তরে নামাইয়া আনিতে চায়, যদি কেহ শিক্ষা দেয়—ধর্ম উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না। ঐরূপ ধর্মাচরন আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু যদি কেহ আসিয়া আমায় বলে, ‘ধর্মই জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়াস’, তবে আমি তাহার কথা শুনিত প্রস্তুত আছি। এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি কোনরূপ দুর্বলতা সমর্থন করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে তো ইন্দ্রিয়সমূহে আবদ্ধ হইয়া নিজদিগকে একেবারে অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তারপর আবার যদি কেহ আসিয়া পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিতে চায় এবং তুমি ঐ উপদেশ অনুসরণ কর, তবে কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিবে না। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমার দেশে ধর্মসম্প্রদায়গুলি ব্যাঙের ছাতার মতো বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নূতন নূতন সম্প্রদায় উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, যে-সম্প্রদায়গুলি সংসার ও ধর্ম একসঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে না তাহারাই উন্নতি করিয়া থাকে—আর যেখানে উচ্চতম আদর্শ সাংসারিক অনিত্য বাসনার সহিত মিলিত করার—ঈশ্বরকে মানুষের স্তরে টানিয়া আনিবার মিথ্যা চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই রোগ প্রবেশ করে। মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে হইবে।

এ প্রশ্নের আবার আর একটি দিক আছে। আমরা যেন অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখি। আমরা সকলেই সেই লক্ষের দিকে চলিয়াছি। দুর্বলতা ও শক্তির মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রাগত; যে-কোন বস্তুর সহিত অপর বস্তুর প্রভেদ কেবল মাত্রাগত—পরিমাণগত; প্রকারগত নয়। কারণ প্রকৃপক্ষে সবই সেই এক অখণ্ড বস্তুমাত্র। সবই এক—চিন্তারূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, আত্মারূপেই হউক, সবই এক—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে। তাই অন্যে ঠিক আমাদের মতো উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। কাহারও নিন্দা করিও না, সাহায্য করিতে পারো তো কর; যদি না পারো হাত গুটাইয়া লও, সকলকে আশীর্বাদ কর, সকলকে নিজ নিজ পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন উন্নতি হয় না। এভাবে কখনও কাহারও উন্নতি হয় না। অন্যের নিন্দা করিলে কেবল বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। সমালোচনা ও নিন্দা দ্বারা বৃথা শক্তিক্ষয় হয় মাত্র, আর শেষে আমরা দেখিতে পাই, অন্যে যে দিকে চলিতেছে আমরাও ঠিক সেই দিকেই চলিতেছি; আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতামাত্র।

এমন কি, পাপের কথা ধর। বেদান্তের ধারণা এবং ‘মানুষ পাপী ইত্যাদি’ ধারণা—এই দুইটি ভাবই কার্যতঃ এক, তবে একটি ভুল দিকে চলিয়াছে। প্রচলিত মত নেতিভাবাপন্ন, বেদান্ত ইতিভাবাপন্ন। একমত মানুষকে তাহার দুর্বলতা দেখাইয়া দেয়, অপরে বলে—দুর্বলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিও না; আমরাগকে উন্নতি করিতে হইবে। মানুষখন প্রথম জন্মিয়াছে, তখনই তাহার রোগ কি জানা গিয়াছে। সকলেই জানে নিজের কি রোগ; অপর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না। আমরা বহির্জগতের সমক্ষে কপট আচরণ করিতে পারি, কিন্তু অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্বলতা জানি। কিন্তু বেদান্ত বলেন, কেবল দুর্বলতা স্মরণ করাইয়া দিলেই বেশী উপকার হইবে না, তাহাকে ঔষধ দাও, মানুষকে কেবল সর্বদা রোগগ্রস্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষধ নয়—রোগ প্রতিকারে উপায় নয়। মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা

তাহার দুর্বলতার প্রতীকার নয়—তাহার শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে-শক্তি পূর্ব হইতেই বিরাজিত, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দাও। মানুষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথা দেখাইয়া বলেনঃ তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ, তুমি যাহাকে পাপ বলো, তাহা তোমাতে নাই। পাপগুলি তোমার খুব নিম্নতম প্রকাশ; যদি পারো, উচ্চতরভাবে নিজেকে প্রকাশিত কর। একটি জিনিস আমাদের মনে রাখা উচিত—তাহা এই যে, আমরা সবই পারি। কখনও ‘না’ বলিও না, কখনও ‘পারি না’ বলিও না। ওরূপ কখনও হইতেই পারে না, কারণ তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নয়। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারো, তুমি সর্বশক্তিমান।

অবশ্য যাহা বলা হইল তাহা নীতির মূলসূত্র মাত্র। আমরাগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমরাগকে দেখিতে হিবে, কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে—প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, মানুষ যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাহাকে সাহায্য করিতে না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কয়েকজন ব্যক্তির জন্য মতবাদ-রূপেই থাকিয়া যাইবে। ধর্ম দ্বারা যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে হয়, তবে ধর্মকে এমন হইতে হইবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সেই খানেই উহার সাহায্য পাইতে পারে,—দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার উচ্চশিখরে—সর্বদা সমভাবে ধর্ম যেন মানব জাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদান্তের তত্ত্বগুলি অথবা ধর্মের আদর্শ অথবা উহাদের যে-নামই দাও না কেন, কাজে আসিবে।

আত্মবিশ্বাসসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিত ভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে, তাহা বেশীর ভাগ দূরীভূত হইত। সমগ্র

মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীদের মধ্যে যদি কোন প্রেরণা বিশেষ শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস। তাঁহারা এই চেতনাসহ জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহৎ হইবেন, এবং তাঁহারা মহৎ হইয়াছিলেন। মানুষ যতদূর সম্ভব অবনত হউক না কেন, এমন এক সময় অবশ্য আসিবে, যখন ঐ অবস্থায় বিরক্ত হইয়াই তাহাকে উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, তখন সে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে শিখে। গোড়া হইতেই আমাদের ইহা জানিয়া রাখা ভাল। আমরা আত্মবিশ্বাস শিখিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব? আমরা বুঝিতে পারি, মানুষে মানুষে প্রভেদের কারণ—তাহাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস বিশ্বাস অথবা ইহার অভাব। এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, আর যতই আমার আমার বয়স হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। নএতন ধর্ম বলিতেছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল ক্ষুদ্র ‘আমি’কে লইয়া নয়, কারণ বেদান্ত ‘একত্ববাদ’ শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ সকলের মধ্যেই ‘তুমি’ রহিয়াছে। আত্মপীতির অর্থ সর্বভূতে পীতি—সকল জীব-জন্তুর প্রতি পীতি, সকল বস্তুর প্রতি পীতি। এই মহান বিশ্বাস-বলেই জগতের উন্নতি হইবে। ইহা আমার ধ্রুব ধারণা। তিনিই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন—আমি আমার নিজের সমন্বে সব জানি ; তোমরা কি জানো, তোমাদের এই দেহের ভিতর কত শক্তি, কত ক্ষমতা এখনই লুপ্তায়িত রহিয়াছে? কোন্ বৈজ্ঞানিক একটি মানুষের ভিতরে যাহা আছে, তাহা সবই জানিয়াছেন? লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব হইতে মানুষ পৃথিবীতে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার শক্তির অতি সামান্য অংশই এ-যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তুমি নিজেকে দুর্বল বলো কি করিয়া? আপাতপ্রতীয়মান এই অবনতির পশ্চাতে কি রহিয়াছে, তাহা কি তুমি জানো? তোমার পশ্চাতে অনন্ত শক্তি ও আনন্দের সমুদ্র রহিয়াছে।

‘আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ’—এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে হইবে। দিনরাত্রি শ্রবণ কর; তুমিই সেই আত্মা। দিনরাত্রি পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকো, যে পর্যন্ত না ঐ ভাব তোমার প্রতি

রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরায় ধমনীতে স্পন্দিত হয়, যে পর্যন্ত না উহা তোমার মজ্জাগত হইয়া যায়। সমুদয় দেহটিই ঐ এক আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলো; ‘আমি জন্মহীন, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, জ্যোতির্ময় আত্মা’—দিবারাত্রি এই চিন্তা কর—যে পর্যন্ত না উহা তোমার প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া যায়। ঐ ভাব ধ্যান করিতে থাকো,—উহা হইতেই পরে কর্ম আসিবে। ‘হৃদয় পূর্ণ হইলে মুখ কথা বলে—হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে।’ সুতরাং ঐরূপ অবস্থাতেই যথার্থ কার্য করিতে সক্ষম হইবে। নিজেকে ঐ আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলো—যাহা কিছু কর, পূর্বে সে সম্বন্ধে ভালভাবে চিন্তা কর। তখন ঐ চিন্তাশক্তি-প্রভাবে তোমার সমুদয় কর্মই পরিবর্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। জড় যদি শক্তিশালী হয়, চিন্তা তবে সর্বশক্তিমান। সেই চিন্তা, সেই ধ্যান লইয়া আইস, নিজেকে নিজের সর্বশক্তিমত্তা ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেলো। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের মাথায় কুসংস্কারপূর্ণ ভাবগুলি যদি মোটেই প্রবেশ না করিত! ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা এই কুসংস্কারের প্রভাব, দুর্বলতা ও নীচত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হইতাম! ঈশ্বরেচ্ছায় যদি মানুষ অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম সত্যসমূহে পৌঁছিতে পারিত! কিন্তু মানুষকে এই-সকলের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়; যাহারা তোমার পরে আসিতেছে, তাহাদের জন্য পথ দুর্গমতর করিও না।

অনেক সময় এই-সকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। আমি জানি, অনেকে এই-সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা যথার্থই এই ভাব কার্যে পরিণত করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম শিক্ষা। নিজেকে অথবা অপরকে দুর্বল বলিও না। যদি পারো লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। অন্তরের অন্তরে জানো যে, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব—নিজদিগকে কাল্পনিক ব্যক্তির সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা—কুসংস্কার মাত্র। আমাকে এমন একটি উদাহরণ দেখাও, যেখানে বাহির হইতে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাওয়া গিয়াছে। যাহা কিছু উত্তর আসিয়াছে, তাহা নিজের হৃদয় হইতে। তোমরা অনেকেই মনে কর, ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে গা একটু ছমছম করিতে থাকে। ইহার কারণ অতি শৈশবকাল হইতেই এই-সব ভয় মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে—এই ভয়ে, বন্ধু-বান্ধবের

ঘৃণার ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অপরকে এগুলি শিখাইবে না। এই-সকল প্রবৃত্তি জয় কর। ধর্ম বিষয়ে শিখাইবার আর বেশী আছে কি?—কেবল বিশ্বের একত্ব ও নিজের উপর বিশ্বাস।

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ এই একত্ব অনুভব করিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে। আমরা জানি, তোমারও এখন ইহা শিক্ষা দিতেছ। সকল দিক হইতেই এই শিক্ষা আমরা পাইতেছি। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নয়, জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণা করিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেখাইতে পারো, যিনি আজ জগতের একত্ব অস্বীকার করিতে পারেন? জগতের নানাত্ব প্রচার করিতে কে এখন সাহস করে? এই সবই তো কুসংস্কারমাত্র! একমাত্র প্রাণ বিদ্যমান, একমাত্র জগৎ বিদ্যমান, আর তাহাই আমাদের চক্ষে ‘নানা’ রূপে প্রতিভাত হইতেছে, যেমন স্বপ্নদর্শনকালে একটি স্বপ্নের পরে আর একটি স্বপ্ন আসে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা তো সত্য নয়। একটি স্বপ্নের পর আর একটি স্বপ্ন আসে—বিভিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এই জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। এখন ইহা পনের আনা দুঃখ ও এক আনা সুখরূপে প্রতিভাত হইতেছে। হয়তো কিছুদিন পরে ইহাই পনের আনা সুখে পরিপূর্ণ মনে হইবে—তখন আমরা ইহাকে স্বর্গ বলিব। কিন্তু সিদ্ধ হইলে এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন এই সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে—উহা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের আত্মাকেও আমরা ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিব। অতএব নানা জগৎ, নানা জীবন বলিয়া কিছু নাই। এই বহু সেই একেরই বিকাশমাত্র। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন—জড় বা চৈতন্য, মন বা চিন্তা-শক্তি অথবা অন্য কোনরূপে। সেই একই নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব আমাদের প্রথম সাধন—নিজেকে ও অপরকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া।

পৃথিবীতে এই মহান্ আদর্শের ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হউক—কুসংস্কারগুলি দূর হউক। দুর্বল মানুষকে শুনাইতে থাকো, ক্রমাগত শুনাইতে থাকো : তুমি শুদ্ধস্বরূপ; ওঠ, জাগো; হে মহান্ এই নিদ্রা তোমার সাজে না। ওঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি নিজেকে

দুর্বল ও দুঃখী মনে করিতেছ? হে সর্বশক্তিমান্ ওঠ, জাগো; নিজস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি নিজেকে পাপী বলিয়া মনে কর, তোমার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। তুমি নিজেকে দুর্বল বলিয়া ভাবো , ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। জগৎকে বলিতে থাকো, নিজেকে বলিতে থাকো—দেখ ইহার কি শুভফল হয়, দেখ কেমন বিদ্যুৎ-বলকে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সব কিছু পরিবর্তিত হইয়া যায়। মনুষ্যজাতিকে বলিতে থাকো—তাহাদের শক্তি দেখাইয়া দাও। তাহা হইলেই দৈনিক জীবনে ইহা অনুশীলন করিতে শিখিব।

বিবেক সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। তখন শিখিব,জীবনের প্রতি মুহূর্তে, আমাদের প্রতি কার্যে কিভাবে সদসৎ বিচার করিতে হয়, কিভাবে সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে হয়। সত্যের পরীক্ষা কি আমাদের জানিতে হইবে—তাহা এই পবিত্রতা, একত্ব। যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেমই সত্য, কারণ উহা মিলনকারক; ঘৃণা অসত্য, কারণ উহা বহুত্বের ভাব আনে—পৃথক্ করে। ঘৃণায় তোমা হইতে আমাকে পৃথক্ করে—অতএব ইহা অন্যায় ও অসত্য, ইহা একট বিভাজনী শক্তি, ইহাতে পৃথক্ করে—বিনষ্ট করে।

প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্বসম্পাদক।সকলে এক হইয়া যায়—মা সন্তানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, পরিবারগুলি নগরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রাণীর সহিত এক হইয়া যায়। কারণ প্রেমই বাস্তবিক অস্তিত্ব, প্রেমই স্বয়ং ভগবান্, আর সবই প্রেমের বিভিন্ন বিকাশ—স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে, কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব দেখিতে হইবে, আমাদের কর্মগুলি একত্বসম্পাদক, না বহুবিনিধায়ক। যদি বহুবিধায়ক হয়,তবে ঐগুলি ত্যাগ করিতে হইবে,আর যদি একত্বসম্পাদক হয় , তবে ঐগুলি সৎকর্ম বলিয়া জানিবে। চিন্তাসম্বন্ধেও এইরূপ। দেখিতে হইবে, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একত্বসম্পাদক; দেখিতে হইবে—উহা আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দিয়া এক মহাশক্তি উৎপাদন করিতেছি কি-না। যদি তাহা করে, তবে ঐরূপ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে—যদি না করে, তবে উহা পাপচিন্তা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বৈদান্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই—উহা কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা অজ্ঞেয় কিছু শিখায়ও না, কিন্তু সেন্ট পল যেমন রোমকগণকে বলিয়াছিলেন তেমনি বলে, ‘যাঁহাকে তোমরা অজ্ঞেয় মনে করিয়া উপাসনা করিতেছ, আমি তাঁহার সম্বন্ধেই তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি।’ আমি এই চেয়ারখানির জ্ঞান লাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে প্রথমে আমার ‘আমি’র জ্ঞান হয়, তারপর চেয়ারটির জ্ঞান হয়। আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটি জ্ঞাত হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞান লাভ করি—সমুদয় জগতের জ্ঞান লাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপ মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও, সমুদয় জগৎই উড়িয়া যাইবে; আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আসে, ১ অতএব ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই ‘তুমি’—যাহাকে তুমি ‘আমি’ বলো। তোমরা ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে পারো যে, আমার ‘আমি’ আবার তোমার ‘আমি’ কিরূপে হইবে? তোমরা আশ্চর্য বোধ করিতে পারো, এই সান্ত ‘আমি’ কিরূপে অনন্ত অসীম হইবে? কিন্তু বাস্তবিক তাই; সান্ত ‘আমি’ গল্পকথামাত্র। সেই অনন্তের উপর যেন একটা আবরণ পড়িয়াছে, আর উহার কতকাংশ এই ‘আমি’-রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই অনন্তের অংশ। বাস্তবিকপক্ষে অসীম কখন সসীম হন না—‘সসীম’ কথার কথা মাত্র। অতএব সেই আত্মা নর-নারী, বালক-বালিকা, এমন কি পশু-পক্ষী—সকলেরই জ্ঞাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারি না। সেই সর্বেশ্বর প্রভুকে না জানিয়া আমরা একটি নিশ্বাস ফেলিতে বা জীবনধারণ করিতে পারি না; আমাদের গতি শক্তি চিন্তা জীবন—সকলই তাঁহা দ্বারা পরিচালিত। বেদান্তের ঈশ্বর সর্বাধিক জ্ঞাত, কখনও কল্পনা প্রসূত নহেন।

প্রত্যক্ষ না হন, তবে আর প্রত্যক্ষ যদি কি? ঈশ্বর, যিনি সকল প্রাণীতে বিরাজিত,—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতেও অধিক সত্য। আমি যাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহা হইতেও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কি দেখিতে চাও? কারণ তুমিই তিনি, সেই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর; আর যদি বলি, তুমি তাহা নও, তবে আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি। সকল সময়ে আমি ইহা উপলব্ধি করি বা না করি, তথাপি আমি ইহা জানি। তিনিই এক অখণ্ড সত্তা, সর্ববস্তুর একত্বস্বরূপ সমুদয় জীবন ও অস্তিত্বের যথার্থস্বরূপ।

১ কেন উপ., ২/ ৪

বেদান্তের এই-সকল ভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। অতএব একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে—বিশেষতঃ জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় কিভাবে উহা কার্যে পরিণত করা যায় দেখিতে হইবে, আর ইহাও দেখিতে হইবে, কিভাবে এই আদর্শ নিম্নতর আদর্শসমূহ হইতে ক্রমশঃ বিকাশিত হইতেছে, কিভাবে এই একত্বের আদর্শ আমাদের পারিপার্শ্বিক সমুদয় ভাব হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ সর্বজনীন প্রেমে পরিণত হইতেছে; সব দিক দিয়া এগুলি আলোচনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তাহা হইলে আমরা আর বিপদে পড়িব না। কিন্তু সমগ্র জগৎ তো আর নিম্নতম আদর্শ হইতে ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিবার সময় নাও পাইতে পারে ; কিন্তু উচ্চতর সোপান-আরোহণে কি সার্থকতা—যদি পরবর্তিগণকে আমরা ঐ সত্য সহজে শিক্ষা না দিতে পারি? অতএব বিষয়টি বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করা আবশ্যিক, আর প্রথমতঃ উহার জ্ঞানভাগ-বিচারাংশ বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যিক, যদিও আমরা জানি, বিচারের বিশেষ কিছু মূল্য নাই, হৃদয়েরই প্রয়োজন বেশী। হৃদয়ের দ্বারাই ভাগবৎসাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের মতো রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয়—উহা গৌণভাবে আমাদের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। বুদ্ধি প্রহরীর মতো, কিন্তু সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রহরীর বেশী প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোলমাল থামাইতে হয়, অন্যায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বুদ্ধির কার্যও ততটুকু। এইরূপ বুদ্ধি-বিচারের পুস্তক যখন পড়া হয়, তখন একবার উহা আয়ত্ত হইলে সকলেরই তো মনে হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম। কারণ বিচার-শক্তি অন্ধ, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই, হাত-পাও নাই। হৃদয়—অনুভবই বাস্তবিক কাজ করে, উহা বিদ্যৎ অথবা আরও দ্রুতগামী বস্তু অপেক্ষা দ্রুত গমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন এই—তোমাদের হৃদয় আছে কি? যদি থাকে, তবে তুমি তাহা দ্বারাই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার হৃদয়ে এতটুকু

অনুভব-শক্তি আছে, তাহাই প্রবল হইবে, ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে—দেবভাবাপন্ন হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সবকিছুতে, সর্ববস্তুতে একত্ব অনুভব করিতে পারে—নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারে। বুদ্ধি তাহা পারে না। ‘বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।’ ১

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস-আ-কেম্পিসের ‘ঈশা-অনুসরণ’ পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জানো, প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি অনুভবের উপর ঝোঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই অনুভবের উপর জোর দিয়াছেন। বিচার আবশ্যিক, বিচার না করিলে আমরা নানাপ্রকার ভ্রমে পড়ি। বিচারশক্তি ভ্রম নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত বিচারের ভিত্তিতে আর কিছু নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটি নিষ্ক্রিয় গৌণ সহায়মাত্র; প্রকৃত সাহায্য অনুভবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ? যদি কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্ধিত হইতেছে। যদি না কর, তবে তুমি একজন বড় বুদ্ধিজীবী হইতে পারো, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল শুষ্ক বুদ্ধিবাদী হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন?—বুদ্ধি হইতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা ন্যায়ের কূট বিচার লইয়া কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন? কেহই এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকতক কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়বান্ হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে। হৃদয়ই জীবন, হৃদয়ই বল, হৃদয়ই তেজ—হৃদয় ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বরলাভ হইবে না।

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়। যখন হৃদয় তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। জগতে চিরকালই এরূপ

হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং এই বিষয়টি তোমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যিক। বৈদান্তিক নীতিতত্ত্বে ইহা একটি বিশেষ কার্যকারী শিক্ষা; কারন বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলে মহাপুরুষ—তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতে হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কার্যের প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। কোন্ শাস্ত্র কি সত্য বলিতেছে—তাহা কি করিয়া জানিতে পারো? তুমিও সেইরূপ অনুভব কর বলিয়া। বেদান্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি? না, তুমি-আমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাকি, তাহাতেই তুমি-আমি বুঝিতে পারি—সেগুলি সত্য। আমাদের দিব্য-আত্মা তাঁহাদের দিব্য-আত্মার প্রমাণ। এমন কি, তোমার দেবত্বই ঈশ্বরের প্রমাণ। যদি তুমি বাস্তবিক মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোন ঈশ্বর নাই, কখন হইবেনও না। বেদান্ত বলেন, এই আদর্শ অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেকেই মহাপুরুষ হইতে হবে—আর তুমি স্বরূপতঃ মহাপুরুষই আছ; কেবল উহা অবগত হও। কখনও ভাবিও না, আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে ‘আমি দুর্বল’ বা অন্যে দুর্বল এরূপ বলাই একমাত্র পাপ।

১৫. কর্মজীবনে বেদান্ত (দ্বিতীয় প্রস্তাব)

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, -১২ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি গল্প^১ বলিব—একটি বালকের কিরূপে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। গল্পটি প্রাচীন ধরনের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটি সারতত্ত্ব নিহিত আছে। একটি অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতাকে বলিল, ‘মা, আমি বেদশিক্ষা করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমার কি গোত্র, তাহা বলুন।’

তাহার মাতা বিবাহিতা ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা নারীর সন্তান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত—কোন কার্যেই তাহার অধিকার নাই, বেদপাঠ করা তো দূরের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, ‘আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্যা করিতাম, সেই অবস্থায় তোমার লাভ করিয়াছি, সুতরাং তোমার পিতার নাম এবং তোমার কি গোত্র, তাহা জানি না; এইটুকু মাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা।’

বালক ঋষিগণের নিকট গমন করিলে ঋষিগণ তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেন। সে ব্রহ্মচারী শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার গোত্র কি?’ বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই আবৃত্তি করিল। অনেকেই এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, ‘বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ, তুমি ধর্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই—এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিলাম—তোমাকে শিষ্য করিব।’ এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম রাখিলেন সত্যকাম, অর্থাৎ যে সত্য কামনা করে।

প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে কয়েক শত গরুর সেবার ভার দিয়া বলিয়া দিলেন, ‘এইগুলি লইয়া তুমি অরণ্যে যাও—যখন সর্বসুদ্ধ সহস্র গরু হইবে, তখন ফিরিয়া আসিবে।’ সে তাহাই করিল। কয়েক বৎসর পরে সেই গরুগুলির মধ্যে একটি প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, ‘আমরা এখন এক সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে লইয়া তোমার গুরুর নিকট ফিরিয়া যাও। আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।’ সত্যকাম বলিল, ‘বলুন প্রভু!’ বৃষ বলিল, ‘উত্তরদিক ব্রহ্মের এক অংশ; পূর্বদিক, দক্ষিণদিক, পশ্চিমদিকও তাঁহার এক এক অংশ। চারিদিক ব্রহ্মের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরও কিছু শিক্ষা দিবেন।’ তখনকার কালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পূজিত হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নিচয়ন করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে হইত। যাহা হউক, সত্যকাম স্নানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময় অগ্নি হইতে একটি বাণী শুনিতে পাইল—‘সত্যকাম!’ সত্যকাম বলিল, ‘প্রভু, আজ্ঞা করুন।’ তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ওল্ড টেস্টামেন্টে এইরূপ একটি গল্প আছে—স্যামুয়েল এইরূপ এক অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলেন। যাহা হউক, অগ্নি বলিলেন, ‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। একটি হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।’ একটি হংস একদিন আসিয়া সত্যকাম কে বলিল, ‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম! এই অগ্নি, তুমি যাহার উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্মের এক অংশ। সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎও এক অংশ। মদগু নামক এক পক্ষি তোমাকে আরও কিছু শিক্ষাইবেন।’ একদিন সেই পক্ষি আসিয়া তাহাকে বলিল ‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষাইব। প্রাণ তাহার এক অংশ। চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ। তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত হইল; গুরু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, ‘বৎস, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মতো উদ্ভাসিত দেখিতেছি।’ কে তোমাকে শিক্ষা দিল? সত্যকাম বলিল, ‘কোন মানুষে নয়। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু শিক্ষা দিন, কেন না আমি শুনিয়াছি আপনাদের ন্যায় গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিলে বিদ্যা কল্যাণের কারণ হয়।’ দেবতাগণ পূর্বে তাহাকে যে শিক্ষা

দিয়াছিলেন, ঋষি তাহাকে সেই শিক্ষাই দিলেন। বালক গুরুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও উপদেশ দিবার জন্য বলিল। তিনি বলিলেন, ‘ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু তুমি পূর্বেই জানিয়াছ।’

১ ছান্দোগ্য উপ., ৪/৪-৯

এই-সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল, আর সকলে কি শিখাইল—এ-সব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতে এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই-সকল বাণী আমাদেরই ভিতরে। আমরা আরও অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে উথিত। শিষ্য বরাবরই সত্য সম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা বাহির হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে—কর্মজীবনেই ব্রহ্মোপলব্ধি বা ব্যাবহারিক জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োগ। ধর্ম হইতে কার্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই সকলে সর্বদা অন্বেষণ করিতেছে; আর এই-সব গল্প পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, একত্বের ধারণা কিভাবে দিন দিন ব্যাবহারিক জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগকে যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হইত, সেগুলির মধ্যেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন। যে অগ্নি তাঁহারা উপাসনা করিতেন, তাহাই ব্রহ্ম—এই পৃথিবী সেই ব্রহ্মের একাংশ ইত্যাদি।

পরবর্তী উপাখ্যানটি সত্যকামের এক শিষ্যসম্বন্ধীয়। ইনি সত্যকামের নিকট শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার নিকট কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যকাম কার্যবশতঃ কোন স্থানে গিয়াছিলেন। তাহাতে শিষ্যটি একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। যখন গুরুরপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৎস, তুমি খাইতেছ না কেন?’ তখন বালক বলিলেন, ‘আমার মন এত খারাপ যে, কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।’ এমন সময় তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উথিত হইল, ‘প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম,

আকাশ ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মকে জানো।’ তখন তিনি বলিলেন, ‘প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ-সুখ-স্বরূপ, তাহা আমি জানি না।’ তখন অগ্নি আরও বলিতে লাগিলেন, ‘এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই সূর্য-তুমি যাঁহার উপাসনা করিতেছ, তিনি এই সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন ও সুখী হন। যিনি দিক্‌সকলে বাস করেন, আমিই তিনি। যিনি এই প্রানে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিদ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি।’

এখানেও আমরা কর্মজীবনে ধর্মানুভূতির কথা পাইতেছি। যাহাদিগকে তাঁহারা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেন, যে-সকল বস্তুর সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল, তাহাদেরই একটি উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদান্তের সাধনকাণ্ড। বেদান্ত জগৎকে উড়াইয়া দেয় না, উহাকে ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত ব্যক্তিকে উড়াইয়া দেয় না, ব্যাখ্যা করে—আমিত্বকে বিনাশ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আমিত্ব কি তাহা বুঝাইয়া দেয়। বেদান্ত বলে না যে, জগৎ বৃথা অথবা উহার অস্তিত্ব নাই, বরং বলে, জগৎ কি তাহা বুঝ, যাহাতে জগৎ তোমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে।

সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিষ্যকে এ-কথা বলে নাই যে, অগ্নি সূর্য চন্দ্র অথবা বিদ্যুৎ অথবা আর কিছু—যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল, কিন্তু বলিয়াছিল, যে-চৈতন্য সূর্য চন্দ্র বিদ্যুৎ অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরেও রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার চক্ষে সবই আর একরূপ ধারণ করিল। যে-অগ্নি পূর্বে কেবল হোম করিবার জড় অগ্নি ছিল, তাহা এক নূতন রূপ ধারণ করিল এবং প্রকৃত-পক্ষে ঈশ্বরস্বরূপ হইল। পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ কিল, প্রান আর এক রূপ ধারণ করিল; সূর্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ—সকলই আর একরূপ ধারণ করিল, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া গেল। তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ জানা গেল। কারণ আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদান্তের উদ্দেশ্যই এই—সকল বস্তুতে ভগবান দর্শন করা, বস্তুগুলি

যে রূপ আপত্যতঃ প্রতীয়মান হইতেছে, সেগুলিকে সেভাবে না দেখিয়া তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জানা।

তারপর আর একটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। ‘যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি সুন্দর ও জ্যোতির্ময়; তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।’ এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের চক্ষে যে এক বিশেষপ্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে একটি তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মানুষের কৃত প্রতিমা লোকের হিতকর ও সহায়ক হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব-প্রতিমা তো রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ করিতে চাও বেশ, কিন্তু পূর্ব হইতেই ঐ মন্দির অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির তো রহিয়াছে।

ছান্দোগ্য উপ, ৪। ১০-১৭

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বেদের দুই ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভ্যুদয়-সময়ে কর্মকাণ্ড এত জটিল ও বর্ধিতায়তন হইয়াছিল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদে কর্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের ভিতর একটি উচ্চতর, গভীরতর অর্থ আছে। অতি প্রাচীনকালে এই-সকল যাগযজ্ঞ কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের যুগে জ্ঞানিগণের অভ্যুদয় হইল। তাঁহারা কি করিলেন? আধুনিক সংস্কারকগণের মতো তাঁহারা যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া ঐগুলিকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু ঐগুলির উচ্চতর তাৎপর্য বুঝাইয়া দিয়া মানুষকে একটা ধরিবার জিনিস দিলেন।

তাহারা বলিলেন ‘অগ্নিতে হোম কর-অতি উত্তম কথা, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হোম হইতেছে। এই ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে; বেশ, কিন্তু সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই যে আমার মন্দির, যেখানেই আমি উপাসনা করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তোমরা বেদী নির্মাণ করিয়া থাকো, কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত চেতন মনুষ্যদেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মনুষ্যদেহ-রূপ বেদীতে পূজা অন্যান্য অচেতন প্রতীকের পূজা অপেক্ষা অনেক বড়।’

এখানে আর একটি বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আমি ইহার অধিকাংশ বুঝি না। যদি তোমরা ইহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পারো, তাই তোমাদের নিকট উপনিষদের ঐ অংশ পাঠ করিতেছি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে প্রথমে অচিপথে, তারপর ক্রমান্বয়ে দিন গুরুপক্ষ ও উত্তরায়ণ-ছয়মাসের নিকট গমন করে; মাস হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে সূর্যলোকে, সূর্যালোক হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে গমন করে। সেখানে কোন অমানব সত্তা তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহারই নাম ‘দেবযান’। যখন ঋষি ও জ্ঞানীদের মৃত্যু হয়, তাহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। সকলেই স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন-এই-সব বাজে কথামাত্র। এই চন্দ্রলোক, সূর্যলোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কি? আর এই যে অমানব ব্যক্তি আসিয়া বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, ইহারই বা অর্থ কি? হিন্দুদের মধ্যে একটি ধারণা ছিল যে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে-ইহার পরে আমরা পাইব কি করিয়া চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। তাহারা জ্ঞানলাভ করে নাই, কিন্তু এই জীবনে শুভকর্ম করিয়াছে, তাহাদের যখন মৃত্যু হয়, তাহারা প্রথমে ধূমপথে গমন করে, পরে রাত্রি, তারপরে কৃষ্ণপক্ষ, তারপরে দক্ষিণায়ন-ছয়মাস, তারপর বৎসর হইতে তাহারা পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। চন্দ্রলোকে দেবতাদের খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন চন্দ্রলোকে বাস করিতে থাকে। আর কর্মফল শেষ হইলেই পুনর্বীর তাহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাশরূপে পরিণত হয়;

তারপরে বায়ু, তারপরে ধূম, তারপরে মেঘ প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। সেখানে শস্যক্ষেত্রে শস্যরূপে পরিণত হইয়া মনুষ্য-কর্তৃক খাদ্যরূপে গৃহীত হয়, অবশেষে তাহাদের সন্তানাদিরূপে পরিণত হয়। যাহারা সৎকর্ম করিয়াছিল, যাহারা সৎকর্ম করিয়াছিল, তাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা অসৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের অতি নীচজন্ম হয়, এমন কি তাহাদিগকে কখন কখন শূকরজন্ম পর্যন্ত গ্রহণ করিতে হয়। আবার যে-সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই দুই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শূন্যও হয় না। আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি, আর পরে হয়তো আমরা ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া জীব আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলি অপেক্ষা যেন কিছু স্পষ্টতর বোধ হয়, কিন্তু এই-সকল উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, ব্রহ্মানুভূতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ বৃথা। মনে কর, অনেকে আছেন—তাহারা এখনও ব্রহ্ম অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ম করিয়াছেন, আর সেই কর্ম আবার ফল-কামনায় করা হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা এখান ওখান নানা স্থান দিয়া গিয়া স্বর্গে উপস্থিত হন; আর আমরাও যেমন এখানে জন্মিয়া থাকি, তাহারাও ঠিক সেইরূপ দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তাহাদের শুভ-কার্যের ফল শেষ না হয় ততদিন তাহারা স্বর্গে বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটি মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার নাম-রূপ আছে তাহাই নশ্বর। সুতরাং স্বর্গও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ সেখানেও নাম-রূপ রহিয়াছে। ‘অনন্ত স্বর্গ’ স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র যেমন এই পৃথিবী কখন অনন্ত হইতে পারে না; কারণ যে-কোন বস্তুর নাম-রূপ আছে, কালে তাহার উৎপত্তি, কালেই স্থিতি কালেই বিনাশ। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির; সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিত্যক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের আছে। মুসলমানেরা আবার স্বর্গের অতিশয় স্থূল ধারণা করিয়া থাকেন।

তাহারা বলেন, স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবাহিত হইতেছে। আরবের মরুতে জল একটি অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ, এই জন্য মুসলমানেরা স্বর্গকে সর্বদাই জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন। আমার যেখানে জন্ম, সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল। আমি হয়তো স্বর্গকে শুষ্ক বলিয়া কল্পনা করিব, ইংরেজরাও তাহাই করিবেন। সংহিতার এই স্বর্গ অনন্ত, মৃত ব্যক্তির স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। তাহারা সেখানে সুন্দর দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি সুখে চিরকাল বাস করিতে থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয়, আর তাহারা সর্বাংশে একানকারই মতো, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক সুখের জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহাদের স্বর্গের ধারণা এই যে, এই জীবনে সুখের যে-সকল বাধাবিঘ্ন আছে, সেগুলি সব চলিয়া যাইবে, কেবল সুখকর অংশগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে। স্বর্গের এই ধারণা আমাদের খুব সুখকার বটে, কিন্তু সুখকর ও সত্য—এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্। বাস্তবিক চরম সীমায় না উঠিলে সত্য কখনও সুখকর হয় না। মানুষের স্বভাব বড় রক্ষণশীল—মানুষ একবার কোন বিশেষ কার্য করে, আর একবার আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তাহার মন কোন নূতন চিন্তা গ্রহণ করিতে চায় না, কারণ উহা বড় কষ্টকর।

উপনিষদে আমরা পূর্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতেছি। উপনিষদে কথিত হইয়াছে—এই-সকল স্বর্গ, যেখানে গিয়া মানুষ পিতৃপুরুষের সহিত বাস করে, সেগুলি কখন নিত্য হইতে পারে না, কারণ যে-বস্তুর নাম-রূপ আছে তাহা বিনাশশীল। যদি রূপময় স্বর্গ থাকে, তবে কালে অবশ্য সেই স্বর্গের ধ্বংস হইবে। হইতে পারে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, কিন্তু এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। আর এক ধারণা ইতিমধ্যে লোকের মনে উদ্ভিত হইয়াছে যে, এই-সকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, এবং স্বর্গ কেবল তাহাদের শুভকর্মের ফলভোগের স্থানমাত্র। এই ফলভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। একটি কথা বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য-কারণের তত্ত্ব জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শণ ও ন্যায়ের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত হইয়াছে। এই-সকল

গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, এই গুলি সবই অন্তরের অনুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ইহা কার্যে পরিণত হইতে পারে কি না, আমি বলিব, ইহা আগে কার্যে পরিণত হইয়াছে, তারপর দর্শনে রূপায়িত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণের নিকট বিশ্বপ্রকৃতি কথা বলিত; পশুপক্ষী, চন্দ্রসূর্য তঁহাদের সহিত কথা বলিত। তঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিস অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাহারা চিন্তা দ্বারা বা বিচার দ্বারা উহা লাভ করেন নাই, কিংবা আধুনিক কালের প্রথা অনুযায়ী অপরের মস্তিষ্কপ্রসূত কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, অথবা আমি যেমন তঁহাদেরই একখানি গ্রন্থ লইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকি, তাহাও করেন নাই; তঁহাদিগকে সত্য আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। অভ্যাসই ইহার সাধন ছিল, আর চিরকালই এরূপ থাকিবে। ধর্ম চিরকালই ব্যাবহারিক বিজ্ঞানরূপে থাকিবে। শুধু দেবতা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম কখন ছিল না, কখন হইবেও না। প্রথমে অভ্যাস, তারপর জ্ঞান। জীবাত্মা যে এখানে ফিরিয়া আসে, এ ধারণা উপনিষদেই রহিয়াছে। যাহারা ফল কামনা করিয়া কোন সৎকর্ম করে, তাহারা সেই সৎকর্মের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ ফল নিত্য নহে। কার্যকারণবাদ এখানে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে—কথিত হইয়াছে যে, কারণ অনুসারেই কার্য হইয়া থাকে; কারণ যাহা, কার্যও তাহাই হইবে; কারণ যখন অনিত্য, তখন কার্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্যও নিত্য হইবে। কিন্তু ‘সৎকর্ম করা’-রূপ কারণগুলি অনিত্য—সসীম, সুতরাং তাহার ফল কখনই নিত্য হইতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর একদিক দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে, যে-কারণে অনন্ত স্বর্গ হইতে পারে না, সেই কারণেই অনন্ত নরক হওয়াও অসম্ভব। মনে কর, আমি একজন খুব খারাপ লোক। মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহূর্তে অন্যায় কর্ম করিতেছি, তথাপি এই জীবনটা অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি অনন্ত শাস্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, সসীম কারণের দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কর্মরূপ সান্ত কারণ দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে পারে না। সারা জীবন সৎকর্ম করিলেও অনন্ত

স্বর্গ-লাভ হয় না; হয়-মনে করিলে ঐ একই ভুল হইয়া থাকে। পূর্বে যে-সকল পথের কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি ছাড়া-যাঁহাযরা সত্যকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আর একটি পথ আছে। ইহাই মায়ার আবরণ হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়-‘সত্যকে অনুভব করা’; আর উপনিষদসমূহ বুঝাইতেছেন এই সত্যানুভব কাহাকে বলে।

ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্যই আত্মা হইতে প্রসূত বলিয়া চিন্তা করিবে। আত্মা সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন। বলো-জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ কর, স্বর্গ-নরক সর্বত্র সেই প্রভুকে দেখ। কি মৃত্যু, কি জীবন-সর্বত্রই তাঁহাকে উপলব্ধি কর। আমি পূর্বে তোমাদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব-এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ম। ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয় আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না। মনে কর, জীবাত্মা জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিল, তখন উহা স্বর্গেই যাক, নরকে বা অন্যত্র যেখানেই যাক, কিছুই আসে যায় না। আমি পৃথিবীতেই জন্ম গ্রহণ করি অথবা স্বর্গেই যাই, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থই নাই; কারণ আমার পক্ষে তখন সব জায়গা সমান, সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র; কারণ স্বর্গে, নরকে বা অন্যত্র আমি ভগবানের সত্তাই অনুভব করিতেছি। ভাল-মন্দ বা জীবন-মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই-শুধু এক অনন্ত ব্রহ্মই আছেন।

বেদান্তমতে মানুষ যখন এই অনুভূতিসম্পন্ন হয়, তখন সে মুক্ত হইয়া যায়; আর বেদান্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, অন্যে নহে। যে-ব্যক্তি জগতে অন্যায় দেখে, সে কিরূপে জগতে বাস করিতে পারে? তাহার জীবন তো দুঃখময়। যে-ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন তো দুঃখময়। যে ব্যক্তি এখানে নানা বাধা বিঘ্ন বিপদ দেখে তাহার জীবন তো দুঃখময়; যে ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন তো দুঃখময়। যে-ব্যক্তি প্রতি বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপ দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত; সে-ই কেবল বলিতে পারে-আমি এই জীবন সম্ভোগ

করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ সুখী। এখানে আমি বলিয়া রাখিতে পারি যে, বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্বাপেক্ষা অধিক যে শাস্তির কথা পাওয়া যায়—তাহা পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আর একবার উন্নতির সুবিধা লাভ করা। প্রথম হইতেই ব্যক্তিহীন ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও শাস্তির ভাব খুবই জড়ভাবাত্মক, আর কেবল মানুষের মতো সগুণ ঈশ্বর-ভাবের সঙ্গেই ইহার সঙ্গতি আছে, যিনি আমাদেরই মতো একজনকে ভালবাসেন, অপরকে বাসেন না। এরূপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরস্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত হইতে পারে। সংহিতার ঈশ্বর এইরূপ ছিলেন। সেখানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে; ইহার সহিত নির্গুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই ব্যক্তি-ভাবশূন্য নির্গুণের ধারণা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মানুষ সর্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায়।

অনেক বড় বড় মনীষী—অন্ততঃ জগৎ যাঁহাদিগকে খুব চিন্তাশীল বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নির্গুণবাদের উপর বিরক্ত, কিন্তু মানবদেহধারী ঈশ্বরের চিন্তা করা আমার নিকট অবাস্তব, আমার নিকট এই সগুণবাদ অতিশয় হাস্যাস্পদ, নিম্নভাবাপন্ন, অতি স্থূল, এমন কি অধর্ম বলিয়া বোধ হয়। বালকের পক্ষে ভগবানকে একজন সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাষা শোভা পায়, সে ওরূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষে ভগবানকে স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া চিন্তা করা বড় লজ্জার কথা। উচ্চতর ভাব কোনিট—জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ঈশ্বর? যে-ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, যাঁহার সম্বন্ধে কেহ কিছু জানে না—সেই ঈশ্বর অথবা অনুভূত ঈশ্বর? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, যাঁহার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে অভিশাপ, আর আমরা যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি, তবে একেবারে ধ্বংস! তিনি নিজে আসিয়া, আমাদের কি করিতে হইবে বলিয়া দেন না কেন? কেন তিনি ক্রমাগত দূত পাঠাইয়া আমাদের শাস্তি ও অভিশাপ দিতেছেন? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেকে সন্তুষ্ট। আমাদের কল্পনার কি দীনতা!

অপর পক্ষে, নির্গুণ ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে আমার সম্মুখে দেখিতেছি; তিনি একটি তত্ত্বমাত্র। সগুণ নির্গুণের মধ্যে প্রভেদ এই—সগুণ ঈশ্বর ব্যক্তিমাত্র, আর নির্গুণ ঈশ্বর দেবদূত, মানুষ, পশু এবং আরও কিছু, যাহা আমরা দেখিতে পাই না। কারণ নির্গুণের মধ্যে সব সগুণ ভাবই রহিয়াছে—উহা জগতের সমুদয় বস্তুর সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু। ‘যেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অস্তিত্ব আছে’,^১ নির্গুণও তদ্রূপ।

১ কঠ উপ. , ২/২/৯

আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দেখি নাই; তুমিও দেখ নাই; এই চেয়ারখানিকে দেখিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়, তারপর তাঁহারই ভিতর দিয়া চেয়ারখানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবরাত্র জগতে থাকিয়া ‘আমি আছি, আমি আছি, বলিতেছেন। যে মুহূর্তে তুমি বলো—‘আমি আছি’, সেই মুহূর্তেই তুমি সেই সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে যাইবে, যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে, সকল প্রাণীর ভিতরে না দেখিতে পাও, যদি তাঁহাকে ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিয়া গলদঘর্ম হইতেছে, তাহার ভিতর না দেখিতে পাও?

‘ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।’ ২

—তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, তুমিই জগতে জন্মগ্রহণ করিতেছ। তুমি এই সব। কি অদ্ভুত জীবন্ত ঈশ্বর! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু—ইহা অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়; বাস্তবিক ইহা প্রচলিত ঈশ্বর-ধারণার বিরোধী বটে; সেই ঈশ্বর কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই কখন দেখিতে পায় না। পুরোহিতরা আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাস দেন যে, যদি আমরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলি,

তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করি এবং তাঁহাদিগকে পূজা করি, তাহা হইলে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদের একখানি ছাড়পত্র দিবেন—তখন আমরা ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিব! এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়—এই স্বর্গবাদ প্রভৃতি পুরোহিতদের মূর্খতা ছাড়া আর কি?

অবশ্য নিষ্ঠুরবাদ অনেক কিছু ভাঙিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের নিকট হইতে সব ব্যবসা কাড়িয়া লয়—উহাতে মন্দির গির্জা প্রভৃতি সব উড়িয়া যায়। ভারতে এখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু সেখানে এমন অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হীরাজহরত রহিয়াছে। যদি লোককে এই নিষ্ঠুর ব্রহ্মের বিষয় শেখানো যায়, পুরোহিতদের ব্যবসা চলিয়া যাইবে।

১ শ্বেতাস্বতর উপ., ৪/৩

তবু আমাদের পৌরোহিত্য ছাড়িয়া নিঃস্বার্থভাবে শিখাইতে হইবে। তুমিও ঈশ্বর, আমিও ঈশ্বর—তবে কে কাহার আজ্ঞা পালন করিবে? কে কাহার উপাসনা করিবে? তুমিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির; আমি কোন মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা বা কোনরূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব। লোকে এত পরস্পর-বিরোধী চিন্তা করে কেন? লোকে বলে, আমরা প্রত্যক্ষবাদী; বেশ কথা, কিন্তু এইখানে তোমার উপাসনা অপেক্ষা আর কি অধিকতর প্রত্যক্ষ হইতে পারে? আমি তোমাকে দেখিতেছিলাম, তোমাকে বেশ অনুভব করিতেছি, আর জানিতেছি—তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই; কিন্তু বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির-গির্জা নির্মাণ করিতেছ, আর সর্বপ্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে

তাজমহল। যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে-মুহূর্তে আমি প্রত্যেক মানুষের সম্মুখে শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়াইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিব, যে-মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—অন্য সব-কিছুই অন্তর্হিত হইবে, আমি মুক্ত হইব।

ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী উপাসনা। মতান্তর লইয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। তাহারা বলে, ইহা ঠিক নয়। তাহার তাহাদের পিতামহেরা কি বলিয়া গিয়াছেন, সেই কথা লইয়া মতবাদ রচনা করিবে। পিতামহেরা আবার বিশ হাজার বৎসর পূর্বেকার প্রপিতামহদের নিকট শুনিয়াছিলেন, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশ্বর। সেই সময় হইতে কেবল মতমতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাহাদের মতে—ইহাই কাজের কথা, আর আমাদের ভাবগুলি কার্যে পরিণত করা যায় না।

বেদান্ত বলেন, সকলেই নিজ নিজ পথে চলুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহাই আদর্শ। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নয়, কিন্তু ইহা সত্যে পৌঁছবার সোপানমাত্র। ঐগুলিতে সুন্দর মহৎ ভাব আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলেন : বন্ধু, তুমি যাঁহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারা জগতে যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তিনি সর্বদা এখানেই রহিয়াছেন। তুমি যে জীবিত আছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া—তিনিই জগতের নিত্য সাক্ষী। সমুদয় বেদ যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য ‘আমি’তে সদা বর্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকস্বরূপ। তিনি যদি তোমাতে বর্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি সূর্যকেও দেখিতে পাইতে না, সব কিছুই তোমার নিকট শূন্য অন্ধকার জড়রাশি বলিয়া প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া তিনি জগৎকে দেখিতেছ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটি প্রশ্ন করা হইয়া থাকে—ইহাতে তো ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের সকলেই মনে করিবে, ‘আমি ঈশ্বর’—অতএব যাহা কিছু আমি ভাবি বা করি, তাহাই ভাল; ঈশ্বরের আবার পাপ কি?’ প্রথমতঃ এই প্রকার অপব্যর্থতার আশঙ্কা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, অপর পক্ষে অনুরূপ আশঙ্কা নাই? লোকে পৃথক্ স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে। তাহারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জন্মিয়াছে এবং সারা জীবনই এইভাবে কাঁপিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি জগৎ পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে? অপর পক্ষকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। যাঁহারা ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ঈশ্বরবাদ বুঝিয়া উপাসনা করিতেছেন, এবং যাঁহারা ব্যক্তি ভাবশূন্য নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া উপাসনা করিতেছেন, উভয়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতে বড় বড় লোকের আবির্ভাব হইয়াছে? বড় বড় কর্মী ও চরিত্রবান্ ব্যক্তির আবির্ভাব অবশ্যই নির্গুণ সাধকদের মধ্য হইতে হইয়াছে। ভয় হইতে উচ্চ নৈতিকশক্তি-সম্পন্ন মানুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পারো? ইহা কখনই হইতে পারে না। ‘যেখানে একজন অপরকে দেখে, যেখানে একজন অপরকে হিংসা করে, সেখানেই মায়া। যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, যেখানে সবই আত্মায় হইয়া যায়, সেখানে আর মায়া থাকে না।’^১ তখন সবই তিনি, অথবা সবই আমি—তখন আত্মা মলিনতা-মুক্ত হইয়াছে। তখন—কেবল তখনই আমরা বুঝিতে পারি প্রেম কাহাকে বলে। ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব? প্রেমের ভিত্তি মুক্তভাব। মুক্তস্বভাব হইলে তবেই প্রেম দেখা দেয়, তখনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অর্থ বুঝিতে পারি—তাহার পূর্বে নহে।

অতএব এই মত অনুসরণ করিলে সমুদয় জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, এমন কথা বলা উচিত নয়; যেন অপর মতটি কখন মানুষকে অন্যায়ের দিকে লইয়া যায় না, উহা যেন সমস্ত জগৎ রক্তে প্লাবিত করে না, উহা যেন মানুষকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে না! ‘আমার ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। এস, যুদ্ধ করিয়া সত্যতা প্রমাণ করি।’ দ্বৈতবাদ হইতে জগতে এই ফল হইয়াছে। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ হইতে প্রশস্ত উদার

দিবালোকে এস। মহৎ অনন্ত আত্মা কি করিয়া সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন? আমাদের সম্মুখে এই আলোকময় বিশ্বজগৎ রহিয়াছে, ইহার প্রত্যেকটি বস্তু আমাদের। বাহু প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমে আলিঙ্গন করতে চেষ্টা কর। যদি কখন এরূপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাকো, তবেই তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ।

১ বৃহদারণ্যক উপ., ৪/২৪ ও ৫/১৫; ছান্দগ্য উপ., ৭/ ২৪

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতের মধ্যে তোমাদের সেই অংশটি অবশ্যই মনে আছে, তিনি কিরূপে উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে, অধঃ উর্ধ্বে—সর্বত্র প্রেমের চিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিতেন, যতক্ষণ না সমুদয় জগৎ সেই মহান্ অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া যাইত। যখন সেই ভাব তোমাদের মধ্যে আসিবে, তখনই বুঝিবে যথার্থ ব্যক্তিত্ব কাহাকে বলে। সমুদয় জগৎ তখন এক ব্যক্তি হইয়া যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের প্রতি আর মন থাকে না। এই অনন্ত সুখের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পরিত্যাগ কর। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি? বাস্তবিক কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখও তোমায় ছাড়িতে হয় না, কারণ তোমাদের মনে থাকিতে পারে, পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি—সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ দুইই। মানুষ— অনন্তস্বরূপ নির্গুণ মানুষও—নিজেকে সগুণরূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তস্বরূপ আমরা যেন নিজদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু বলা যায় যে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আমাদের কর্মদ্বারা নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদের নিজেদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলো, মুক্ত হও। নিয়মকে পদদলিত কর। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই, কোন অদৃষ্ট নাই। অনন্তে বিধান বা নিয়ম থাকিবে কিরূপে? স্বাধীনতাই ইহার মূলমন্ত্র, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ—ইহার জন্মগত অধিকার। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে হয়, রাখিও; তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের মতো অভিনয় করিব। যেমন

একজন যথার্থ রাজা ভিখারীৰ বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীৰ্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে যে বাস্তবিক ভিক্ষুক, সে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমন করিতেছে। দৃশ্য উভয়ত্র সমান, কথাবার্তাও হয়তো এক, কিন্তু কি পার্থক্য! ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া একজন আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অন্যজন দারিদ্র্যে কষ্ট পাইতেছে। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ একজন মুক্ত, অন্যজন বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দারিদ্র্য সত্য নয়,—শুধু অভিনয়ের জন্য তিনি ইহা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক জানে—এ তাহার চিরকালের অবস্থা—ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এ দারিদ্র্য সহ্য করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা বিধির বিধান, সুতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি আমি—যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ আমরা ভিক্ষুক-মাত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সমুদয় জগতে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি—শেষে পৌরাণিক কাল্পনিক প্রাণীদের নিকটও সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু এই সাহায্য কখনও পাইলাম না, তথাপি ভাবিতেছি, এইবার সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি; এইভাবে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে থাকে।

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে—তোমরা সর্বদাই অন্যের নিকট সাহায্য পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছ, কখনও সাহায্য পাও নাই; যেটুকু সাহায্য পাইয়াছ, সব নিজের ভিতর হইতে। যে-কাজে তুমি নিজে চেষ্টা করিয়াছ, তাহারই ফল পাইয়াছ; তথাপি কি আশ্চর্য, তুমি সর্বদায় অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। ধনীদিগের বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাসা দেখিতে পাইবে। দেখিবে, উহা সর্বদাই পূর্ণ, কিন্তু এখন উহাতে যে-দল রহিয়াছে, সে-দলকে আর দ্বিতীয়বার দেখিবে না,—সর্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কখনই কিছু করিতে পারিতেছে না। আমাদের জীবনও সেইরূপ; কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার শেষ নাই, বেদান্ত বলে, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাটস্বরূপ,

তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ? যদি রাজা পাগল হইয়া নিজ দেশে ‘রাজা কোথায়, রাজা কোথায়?’ বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার সন্ধান পাইবেন না, কারণ তিনি নিজেই যে রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি প্রত্যেক গৃহ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ্য পাইবেন না; কারণ তিনি নিজেই যে রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা, এবং এই রাজার অন্বেষণরূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারিলেই মঙ্গল। বেদান্ত বলেন, এই রূপে নিজদিগকে রাজা বলিয়া জানিতে পারিলেই আমরা সুখী ও সন্তুষ্ট হইতে পারি। নির্বোধের মতো এ-সব অন্বেষণ ছাড়িয়া দিয়া শিশুর মতো জগতে খেলা করিতে থাকো।

এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরূপ না হইয়া এ-জগৎ ক্রীড়াঙ্গনে পরিণত হয়, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমরগুঞ্জনপূর্ণ বসন্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্বে যে-জগৎ নরককুণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহাই যেন স্বর্গে পরিণত হয়। বন্ধের দৃষ্টিতে জগৎ এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ—স্বর্গ অন্যত্র নাই। এক প্রাণই সর্বত্র বিরাজিত। পুনর্জন্মাদি যাহা কিছু—সব এখানেই হইয়া থাকে। দেবতা সবই এখানে তাঁহারা মানুষেরই প্রতিক্রিয়া। দেবতারা মানুষকে তাঁহাদের আদর্শে নির্মাণ করেন নাই, কিন্তু মানুষই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে! এখানে ইন্দ্র রহিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দিকে বিশ্বের দেবতারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তোমরাই তোমাদের নিজেদেরই এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ, তোমরাই কিন্তু মূল, আসল জিনিস—তোমরাই প্রকৃত উপাস্য দেবতা। ইহাই বেদান্তের মত এবং এই জন্যই ইহা যথার্থ কাজে লাগাইবার যোগ্য। অবশ্য আমরা যখন মুক্ত হইব, তখন উন্মত্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে, তবে পার্থক্য হইবে এইটুকু যে, তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হইবে। পূর্ব দৃশ্য—সবই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান না; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি—বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ

লইয়াই ব্যাপ্ত। এটি কেবল আমাদের প্রকৃতির একদিক, অপর দিকে মুক্তি সর্বদা বিরাজিত, আর আমরা শিকারীর দ্বারা অনুসৃত শশকের ন্যায় মাটিতে নিজেদের মুখ লুকাইয়া নিজদিগকে অশুভ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতএব দেখা গেল, ভ্রমবশতঃ আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভুলিতে পারি নাই, সর্বদাই উহা কোন না কোনরূপে আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আমরা যে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জগতে স্বাধীনতা-লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকি, এ-সব আর কিছুই নয়—আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোনরূপে নিজেকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা সর্বদাই আমাদেরই আশ্রয় করিতেছে। ভাবিতেছি—কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে; তাহা বুঝিতে আমরা ভুল করিয়াছি মাত্র। আমরা প্রথমে ভাবি, এই বাণী অগ্নি সূর্য চন্দ্র তারা বা কোন দেবতা হইতে উদ্ভূত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদেরই ভিতরে। এই সেই অনন্ত বাণী—অনন্ত মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে। এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই পৃথিবী, এই নিয়ম, এই বিশ্বজগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এই সঙ্গীত—এই ধ্বনি সর্বদা আমাদের নিজেদেরই ছিল, এবং চিরকাল তাহাই থাকিবে। এক কথায় বেদান্তের আদর্শ—জগতে মনুষ্যের উপাসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পারো, তবে অন্য কোথাও তোমার অন্য কিছু উপাসনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্মরণ নাই : যদি তুমি তোমার ভ্রাতাকে—যাহাকে তুমি দেখিয়াছ—ভাল না বাসিতে পারো, তবে যে-ঈশ্বরকে কখন দেখ নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিবে? যদি তাঁহাকে দেবভাবাপন্ন মনুষ্যের মুখে না দেখিতে পারো, তবে তাঁহাকে মেঘে অথবা অন্য কোন জড় পদার্থে অথবা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কি করিয়া দেখিবে? যে-দিন হইতে তোমরা সকল নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন হইতে আমি তোমাদিগকে ধার্মিক বলিব, তখনই তোমরা বুঝিবে, ডান গালে চড় কেহ মারিলে তাহার দিকে বাঁ গাল ফিরানোর অর্থ কি। যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে

দেখিবে, তখন সকল বস্তু—এমন কি ব্যাঘ্র পর্যন্ত তোমার নিকট আসিলে তাহাকে স্বাগত জানাইবে। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসিতেছেন—তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধু। আমাদের আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

ভগবানকে ‘পিতা’ বলা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব আছে; তাঁহাকে সাধকেরা ‘মাতা’ বলিয়া থাকেন। তাহা অপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে ‘প্রিয়সখা’ বলা। তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব—তাঁহাকে ‘আমার প্রেমাম্পদ’ বলা। ইহার কারণ এই—প্রেম ও প্রেমাম্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্বোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পের কথা স্মরণ থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাঁহার প্রেমাম্পদের ঘরের দরজায় আঘাত করিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল, ‘কে?’ তিনি বলিলেন, ‘আমি।’ দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার তিনি আসিয়া বলিলেন, ‘আমি আসিয়াছি’, কিন্তু দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, ‘কে?’ তখন তিনি বলিলেন, ‘প্রিয়, আমি তুমিই’; তখন দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ভগবান এবং আমাদের মধ্যেও তেমনি। ‘তুমি সকলেতে, তুমিই সব কিছু।’ প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দময় ঈশ্বরের রূপ।

‘কে বলে তুমি অজ্ঞাত? কে বলে তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে? আমরা তোমাকে অনন্তকালের জন্য পাইয়াছি। আমরা তোমাতে অনন্তকালের জন্য বাস করিতেছি—সর্বত্র অনন্তকালের জন্য বিজ্ঞাত, অনন্তকাল ধরিয়া উপাসিত তোমাকে আমরা পাইয়াছি।’

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্ত বলেন—অন্যান্য প্রকারের উপাসনা ভুল নহে। এই বিষয়টি কোনমতে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ভগবানের উপসনা করে—আমরা ঐগুলিকে যতই অপরিণত মনে করি না কেন—তাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত নহে। কারণ মানুষ সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। অন্ধকার বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প আলো; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প ভাল; অপবিত্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প পবিত্রতা। অতএব সত্য-ধারণার ইহাও একটি দিক যে, অন্যকে প্রেম ও সহানুভূতির চক্ষে

দেখিতে হইবে। আমরা যে-পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহারাও সেই পথ দিয়া চলিতেছে। যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে—তাহারাও শ্রীঘ্ন বা বিলম্বে মুক্ত হইবে। আর যখন তুমি মুক্ত হইলে, তখন তুমি অনিত্য দেখ কি করিয়া? যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও, তবে তুমি অপবিত্রতা দেখ কিভাবে? কারণ যাহা ভিতরে থাকে, তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজেদের ভিতরে অপবিত্রতা না থাকিলে বাহিরে কখনই অপবিত্রতা দেখিতে পাইতাম না। বেদান্তে ইহা সাধনার একটি দিক। আশা করি, আমরা সকলে ইহা জীবনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জন্য সারা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই-সকল বিচার-আলোচনায় আমরা এই ফল লাভ করিলাম যে, অশান্তি ও অসন্তোষের পরিবর্তে আমরা শান্তি ও সন্তোষের সহিত কার্য করিব। কারণ আমরা জানিলাম, সবকিছুই আমাদের ভিতরে—আমাদেরই রহিয়াছে, আমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের কাজ শুধু এই সত্য প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা।

১৬. কর্মজীবনে বেদান্ত (তৃতীয় প্রস্তাব)

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৭ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

পূর্বোক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদ্ হইতেই আমরা পাইতেছি যে, দেবর্ষি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে সোপানারোহণ-ন্যায়ে ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতত্ত্বে উপনীত হইলেন। ‘আকাশ তেজ হইতে মহত্তর, কারণ আকাশে চন্দ্র সূর্য বিদ্যুৎ তারা—সকলেই রহিয়াছে। আকাশেই আমরা শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই আমরা মরিতেছি।’^১ এখন প্রশ্ন হইতেছে—আকাশ হইতে মহত্তর কিছু আছে কিনা? সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও বড়। বেদান্তমতে এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আকাশের ন্যায় ইহাও একটি সর্বব্যাপী তত্ত্ব, আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য। প্রাণ আকাশ হইতেও মহত্তর। প্রাণের দ্বারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য, প্রাণই জ্ঞাতা।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ পাঠ করিব। শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে নানা বিষয় শিখাইয়া অবশেষে বলিলেন, ‘এই-সকল বস্তুর যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা হইতেই ইহারা নির্মিত, ইহাই সব, ইহাই সত্য; হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।’ তারপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন। ‘হে শ্বেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধু সংগ্ৰহ করিয়া একত্র করে এবং এই বিভিন্ন মধু যেমন জানে না, তাহারা কোথা হইতে

আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াও ভুলিয়া গিয়াছি। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।’

১ ছান্দোগ্য উপ., ৭/১২/১

‘যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদীসকল যেমন জানে না, ইহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে আমরা তাহাই। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।’১ পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এখন কথা এই, সকল জ্ঞানলাভের দুইটি মূলসূত্র আছে। একটি সূত্র এই—বিশেষকে সাধারণে এবং সাধারণকে আবার সার্বভৌম তত্ত্বে সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় সূত্র এই : যে-কোন বস্তু ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব সেই বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করিতে হইবে। প্রথম সূত্রটি ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটা কিছু যখন ঘটে, তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই। যখন ইহা দেখানো যায় যে, সেই একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত হই এবং উহাকে ‘নিয়ম’ আখ্যা দিয়া থাকি। যখন একটি প্রস্তর অথবা আপেল পড়িতে দেখি, তখন আমরা অতৃপ্ত হই; কিন্তু যখন দেখি, সকল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা উহাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হই। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে গমন করিয়া থাকি। যদি ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে চাই, সেখানেও ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে করিতে গেলে আমাদের এই মূলসূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এই উপনিষদ, যাহা হইতে তোমাদিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে এই ভাবের উদয় হইয়াছে—বিশেষ হইতে সাধারণে গমন।

আমরা দেখিতে পাই—কিভাবে দেবতাগণ ক্রমশঃ পরস্পর অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক তত্ত্বরূপে পরিণত হইতেছেন; জগতের ধারণায়ও তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন, কেমন সূক্ষ্ম ভূত হইতে সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর ভূতে যাইতেছেন, কেমন তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্বব্যাপী আকাশতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, কিভাবে সেখান হইতেও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রাণ-নামক সর্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, আর এই-সকলের ভিতরে আমরা এই এক তত্ত্বই পাইতেছি যে, একটি বস্তু অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। আকাশই সূক্ষ্মতররূপে প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি।

১ ছান্দোগ্য উপ, ৬। ৯ - ১০

সগুণ ঈশ্বর এই মূলসূত্রের আর একটি উদাহরণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও এইরূপ সামান্যীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে একটি শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা তো পর্যাণ্ত সামান্যীকরণ হইল না! আমরা প্রকৃতিক ঘটনার একটা দিক অর্থাৎ জ্ঞানের দিক লইলাম, তাহা হইতে সামান্যীকরণ-প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্তু বাকি প্রকৃতির অন্যদিক বাদ গেল। সুতরাং প্রথমতঃ এই সামান্যীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটি ত্রুটি আছে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার নিজের ভাব হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয়তো এক সময়ে ভাবিত, মাটিতে যাহা কিছু পড়ে, তাহা ভূতেই ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা; আর যদিও আমরা জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, তথাপি ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়; কারণ একটি ব্যাখ্যা বস্তুর বহিঃস্থ কারণ হইতে, অন্যটি বস্তুর স্বভাব হইতে লব্ধ। এইরূপ আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সম্বন্ধেই। যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহা বৈজ্ঞানিক; আর যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দেশ হইতে লব্ধ, তাহা অবৈজ্ঞানিক।

এখন ‘সগুণ ঈশ্বরের জগতের সৃষ্টিকর্তা’—এই তত্ত্বটিকেও এই সূত্রটি দ্বারা পরীক্ষা করা যাক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহির্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্য হইতে—সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবতই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত হইয়া দাঁড়াইল। আর চিরকাল সগুণ ঈশ্বরবাদের ইহাই একটি দুর্বলতা। এই মতে ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন, কেবল মানবীয় গুণগুলি অনেক পরিমাণে বর্ধিত। ঈশ্বর শূন্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—একেশ্বরবাদে এই দুইটি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ সগুণ ঈশ্বরবাদ পর্যাণ্ত সামান্যীকরণ নয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির ব্যাখ্যা নয়। এই মতবাদে কারণ হইতে কার্য সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু মানুষ যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার এই ধারণা বাড়িতেছে যে, কার্য কারণের রূপান্তরমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে, আর আধুনিক সর্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্যই এই যে, কার্য কারণের রূপান্তরমাত্র। এই কারণ ও আবার এক পুরাতন কারণের কার্য। শূন্য হইতে সৃষ্টি—আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট উপহাসের বিষয়।

ধর্ম কি পূর্বোক্ত দুইটি পরীক্ষার পর টিকিয়া থাকিতে পারে? যদি এমন কোন ধর্মমত থাকে, যাহা এই দুইটি পরীক্ষায় টিকিয়া যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মনের গ্রাহ্য হইবে। যদি আজকালকার মানুষকে পুরোহিত, গির্জা অথবা কোন শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া কোন মত বিশ্বাস করিতে বলা যায়, তবে সে উহা বিশ্বাস করিতে পারিবে না; তাহার ফল দাঁড়াইবে—ঘোর অবিশ্বাস। যাহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাহারা বাস্তবিক ভিতরে প্রচণ্ড অবিশ্বাসী। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যেন ধর্মের সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, ধর্মকে তাহারা পুরোহিতদের জুয়াচুরি মনে করে।

ধর্ম এখন একপ্রকার জাতীয় ভাবে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম আমাদের প্রাচীন সমাজের একটি মহান্ উত্তরাধিকার, অতএব ইহাকে থাকিতে দাও—ইহাই আমাদের ভাব। কিন্তু

আধুনিক লোকের পূর্বপুরুষ ধর্মের জন্য যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, এখন তাহা নাই; লোকে ধর্মকে এখন আর যুক্তিসঙ্গত মনে করে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টির ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্মেই ‘একেশ্বরবাদ’ বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না, আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে একেশ্বরবাদ প্রবল হইতে পারে নাই; এবং এই বিষয়েই বৌদ্ধেরা প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখাইয়া দিলেন যে, যদি প্রকৃতিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মানা যায়, যদি প্রকৃতি নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাবশ্যক। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতে একটি তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার বর্তমান রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার।

ইওরোপে মধ্যযুগে, এমন কি দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, তাহার অনেকদিন পরেও একটি বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল : গুণগুলি কি দ্রব্যের ভিতরে আছে, না গুণ ব্যতীত দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কি জড়পদার্থ-নামক দ্রব্যবিশেষে লাগিয়া আছে? আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রব্যটির অস্তিত্ব থাকে কি না? বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেছেন , এরূপ একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণগুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। ইহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছুই দেখিতে পাও না। ইহাই অধিকাংশ আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীদের মত, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, ইহা ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচারে পরিণত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে, এবং ইহার পিছনে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম হয় না; কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অধিকতর যুক্তির সহিত অপরে বলেন, এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা ‘দৃশ্য’ মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে আমরা ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—কেবল একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন

দ্রষ্টারূপে কখন বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে-অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে ; সেই এক অপরিণামী বস্তুই পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

বুঝিবার উপযুক্ত একটি দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি সত্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। অদ্বৈতবাদীদের চিরপরিচিত উপমা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে অনেকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সর্পভ্রম ঘুচিয়া যায়, তখন রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতেছি—মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে, তখন রজ্জুজ্ঞান থাকে না, আবার যখন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যখন আমরা ব্যাবহারিক সত্তা দেখি, তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না; আবার যখন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি, তখন অবশ্যই ব্যাবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হয় না।

এখন আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (Realist and Idealist) উভয়েরই মত বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যাবহারিক সত্তা দেখেন, আর বিজ্ঞানবাদী পারমার্থিক সত্তার দিক দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামশীল জগৎ আর থাকে না; তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সত্তা বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং তাঁহার বলিবার অধিকার আছে—এ-সবই সত্য।

এই বিচারের ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, ঈশ্বরের সগুণ ধারণা যথেষ্ট নহে। আমাদের আরও উচ্চতর ধারণা অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা করিতে হইবে। উহা দ্বারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই—প্রমাণ করিতেছি না, কিন্তু দেখাইতেছি, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত।

মানুষকেও আমরা এইরূপে সগুণ-নির্গুণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমরা সগুণও বটে, আবার নির্গুণও বটে। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরধারণা, অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুণ ধারণা, তাঁহাকে কেবল একটি ব্যক্তি বলিয়া ধারণা—অবশ্যই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ মানুষকে যেভাবে সগুণ নির্গুণ উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চতর ভাবে ঈশ্বরকেও সেইভাবে সগুণ নির্গুণ দুইই বলা যায়। অতএব সগুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই আমাদেরকে অবশেষে নির্গুণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ নির্গুণ ধারণা সগুণ ধারণা হইতে আরও ব্যাপক। কেবল নির্গুণই অনন্ত হইতে পারে, সগুণ সান্ত্র মাত্র। অতএব এই দ্বারা ব্যাখ্যা আমরা সগুণকে রক্ষাই করিলাম, উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশয় আসে—নির্গুণ ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণা নষ্ট হইয়া যাইবে, নির্গুণ জীবাত্মার ধারণায় সগুণ জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে; বাস্তবিক কিন্তু বেদান্তমতে ‘আমিত্বের’ নাশ হয় না, উহাকে প্রকৃতভাবে রক্ষা করা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনন্ত সত্তার সমাধান না করিয়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কোন-রূপে প্রমাণ করিতে পারি না। যদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই তাহাতে সমর্থ হইব না, ক্ষণকালের জন্যও ঐরূপ ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোকে আমরা আরও কঠিন ও দুর্বোধ্য তত্ত্ব উপনীত হই। সামান্যীকরণ-প্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্বোচ্চ তত্ত্ব উপনীত হইয়াছি, যদি সকল বস্তুকে তদনুযায়ী তাহার স্বরূপ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, সেই নির্গুণ পুরুষ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে আমরা তিনিই। ‘হে শ্বেতকেতো, তত্ত্বমসি’^১ – তুমি তিনিই, তুমিই সেই নির্গুণ সত্তা; তুমিই সেই ব্রহ্ম, যাঁহাকে সমুদয় জগতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, সর্বদাই তুমি সেই! কিন্তু ‘ব্যক্তি’-অর্থে ‘তুমি’ নহে, নির্গুণ-অর্থে। আমরা এই যে মানুষকে জানিতেছি, যাঁহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি সগুণ ব্যক্তি হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সত্তা নির্গুণ অব্যক্ত। এই সগুণকে জানিতে হইলে আমাদেরকে নির্গুণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকৈ জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। সেই নির্গুণ সত্তাই বাস্তবিক সত্য, তিনি মানুষের আত্মা—এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে সেই সত্য বলা হয় নাই।

এ-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠবে। আমি ক্রমশঃ সেইগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কূট প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু ঐগুলির মীমাংসার পূর্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি—অদ্বৈতবাদ কি বলেন। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি, ইহারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, সত্যের অন্বেষণ অন্যত্র করিতে হইবে না। স্থূলসূক্ষ্ম—সবই এখানে; কার্যকারণ—সবই এখানে, জগতের ব্যাখ্যা এখানেই রহিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্বানুসূত সত্তারই সূক্ষ্মভাবে পুনরাবৃত্তিমাাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই

১ ছান্দোগ্য উপ, ৬। ৮। ৭

জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করিয়া থাকি। এই অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, বহির্জগৎ সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গ নরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, সেগুলিও এই জগতের অন্তর্গত, সমুদয় মিলিয়া এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমানুর সমষ্টিস্বরূপ এই ‘এক’ অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে, আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্ত-জীবভাবে আমরা যেন পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই একই সত্যস্বরূপ; আর যতই আমরা নিজদিগকে উহা হইতে কম পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে নিজেদের পৃথক্ মনে করিব, ততই আমাদের দুঃখ বাড়িবে। এই অদ্বৈততত্ত্ব হইতেই আমরা নীতির ভিত্তি প্রাপ্ত হইলাম; আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, আর কোন মত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্ব পাই না। আমরা জানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষের ইচ্ছা। এখন আর কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নয়; কারণ উহা আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। হিন্দুরা বলেন—এই কার্য করা উচিত নয়, কারণ বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু খ্রীষ্টান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। খ্রীষ্টান আবার বলেন—এ-কাজ করিও না, ও-কাজ করিও না, কারণ বাইবেলে ঐ-সকল কার্য নিষিদ্ধ। যাহারা বাইবেল মানে না, তাহারা অবশ্য এ-কথা শুনিবে না। আমরাদিগকে এমন এক তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে,

যাহা এই নানাবিধ ভাবের সমন্বয় করিতে পারে। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক সগুণ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীষী আছেন, যাঁহাদের পক্ষে ঐ ধারণা পর্যাণ্ড বুলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা ইহা অপেক্ষা কিছু চাহিয়াছেন; আর যখনই ধর্মসম্প্রদায়গুলি এই মনীষীগণকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিবার মতো উদারভাবাপন্ন হয় নাই, তখনই সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি সংগঠিত ধর্মবিশ্বাস (organised faith) ত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্তমান কালে বিশেষতঃ ইওরোপে ইহা যত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর কখনও কোথাও এরূপ হয় নাই।

মনীষীদিগকে ধর্মের ভিতর রাখিতে হইলে ধর্মকে অবশ্য খুব উদার হইতে হইবে। ধর্ম যাহা কিছু বলে, সবই যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যিক। কেহই বলিতে পারে না, সকল ধর্মই কেন এই এক দাবি করিয়া থাকে যে, তাহারা যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চায় না। বাস্তবিক ইহার কারণ গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত ধর্মবিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে। কোন ধর্ম হয়তো কিছু বীভৎস ব্যাপার করিতে আঙা দিল।...মনে কর, মুসলমানধর্মের কোন আদেশের প্রতি একজন খ্রীষ্টান দোষারোপ করিল। তাহাতে মুসলমান স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিবে—কি করিয়া তুমি জানিলে আদেশটি ভাল কি মন্দ? তোমার ভালমন্দের ধারণা তো তোমার শাস্ত্র হইতে! আমার শাস্ত্র বলিতেছে, ‘ইহা সৎকার্য।’ যদি তুমি বলো, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন—আমাদের শাস্ত্র আরও প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন—আমার শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাহা লইয়া তুমি সমুদয় তুলনা করিতে পারো? খ্রীষ্টান বলিবেন, ঈশ্বার ‘শৈলোপদেশ’ দেখ; মুসলমান বলিবেন, ‘কোরানের নীতি’ দেখ। মুসলমান বলিবেন—এদুয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা কে বিচার করিবে, মধ্যস্থ কে হইবে? বাইবেল ও কোরানে যখন বিবাদ, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারে না। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি মীমাংসক হইলেই ভাল হয়। কোন গ্রন্থ মীমাংসক হইতে পারে না, সার্বভৌম কোন-কিছু দ্বারাই মীমাংসা হওয়া চাই। যুক্তি অপেক্ষা সার্বভৌম আর কি আছে? কেহ কেহ বলেন, যুক্তি সকল সময়ে সত্যানুসন্ধানে সমর্থ নহে। অনেক সময় যুক্তি ভুল করে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত

করা হইয়াছে যে, কোন পুরোহিত-সম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। ...আমি কিন্তু বলি, যুক্তি যদি দুর্বল হয়, তবে পুরোহিত-সম্প্রদায় আরও দুর্বল, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তিই শুনিব, কারণ যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অন্য উপায়ে সত্যলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, আর যাহারা যুক্তির অনুসরণ না করিয়া কোন বিশ্বাসে উপনীত হয়, তাহাদের প্রতিও আমাদিগকে সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। কারণ কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল! আমরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষানুভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই মানুষ বড় হয় নাই। কোটি কোটি শাস্ত্রও আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে না। ঐরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষানুভূতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে, আর ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি মননের ফল। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখন চিন্তা করে না; ইহা মানিয়া লওয়া যাক যে, উহা সবই বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাই থাকিয়া যায়। একটি গাভীকে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করানো যাইতে পারে। কুকুর সর্বাপেক্ষা চিন্তাহীন জন্তু। ইহারা কিন্তু যে কুকুর, যে গাভী, যে মৃত্তিকা তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব এই যে, সে মননশীল জীব; পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অতএব আমাদিগকে অবশ্য মননের চালনা করিতে হইবে। এই জন্যই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অনুসরণ করি, শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়াছি; কারণ আমি যে দেশে জন্মিয়াছি, সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাস করার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। একটা গো আছে, কিরূপে জানিলে? কারণ ‘গো’ শব্দ বেদে রহিয়াছে। মানুষ আছে কি করিয়া জানিলে? কারণ বেদে ‘মনুষ্য’ শব্দ রহিয়াছে। হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত!—আমি যেভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, সেভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকগুলি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা

লইয়া কতকগুলি অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, এবং সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৎসর এই তত্ত্ব কার্যে রূপায়িত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। লোকের কথায় বিশ্বাসের শক্তি অনেক, উহাতে বিপদও অনেক! এরূপ বিশ্বাস মনুষ্যজাতির উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করে, আর আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, উন্নতিই আমাদের আবশ্যিক। প্রকৃত সত্য অপেক্ষা আপেক্ষিক সত্যের অনুসন্ধানও আমাদের মনের চালনা আবশ্যিক হইয়া থাকে। মননই আমাদের জীবন।

অদ্বৈতবাদের এইটুকু গুণ যে, ধর্মমতের ভিতর এই মতটিই অনেকটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়। নির্গুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে নির্গুণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য, আর অন্য সমুদয় ভাব-যথা ঈশ্বরের আংশিক ক্ষুদ্র ব্যক্তিভাবাপন্ন সগুণ ধারণাগুলি-বিচারসহ নহে। যুক্তিসঙ্গত এই ঈশ্বরবাদের আর একটি গুণ এই যে, ইহা প্রমাণ করে ঐ আংশিক ধারণাগুলি এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যিক। এই মতগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি। দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, তথাপি ইহা বড় শান্তিপ্রদ। তাহারা সখের ধর্ম চাহিয়া থাকে; আর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্প লোকই সত্যের বিমল আলোক সহ্য করিতে পারে, তদনুসারে জীবনযাপন করা তো দূরের কথা। অতএব এই সখের ধর্মও থাকা দরকার; ইহা অনেককে উচ্চতর ধর্মলাভে সাহায্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান্য বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কখন উচ্চচিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, প্রতিমা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নির্গুণবাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নির্গুণবাদের আলোকেই এইগুলির উপকারিতা ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশ্বরের নির্গুণভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন-তিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত; তবে আমি বলি, মনুষ্যবুদ্ধিতে নির্গুণের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে,

তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিকই জগৎটা কি? বিভিন্ন মন সেই নির্গুণেরই যতদূর ধারণা করিতে পারে, তাহাই; উহা যেন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত এক একখানি পুস্তক-স্বরূপ, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উহা পাঠ করিতেছে, আর প্রত্যেকেই উহা নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বুদ্ধি কতকটা একরূপ, সেই জন্য মনুষ্যবুদ্ধিতে কতকগুলি জিনিস একরূপ মনে হয়। তুমি আমি উভয়েই একখানা চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে প্রমানিত হইতেছে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত। মনে কর, অপর কোন ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব আসিল; সে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহারা এক প্রকৃতির, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব এই জগৎ সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা; আর ব্যাবহারিক সত্তা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ প্রথমতঃ ব্যাবহারিক সত্তা সর্বদাই স-সীম। আমরা যে-কোন ব্যাবহারিক সত্তা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, দেখিতে পাই-উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অতএব সসীম হইয়া থাকে; আর সগুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা, তাহাতে তিনিও ব্যাবহারিক মাত্র। কার্যকারণ-ভাব কেবল ব্যাবহারিক জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তখন অবশ্যই তাঁহাকে স-সীমরূপে ধারণা করিতে হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই জগৎই আমাদের বুদ্ধির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সেই নির্গুণ সত্তা মাত্র, আর আমাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার উপর নাম-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই সত্তা, আর এই টেবিলের আকৃতি ও অন্যান্য যাহা কিছু-সবই সদৃশমানব-বুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর আরোপিত হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ গতির বিষয় ধর। ব্যাবহারিক সত্তার উহা নিত্যসহচর। উহা কিন্তু সেই সার্বভৌম পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ গতি বা পরিণাম আপেক্ষিক ভাবমাত্র, আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুলনায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই দুইটি

পদার্থের আবশ্যিক। সমুদয় সমষ্টিজগৎ এক অখণ্ডসত্তাস্বরূপ, উহার গতি অসম্ভব। কাহার সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে? উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হইবে? অতএব সেই সমষ্টি সত্তা নিরপেক্ষ, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অণুই নিরন্তর গতিশীল; একই সময়ে উহা পরিণামী ও অপরিণামী, সগুণ নির্গুণ দুই-ই। ইহাই আমাদের জগৎ, গতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা, ‘তত্ত্বমসি’র অর্থও ইহাই। আমাদেরকে আমাদের স্বরূপ জানিতে হইবে।

সগুণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, ব্যষ্টি হইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি, আর অদ্বৈতবাদ আমাদেরকে এই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান জগৎকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, উহা কি তাহাই বুঝিতে বলে। আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জলস্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, উহার সত্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিকই উহা সমুদ্র-সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদয় সমুদ্রস্বরূপ; কারণ যে অনন্ত শক্তিরূপে ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান, তাহার সমুদয়ই তোমার ও আমার। তুমি আমি, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলির প্রণালীর মতো-যাহাদের ভিতর দিয়া সেই অনন্ত সত্তা আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে; আর এই যে পরিবর্তনসমষ্টিকে আমরা ‘ক্রমবিকাশ’ নাম দিই, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তি বিকাশ মাত্র। কিন্তু অনন্তের এ-পারে -সান্ত জগতে আত্মার সমুদয় শক্তির প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দলাভ করি না কেন, উহারা কখনই এ-জগতে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের রহিয়াছে। ঐগুলি যে আমরা উপার্জন করিব, তাহা নহে; ঐগুলি আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।

অদ্বৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহা বুঝা বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই দুর্বলতা শিক্ষা দিতেছে; জন্মাবধি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্বল। এখন আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তি উপলব্ধি

করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তিবিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞান লাভ করি, তাহারা কোথা হইতে আসে? উহারা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন জ্ঞান কি বাহিরে আছে?—আমাকে এক বিন্দু দেখাও তো। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান কেহ কখনও সৃষ্টি করে নাই; মানুষ উহা আবিষ্কার করে, ভিতর হইতে উহাকে বাহির করে, উহা ভিতরেই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা ঐ সর্ষপ-বীজের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষুদ্র বীজে ছিল—ঐ মহাশক্তিরূপি উহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি, প্রখর বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হইয়া অবস্থান করে; তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, তাহা আছে। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু শক্তি রহিয়াছে, তাহা ঐ জীবাণুকোষেই কুণ্ডলীভূত হইয়া ছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদ্য লইয়া খাদ্যের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়! আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্তভাবে কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই; অতএব সিদ্ধান্ত এই—মানুষের আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে ধীরে ঐ অনন্তশক্তিমান্ দৈত্য যেন জাগরিত হইয়া নিজ নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার বন্ধনের পর বন্ধন খসিয়া যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আর এমন একদিন অবশ্য আসিবে, যখন এই অনন্তজ্ঞান অনুভূত হইবে, তখন জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্ হইয়া এই মানুষ দাঁড়াইয়া উঠিবে। এস, আমরা সকলে সেই অবস্থা আনয়ন করিবার জন্য সাহায্য করি।

১৭. কর্মজীবনে বেদান্ত (চতুর্থ প্রস্তাব)

[লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৮ই নভেম্বর, ১৮৯৬]

আমরা এ পর্যন্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অদ্য প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধ বিষয়ে বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক বৈদিক মত দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের একটি নির্দিষ্ট স-সীম আত্মা আছে, প্রত্যেক জীবে অবস্থিত এই বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল এই যে, প্রাচীন বৈদান্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধেরা এরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন। আমি সেদিন তোমাদিগকে বলিয়াছি, ইওরোপে দ্রব্য-গুণ সম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক তাহারই মতো। একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরূপী কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর এক মতে দ্রব্য স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, গুণগুলি নিজেরাই থাকিতে পারে। অবশ্য আত্মা সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন মত ‘আমি আমিই’ ‘আত্মার ঐক্য’-রূপ যুক্তির উপর স্থাপিত; – কল্যকার যে-আমি, আজও সেই আমি, আর অদ্যকার আমি আবার আগামী কল্যের আমি হইব, শরীরে যে-সকল পরিণাম হইয়াছে, সেগুলি সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্বদাই একরূপ। যাঁহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকার করিবার প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইতেন যে, আমরা কেবল এই পরিণামগুলিই জানি এবং এই পরিণামগুলি ব্যতীত আর কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি অপরিবর্তনীয় ও অপরিণামী দ্রব্য স্বীকার করা বাহুল্য-মাত্র, আর বাস্তবিক যদি এরূপ অপরিণামী বস্তু কিছু থাকে, আমরা কখনই উহাকে বুঝিতে পারিব না, আর কোনরূপে কখনও উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্তমানকালেও ইওরোপে ধর্মবাদী ও বিজ্ঞানবাদী এবং

আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের ১ ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে। একদলের বিশ্বাস, অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে—ইহাদের সর্বশেষ প্রতিনিধি হার্বার্ট স্পেন্সার। তিনি বলেন, আমরা যেমন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি কোমতের বর্তমান শিষ্যগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদিগণ। কয়েক বৎসর পূর্বে মিঃ ফ্রেডেরিক হ্যারিসন ও মিঃ হার্বার্ট স্পেন্সারের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল, তোমাদের মধ্য যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিল, তাহারা দেখিয়া থাকিবে ইহাতেও সেই পুরাতন সমস্যা বিদ্যমান; একদল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন অপরিণামী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, অপর দল এরূপ অনুমান করিবার আবশ্যকতাই অস্বীকার করিতেছেন। একদল বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সত্তার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না; অপর দল যুক্তি দেখান : এরূপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা কেবল পরিণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি; অপরিণামী সত্তাকে আমরা জানিতে, অনুভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

১ Religionist, idealist, realist agnosticism

ভারতে এই মহান্ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীন কালে পাওয়া যায় নাই, কারণ আমরা দেখিয়াছি গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ গুণভিন্ন পদার্থের সত্তা কখনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, ‘আত্মার ঐক্য’রূপ প্রমাণ—স্মৃতি হইতে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি—কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি; কারণ আমার উহা স্মরণ আছে, অতএব আমি বরাবর আছি—এই যুক্তিও কোন কাজের নহে। আর একটি যুক্তি, যাহা সচরাচর উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাঁচ। ‘আমি যাই’, ‘আমি খাই’, ‘আমি স্বপ্ন দেখি’, ‘আমি ঘুমাই’, ‘আমি চলি’—এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেন—করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, এ-সব বিভিন্ন পরিণাম বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে ‘আমি’টি নিত্যভাবে রহিয়াছে, এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, ‘আমি’ নিত্য ও নিজেই একটি ব্যক্তি আর ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব

উপাদেয় ও সুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপ্যাঁচের উপর স্থাপিত। এই ‘আমি’ এবং করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি কাগজে-কলমে পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না।

যখন আমি আহাৰ করি, খাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তখন আহাৰ-কার্যের সহিত আমার একাত্মভাব হইয়া যায়। যখন আমি দৌড়াইতে থাকি, তখন ‘আমি’ ও ‘দৌড়ানো’ দুইটি পৃথক্ ভাব থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। যদি স্মৃতিদ্বারা অস্তিত্বের অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হয়, তবে আমার যে-সকল অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছি, সেই-সকল অবস্থায় আমি ছিলাম না বলিতে হয়। আর আমরা জানি, অনেক বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীতের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। দেখা যায় অনেক উন্মাদরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি নিজেদের কাচনির্মিত অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবে। যদি স্মৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাচ অথবা পশুবিশেষ হইয়া গিয়াছে, বলিতে হইবে; কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন আমরা এই স্মৃতিবিষয়ক অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর অহংভাবের অভিন্নতা স্থাপন করিতে পারি না। তবে কি দাঁড়াইল? দাঁড়াইল এই যে, সীমাবদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য অহং-এর অভিন্নতা আমরা গুণসমূহ হইতে পৃথকভাবে স্থাপন করিতে পারি না। আমরা এমন কোন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি না, যাহার সহিত গুণগুলি লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয় যে, গুণসমূহের অতিরিক্ত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহাদের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা, আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই উভয় মতের সমন্বয় সাধিত হয়।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এই : আমরা বস্তুকে গুণ হইতে পৃথকরূপে চিন্তা করিতে পারি না, এ-কথা সত্য, এবং পরিণাম ও অপরিণাম-এ-দুইটিও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না। এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাহাকেই বস্তু বলা হইতেছে, তাহাই গুণস্বরূপ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণামরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই অপরিণামী সত্তা

পরিণামী জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। পারমার্থিক সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু নয়, সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যাবহারিক সত্তা হইয়াছে। অপরিণামী আত্মা আছেন, আর আমরা যেগুলিকে অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি বলিয়া থাকি, এমন কি এই শরীর পর্যন্ত সেই আত্মস্বরূপ, কিন্তু বাস্তবিক আমরা এক সময়ে দুই বস্তু অনুভব করি না, একটিই করিয়া থাকি।

যখন আমি নিজেকে শরীর বলিয়া চিন্তা করি, তখন আমি শরীরমাত্র; ‘আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু’ বলা বৃথা। আর যখন আমি নিজেকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায় উড়িয়া যায়, দেহানুভূতি আর থাকে না। দেহজ্ঞান দূর না হইলে কখন আত্মানুভূতি হয় না। গুণের অনুভূতি চলিয়া না গেলে কেহই বস্তু অনুভব করিতে পারে না।

এই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীদের প্রাচীন রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে, তখন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায়; আর যখন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়, তখন কেবল দড়িটিই অবশিষ্ট থাকে। বিশ্লেষণপ্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা ত্রিত্বের অনুভূতি হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর এগুলি পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐ-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ দুয়েরই একত্র অনুভব হইয়া থাকে; বাস্তবিক কিন্তু তাহা কখনও হয় না। হয় দেহ, নয় আত্মার অনুভব হইয়া থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজের মনে মনেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

তুমি নিজেকে দেহশূন্য আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে—ইহা প্রায় অসম্ভব, আর যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে ইহা সম্ভব তাঁহারা যখন নিজকিগকে আত্মা-রূপে অনুভব করেন, তখন তাঁহাদের দেহবোধ থাকে না। তোমরা হয়তো দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি সন্মোহন(hypnotism)-প্রভাবে অথবা মৃগীরোগ বা অন্য কোন কারণে সময়ে সময়ে একপ্রকার বিশেষ অবস্থা লাভ করে। তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারা যায়, তখন

তাহারা ভিতরে কিছু অনুভব করিতেছিল, এবং তাহাদের বাহ্যজ্ঞান একেবারেই ছিল না। ইহা হইতেই বোধ হইতেছে—অস্তিত্ব একটি, দুইটি নয়। সেই ‘এক’ নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, আর এ-সকলের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধে আছে। কার্যকারণ-সম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটি অপরটিতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্ধান হয়, সেই স্থানে কার্য অবশিষ্ট থাকে। যদি আত্মা দেহের কারণ হন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার অন্তর্ধান হয়, সেই স্থানে দেহ অবশিষ্ট থাকে, আর যখন শরীরের অন্তর্ধান হয় তখন আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। আত্মা ও শরীর—এই দুইটি পৃথক্, এই অনুমানের বিরুদ্ধে বৌদ্ধেরা তর্ক করিতে-ছিলেন। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই দ্বৈতভাব অস্বীকৃত হওয়ায় এবং দ্রব্য ও গুণ একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যা, অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টি-সম্বন্ধেই প্রমাণিত হইতে পারে, ব্যষ্টি-সম্বন্ধে নয়। পরিণাম-গতি, এই ভাবের সহিত ব্যষ্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই পরিণামী; অপর কোন সসীম পদার্থ বা অসীমের সহিত তুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্তু সমষ্টি অপরিণামী; সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নাই, যাহার সহিত তুলনা করিয়া সমষ্টির পরিণাম বা গতি চিন্তা করা যাইবে; পরিণাম কেবল অপর কোন অল্পপরিণামী বা একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

অতএব অদ্বৈতবাদ-মতে সর্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণ করা যাইতে পারে। ব্যষ্টি-সম্বন্ধেই গোলমাল। আমাদের প্রাচীন দ্বৈতবাতাত্মক মতগুলির কি হইবে, যে গুলি আমাদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? সসীম, ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত আত্মা সম্বন্ধে কি হইবে?—ইহাই প্রশ্ন।

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু সমস্যা এই—আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি-হিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। তাহার কি হইবে? আমরা দেখিয়াছি, আমরা অনন্ত আর উহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমরা এই-সকল ক্ষুদ্র আত্মাকেই ব্যক্তিরূপে গ্রহণ

করিয়া রাখিতে চাই। সেই-সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হইবে? প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব ক্রমবিকাশশীল; এক বটে, অথচ ঠিক এক নহে, কল্যকার ‘আমি’ অদ্যকার ‘আমি’ বটে, আবার না-ও বটে। একটু পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তনের ভিতরে অপরিবর্তনীয় কিছু আছে—এই দ্বৈতবাদী মত পরিত্যক্ত হইল, আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ গ্রহণ করা হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু উহারই ভিতরে একটি অভিন্ন-ভাব রহিয়াছে, যাহা সতত বিকাশশীল।

যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ মাংসল জীববিশেষের (mollusc) পরিণাম-মাত্র, তবে সেই জীব ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মাংসল জীব বহুপরিমাণে বিকশিত হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র জীব ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এখন মানুষরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে; তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে, যখন তিনি অনন্তে পৌঁছিবেন, কিন্তু সেই অবস্থানভের পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে।

পূর্ববর্তী মতবাদগুলির সমন্বয়-সাধন করাই অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম বিশেষত্ব। অনেক সময় ইহাতে এই দর্শনের অনেক উপকার হইয়াছিল, আবার কোথাও কোথাও ক্ষতিও হইয়াছে। বর্তমান কালে ক্রমবিকাশ-বাদীদের যে মত, আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ তাহা জানিতেন, তাঁহারা বুঝিতেন, দর্শন-চিন্তাও ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে। এই কারণেই পূর্ব পূর্ব দর্শন-প্রণালীর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। কোন ভাবই পরিত্যক্তি হয় নাই। বৌদ্ধদের একটি বিশেষ দোষ এই যে, তাঁহারা ক্রমোন্নতি বুঝিতেন না, সুতরাং আদর্শে পৌঁছিবার পূর্ববর্তী সোপান-গুলির সহিত নিজেদের মতের সামঞ্জস্য করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। বরং পূর্বমতগুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ধর্মজগতে এই প্রকার মনোভাব অত্যন্ত অনিষ্টকর। কোন ব্যক্তি একটি নূতন ও ভাল ভাব পাইল। তখন সে তাহার পুরাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিদ্ধান্ত করে—ঐগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক। সে কখন ভাবে না যে, তাহার বর্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলি যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, তাহার পক্ষে এক সময়ে ঐগুলি অত্যাৱশ্যক ছিল, তাহার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে ঐগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল, আর আমাদের প্রত্যেককে ঐভাবেই আত্মবিকাশ করিতে হইবে, প্রথমে স্থূলভাব গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে উপকৃত হইয়া উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এইজন্য প্রাচীনতম মতগুলির সহিত অদ্বৈতবাদের কোন বিরোধ নাই, এবং দ্বৈতবাদ ও যে-সব মত তাহার পূর্বে ছিল, সকলেরই উপর অদ্বৈতবাদীর প্রীতির ভাব—কোনরূপ অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতার ভাব নয়। অদ্বৈতবাদীর ধারণা সেগুলিও সত্য, একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ, আর অদ্বৈতবাদ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে, অন্যান্য মতবাদও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে।

অতএব মানুষকে যে-সকল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উঠিতে হয়, সেগুলিকে অভিশাপ না করিয়া আশীর্বাদসহ রক্ষা করিতে হইবে। এইজন্য বেদান্তে এই-সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। এইজন্যই দ্বৈতবাদসম্মত সসীম অথচ পূর্ণজীবাত্মার ধারণাও বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

দ্বৈতবাদ অনুসারে মৃত্যু হইলে মানুষ অন্যান্য লোকে গমন করে, এই-সকল ভাবও বেদান্তে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে যে, উহারা প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র।

যদি তুমি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখ তবে একটি দিক—একটি অংশই তোমার চোখে পড়ে, এবং জগৎ তোমার নিকট এইভাবেই প্রতীয়মান হইবে। দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ কেবল পদার্থ ও শক্তির সৃষ্টিরূপেই দৃষ্ট হইতে পারে; উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়ারূপেই চিন্তা করা যাইতে পারে, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথক্-রূপেই দেখা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মানুষ নিজেকে আত্মা ও দেহ এই দুয়ের

সমষ্টিরূপেই চিন্তা করে; এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এইজন্যই এই মতগুলি বেদান্তে সুরক্ষিত হইয়াছে এবং এইজন্যই দ্বৈতবাদীদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ মতগুলিও তোমাদের নিকট বলা প্রয়োজন।

এই মতানুসারে অবশ্য আমাদের একটি স্থূল শরীর আছে; এই স্থূলশরীরের পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরও ভৌতিক, তবে উহা খুব সূক্ষ্মভূতে নির্মিত। উহা আমাদের সমুদয় কর্মের আধারস্বরূপ। সমুদয় কর্মের সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীরে বর্তমান-সংস্কারগুলি সর্বদাই ফল প্রদান করিতে উন্মুখ হইয়া আছে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, আমরা যে-কোন কার্য করি, তাহাই কিছুকাল পরে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে-যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, এবং এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার বাহিরে প্রকাশিত হইয়া ফল প্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইরূপ। সে নিজের অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মানুষ আর কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয়, সে আপনার নিয়মে-আপনার জালে বদ্ধ। আমরা যে-সকল কর্ম করি, আমরা যে-সকল চিন্তা করি, সেগুলি আমাদের বন্ধনজালের সূত্রমাত্র। একবার কোন শক্তিকে চালাইয়া দিলে তাহার শেষ পরিণতি পর্যন্ত আমাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ইহাই কর্মবিধান। এই সূক্ষ্ম শরীরের পশ্চাতে সসীম জীবাত্মা রহিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকৃতি আছে কি-না, ইহা অণু, বৃহৎ বা মাধ্যম আকারের-এ-বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছে।

কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অণু, অপরের মতে ইহা মাধ্যম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা বিভূ। এই জীব সেই অনন্ত সত্তার এক অংশমাত্র, আর উহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে। উহা অনাদি, উহা সেই সর্বব্যাপী সত্তার এক অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। উহা অনন্ত। আর উহা নিজের প্রকৃত স্বরূপ, শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানা দেহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। যে-কার্যের দ্বারা এই প্রকাশ ব্যাহত হয়, তাহাকে অসৎ কার্য বলে; চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর যে-কার্য বা যে-চিন্তা দ্বারা তাহার স্বরূপ-প্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সৎকার্য বা সচ্চিন্তা বলে। কিন্তু ভারতের

অতি নিম্নতম দ্বৈতবাদী এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবাদী—সকলেরই মত এই যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিতরেই রহিয়াছে, অন্য কোথাও হইতে আসে না, আত্মাতে ঐ শক্তিপুঞ্জ অব্যক্তভাবে থাকে, আর আমাদের সমুদয় জীবনের কার্য কেবল ঐ অব্যক্ত শক্তিগুলিকে বিকশিত করা।

তাহারা পূর্নজন্মবাদও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবে, আবার সেই দেহনাশের পর আর এক দেহ, এইরূপই চলিবে। জীব এই পৃথিবীতেও জন্মাইতে পারে, অন্য লোকেও জন্মাইতে পারে। তবে এই পৃথিবীকেই সকলের আগে পছন্দ করা হয়—আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ স্থান। অন্যান্য লোকে দুঃখকষ্ট খুব সামান্য আছে বটে, কিন্তু সাধকেরা বলেন যে, ঐজন্যই সেই-সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগও অল্প। এই জগতে বেশ সামঞ্জস্য আছে, অনেক দুঃখও আছে, আবার কিছু সুখও আছে, সুতরাং জীবের এখানে কখন না কখন মোহনিদ্রা ভাঙিবার সম্ভাবনা, কখন না কখন তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেমন এই পৃথিবীতে খুব ধনী ব্যক্তিদের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগ অতি অল্প, সেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে যায়, সেখানে তাহারও আত্মোন্নতির সম্ভাবনা নাই। শুধু এখানে যে-সুখ, সেখানে তাহাই তীব্রতর; সূক্ষ্মদেহে কোন ব্যাধি থাকিবে না, ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকিবে না, সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। জীব সেখানে সুখের পর সুখ সম্ভোগ করে এবং নিজের স্বরূপ ও উচ্চভাব—সব ভুলিয়া যায়। তথাপি এই-সকল উচ্চতর লোকে কেহ আছেন, যাঁহারা এই-সকল ভোগসত্ত্বেও সেখান হইতে আরও উচ্চতর ভাবে আরোহণ করেন। একপ্রকার স্থূলদর্শী দ্বৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন, জীবাত্মাগণ সেই স্বর্গে চিরকাল ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সেখানে তাঁহারা দিব্যদেহ লাভ করিবেন—তাঁহাদের আর রোগ শোক মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ অশুভ থাকিবে না। তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে; এবং তাঁহারা চিরকাল সেখানে ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবেন, আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণ সকলেই স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন,—এই তাঁহাদের মত। পূর্বেই মুক্ত হইয়া

এই লোকগুরুগণ ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখার্ত মানবজাতির প্রতি অত্যন্ত কৃপাবশতঃ তাঁহারা এখানে আসিয়া পুনরায় দেহধারণ করিয়া মানুষকে স্বর্গের পথ-সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তাঁহারা অন্যান্য উচ্চতর-দেবতাদের লোকসমূহেও গমন করিয়া থাকেন।

অবশ্য অদ্বৈতবাদী বলেন, এই স্বর্গ কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। দেহশূন্যভাবেই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের লক্ষ্য বা আদর্শ কখন সসীম হইতে পারে না। অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই আমাদের চরম আদর্শ হইতে পারে না, কিন্তু দেহ তো কখন অনন্ত হয় না। ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ সীমাবদ্ধ ভাব হইতেই শরীরের উৎপত্তি। চিন্তাও অনন্ত হইতে পারে না, কারণ সসীম ভাব হইতেই চিন্তা আসিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী বলেন, আমাদের দেহ এবং চিন্তার বাহিরে যাইতে হইবে। আমরা আরও দেখিয়াছি অদ্বৈতবাদের মতে—মুক্তি লভ্য নয়, উহা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে। আমরা কেবল ভুলিয়া যাই ও উহা অস্বীকার করি। পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এই অমরত্ব ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে না, ঐগুলি পূর্ব হইতেই বর্তমান—ঐগুলি আমাদের বরাবরই রহিয়াছে।

যদি তুমি সাহস করিয়া বলিতে পারো—‘আমি মুক্ত’, এই মুহূর্তে তুমি মুক্তই হইবে। যদি তুমি বলো—‘আমি বদ্ধ,’ তবে তুমি বদ্ধই থাকিবে। যাহা হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্যান্যবাদীদের মত ইহার বিপরীত। তোমরা ইহার মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারো।

বেদান্তের এই আদর্শটি বুঝা বড় কঠিন, আর সাধারণ লোকে সর্বদা ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুশকিল এই যে, ইহার মধ্যে যে একটি মত অবলম্বন করে, সে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া সেই মতাবলম্বীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপযোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদি তুমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব—এই সসীম মানবত্ব রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা অনায়াসে রাখিতে পারো, তোমার সকল বাসনাই রাখিতে পারো এবং তাহাতেই

সম্ভুষ্ট হইয়া থাকিতে পারো। যদি মানুষভাবে থাকিবার সুখ তোমার নিকট এতই সুন্দর ও মধুর লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা উহা রাখিয়া দাও, কারণ তুমি জানো তুমিই তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা, কেহই তোমাকে বাধ্য করিয়া কিছু করাইতে পারে না; তোমার যতদিন ইচ্ছা ততদিন মানুষরূপে থাকিতে পারো, কেহই তোমাকে অন্য কিছু করিতে বাধ্য করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছা কর, দেবতাই হইবে—সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য। কিন্তু এমন অনেক মানুষ থাকিতে পারেন, যাঁহারা দেবতা হইতেও অনিচ্ছুক। তাঁহাদিগকে কি তোমার বলিবার অধিকার আছে যে, এ ভয়ানক কথা? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহাদের পৃথিবীতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এই ধরণের মানুষ পূর্বকালে অনেক ছিলেন, এবং এখনও আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শ অনুসারে বিচার করিতে যাও কেন? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বদ্ধ হইয়া আছ। ইহাই তোমার সর্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাকো না কেন? তুমি যেমনটি চাও তেমনটি পাইবে; কিন্তু তুমি ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সত্যকে দর্শন করিয়াছেন—তাঁহারা ঐ স্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর উহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না, তাঁহারা সকল সীমার বাহিরে যাইতে চান, জগতের কিছুই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ ও উহার সমুদয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে ডোবার মতো। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও কেন? এই ভাবটি একেবারে ছাড়িতে হইবে, প্রত্যেককে নিজের ভাবে চলিতে দাও।

কয়েক বৎসর পূর্বে ‘সচিত্র লণ্ডন সমাচারে’ (Illustrated London News) একটি সংবাদ পাঠ করি। কতকগুলি জাহাজ ১২ প্রশান্ত মহাসাগরে ‘সাউথ সী’ দীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। ঐ পত্রিকায় জাহাজ-গুলির একটি চিত্রও ছিল। একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সব গুলিই ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়। সেই জাহাজখানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। ছবিতে দেখাইতেছে—যে-জাহাজগুলি ডুবিয়া যাইতেছে, সেগুলির মজ্জমান আরোহিদল ডেকের উপর দাঁড়াইয়া ঐ জাহাজের লোকগুলিকে উৎসাহ দিতেছে। অপর লোককে টানিয়া নিজের স্তরে নামাইয়া আনিও না।

আর একপ্রকার নিবুদ্ধিতা আছে : যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরায়ণতা থাকিবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশাভরসা থাকিবে না। যাঁহারা উহা বলেন, তাঁহাদের যেন মনুষ্যজাতির জন্য সর্বদা প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। যদি প্রত্যেক দেশে মানুষের যথার্থ কল্যাণকামী অন্ততঃ দুই শত নরনারী থাকে, তবে পাঁচদিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। আমরা জানি, মনুষ্যজাতির জন্য আমাদের প্রাণ কিরূপ ছটফট করিতেছে। এ-সব অভিসন্ধি-প্রণোদিত লম্বা লম্বা কথামাত্র। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, এই ক্ষুদ্র ‘আমি’কে যাঁহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর নরনারী যত বেশী নিজেদের কথা ভাবিবে, তত কম পরের উপকার করিতে পারিবে। দুটির মধ্যে একটি নিঃস্বার্থপরতা, অপরটি স্বার্থপরতা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগসুখে আসক্ত থাকা এবং চিরকাল এইভাবে চলা এবং একই অবস্থার পুনরাবর্তন ঘোর স্বার্থপরতা। উহা সত্যানুরাগ হইতে উৎপন্ন নয়, অপরের প্রতি দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নয়—উহার কারণ ঘোর স্বার্থপরতা; অপর কাহারও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব—এই ভাব হইতে উহার উৎপত্তি। আমার তো এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবান্ পুরুষ আরও দেখিতে চাই—তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র পশুর উপকারে জন্য শত শত জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহাতো আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র।

১ প্রশান্ত মহাসাগরে সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ ক্যালিয়োপি (Calliope)ও আমেরিকার কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ।

আমি সেই গৌতম বুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবান্ লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ঐ বিষয়ে কখন কোন প্রশ্নই করেন নাই, যিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা

জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন কিসে অপরের কল্যাণ হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তা ছিল। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক বেশ বলিয়াছেন, তিনি ‘বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়’ জনুগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বনে গিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের মুক্তির জন্য নয়। জগৎ জুলিয়া গেল—বাঁচিবার পথ বাহির করিতেই হইবে। জগতে এত দুঃখ কেন?—তাঁহার সারাজীবন এই এক চিন্তা ছিল। তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মতো নীতিপরায়ণ?

* * * *

যীশুখ্রীষ্ট যে-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি খ্রীষ্টধর্মে ও বেদান্ত-ধর্মে অতি অল্পই প্রভেদ। খ্রীষ্টধর্মে বিকৃতভাব অতি অল্পই ছিল। যীশু অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, আবার সাধারণের উপযোগী এবং উচ্চতম আদর্শ ধারণা করিবার সোপানরূপে দ্বৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। ‘আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’ বলিয়া যিনি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই আবার প্রচার করিয়াছেন, ‘আমি ও আমার পিতা এক’; আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই এই বোধ আসিয়া থাকে যে ‘আমি ও আমার পিতা এক’ তখন ঐ ধর্মে ছিল কেবল প্রেম ও আশীর্বাদ, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ মত উহাতে প্রবিষ্ট হওয়ায় উহা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া অবনত হইল।

এই যে ক্ষুদ্র ‘আমি’র জন্য মারামারি, ‘আমি’র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এই জীবনে নয় মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র ‘আমি’—এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা ধর্মের বিকৃতভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে বলেন, ইহাই নিঃস্বার্থপরতা—ইহাই নীতির ভিত্তিস্বরূপ। ইহা যদি নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর দুর্নীতির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা নীতির ভিত্তি! আর যে-সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিকতর জ্ঞানের আশা করি, তাঁহারা ঐ কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যান এবং মনে করেন এই ক্ষুদ্র ‘আমি’র নাশ হইলে সব নীতি একেবারে ধ্বংস হইবে। এই সর্বপ্রকার শুভভাবের, সর্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র—‘আমি নয়, তুমি’ ।

কে ভাবিতে যায়—স্বর্গনরক আছে কি না? কে ভাবিতে যায়—আমার আত্মা আছে কি-না?
কে ভাবিতে যায়—কোন অপরিণামী অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে কি-না? কে ভাবিতে যায়—
এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের মতো এই সংসার-সমুদ্রে
ঝাঁপ দাও। দুঃখ লাঘব করিবার জন্য—হয় সংগ্রাম কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দাও।
আস্তিক হও বা নাস্তিক হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টান হও বা মুসলমান
হও, নিজেকে ভুলিয়া যাও—ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই
বুঝিতে পারে, ‘নাহং নাহং, তঁহু তঁহু’—অহংনাশ ও প্রকৃত ‘আমি’র বিকাশ।

দুইটি শক্তি সর্বদা সমান্তরালভাবে কার্য করিতেছে। একটি ‘অহং’, অপরটি ‘নাহং’।
শুধু মানুষের ভিতর নয়, জীবজন্তুর ভিতর এই দুইটি শক্তির বিকাশ দেখা যায়—এমন
কি, ক্ষুদ্রতম কীটাত্মক মধ্যও এই দুই শক্তির প্রকাশ। নরশোণিতপানে লোলজিহ্ব ব্যাঘ্রী
তাহার শাবককে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অতি অধঃপতিত ব্যক্তি, যে
অনায়াসে তাহার ভ্রাতৃ-সমান অন্যান্য মানুষকে হত্যা করিতে পারে, সেও অনাহারে মুমূর্ষু
স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যার জন্য সব করিতে প্রস্তুত। অথবা দেখা যায়; সৃষ্টির ভিতরে এই দুই
শক্তি পাশাপাশি কার্য করিতেছে—যেখানে একটি শক্তি দেখিবে, সেখানে অপরটিও
দেখিবে। একটি স্বার্থপরতা, অপরটি নিঃস্বার্থপরতা। একটি গ্রহণ, অপরটি ত্যাগ। ক্ষুদ্রতম
প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এই দুই শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহার কোন
প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

সমাজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, জগতের সমুদয় কার্য
ও বিকাশ ঐ দুই শক্তির অন্যতম—শুধু স্বার্থ-শক্তির উপর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রামের উপর
স্থাপিত? জগতের সমুদয় কার্য রাগ-দ্বेष, বিবাদ ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত, এ-কথা
বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে? এই-সকল প্রবৃত্তি যে আছে, তাহা অস্বীকার করি
না।

কিন্তু অপর শক্তিটির অস্তিত্ব ও ক্রিয়া অস্বীকার করিবার কি অধিকার তাঁহাদের আছে? আর তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম-এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র পরা শক্তি? অপর শক্তিটি এই প্রেমশক্তিরই বিপরীতভাবে প্রয়োগের ফল, এবং এই ভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎপত্তি। অশুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থপরতা হইতে- অশুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল কল্যাণশক্তির অপব্যবহার মাত্র। একব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহাও হয়তো নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহের প্রেরণায়-তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে বলিয়া। তাহার প্রেম অন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে প্রত্যাহূত হইয়া ঐ একটি শিশু-সন্তানের উপর পড়িয়া সসীম ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সীমাবদ্ধই হউক, অসীমই হউক, ভালবাসা সেই ভগবান, অন্য কিছুই নহে।

অতএব সমগ্র জগতের প্রেরণাশক্তি, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভুত ভাব-উহা যে-কোন আকারে ব্যক্তি হউক না কেন, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বই আর কিছুই নয়। বেদান্ত এইজন্যই অদ্বৈতভাবের উপর ঝোঁক দেন, দ্বৈতভাবের উপর নয়। আমরা এই ব্যাখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই কারণ, আমরা জানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহমিকা সত্ত্বেও আমাদের মানিতে হইবে, যেখানে একটি কারণ দ্বারা কতকগুলি কার্য ব্যাখ্যা করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্যগুলি ব্যাখ্যা করা যায়, তবে অনেকগুলি কারণ স্বীকার না করিয়া সেই একটি কারণই সত্য বলিয়া স্বীকার্য। এখানে যদি আমরা স্বীকার করি যে, সেই এক অপূর্ব সুন্দর প্রেমই সীমাবদ্ধ হইয়া অশুভ বা অসৎরূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমরা এক প্রেম শক্তি দ্বারাই সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলাম। নচেৎ আমাদের জগতের দুইটি কারণ মানিতে হয়-একটি শুভ শক্তি, অপরটি অশুভটি-একটি প্রেম শক্তি, অপরটি দ্বেষশক্তি। এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটি অধিক যুক্তিসঙ্গত? অবশ্য একটি কারণ মানিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

আমি এমন সব বিষয়ে গিয়া পড়িতেছি, যাহা সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদীদের অধিকার-বহির্ভূত। ভয় হইতেছে, দ্বৈতবাদের আলোচনা লইয়া আমি বোধ হয় বেশীক্ষণ কাটাইতে পারি না।

আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, উচ্চ-তম দার্শনিক ধারণার সহিত নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ পাশাপাশি যাইতে পারে। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাটো করিতে হয় না; বরং নীতির ভিত্তি-ভূমি লাভ করিতে হইলে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা-সম্পন্ন হইতে হইবে। মানুষের জ্ঞান মানুষের কল্যানের বিরোধী নয়। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদের রক্ষা করিয়া থাকে; জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জ্ঞানলাভ করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অশুভের কারণ—অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে-প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইয়া যায় এবং অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই আবার অপর প্রান্তে অসীম হইয়া ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়। আর বেদান্ত ইহাও বলেন, এই আপাত প্রতীয়মান সমুদয় অশুভের কারণ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে অতিপ্রাকৃত কোন সত্তার উপর দোষারোপ করিও না, নিরাশ বা বিষন্ন হইয়া পড়িও না, অথবা মনেকরিও না আমরা গর্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—অপর কেহ আসিয়া আমাদের সাহায্য না করিলে আমরা আর উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন, এ-ধারণা ঠিক নহে; আমরা গুটিপোকাকার মতো! নিজের শরীর হইতে জাল প্রস্তুত করিয়া কালক্রমে তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জন্য নয়। উহার মধ্যে প্রজাপতিতে পরিণত হইয়া আমরা বাহিরে আসিব, মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দিকে এই কর্মজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি আমরা যেন বদ্ধ, আর কখন কখন সাহায্যের জন্য চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের সকল দেবতার নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পারো। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছি; অবশেষ দেখিলাম, সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল, আর ভুলবশতঃ এতদিন যাহা করিতেছিলাম, তাহা নষ্ট করিতে হইল। ইহাই একমাত্র উপায়। নিজের চারিদিকে যে-জাল বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে, আর তাহা করিবার শক্তিও আমার ভিতরে রহিয়াছে। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের ভালমন্দ কোন ভাবই বৃথা যায় নাই—আমি সেই অতীত

শুভাশুভ উভয়বিধ কর্মেরই সমষ্টি-স্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি, কিন্তু ঐগুলির একটিও যদি বাদ পড়িত, তাহা হইলে আমি আজ যাহা হইয়াছি, তাহা হইতাম না। আমার জীবনে আমি বেশ সন্তুষ্ট। আমার এ-কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, তোমরা বাড়ি গিয়া নানাপ্রকার অন্যায় কাজ করিতে থাকো, আমার কথা এইরূপে ভুল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভুলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্যরূপ হইতে পারে না, কারণ মঙ্গল ও পবিত্রতা আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আর কোন উপায়েই সেই প্রকৃতির অন্যথা হয় না। আমাদের যথার্থ স্বরূপ সর্বদা একই-প্রকার।

আমাদের ইহা বুঝা আবশ্যিক যে, আমরা দুর্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্বল। আমি পাপ-শব্দ ব্যবহার না করিয়া ‘ভ্রম’-শব্দ ব্যবহার করাই পছন্দ করি। আমরাইগকে ভ্রমে বা অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমরা নিজেরাই। আমরা নিজ নিজ চোখে হাত দিয়া ‘অন্ধকার, অন্ধকার’ বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে আলোক আমাদের জন্য সর্বদাই রহিয়াছে, সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ আলোক। দেখিতে পাইতেছ না আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন? এই-সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি? বাসনা। কোন জীবজন্তু যেভাবে আছে, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিতে চায়—সে দেখে, তাহার পরিবেশ উপযোগী নহে, সুতরাং সে একটি নূতন শরীর গঠন করিয়া লয়। নিম্নতম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ—আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরও উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্। বলিতে পারো, ইচ্ছাই যদি সর্বশক্তিমান্, তবে অনেক কিছুই আমি করিতে পারি না কেন? যখন তুমি এ-কথা বলো, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র ‘আমি’র দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করতে পারো, ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন—চরিত্র ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, এ-গুলির দুর্বলতা নয়।

অতএব যদি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার প্রকৃতিই অসৎ, আর তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে, তাহাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা তোমাকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে ভাল হইবার পথ না দেখাইয়া বরং আরও মন্দ হইবার পথ দেখানো হইবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকার থাকে. আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া ‘হায়, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার!’ বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে? একটি দিয়াশলাই জ্বালিলে এক মুহূর্তেই ঘর আলোকিত হইবে। অতএব সারা জীবন ‘আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্যায় কাজ করিয়াছি’ বলিয়া অনুশোচনা করিলে কি তোমার উপকার হইবে? আমরা নানা দোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জ্বালো, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ কর, প্রকৃত ‘আমি’কে—সেই জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ ‘আমি’কে প্রকাশ কর; প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। আমি ইচ্ছা করি, সকলেই এমন অবস্থা লাভ করুক যে, অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলেও তাহার বাহিরের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অন্তর্যামী ভগবানকে দেখিতে পারে,, আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারে, ‘হে স্বপ্রকাশ, জ্যোতির্ময় ওঠ! হে সদাশুদ্ধ স্বরূপ, ওঠ! হে অজ, অবিনাশী, সর্বশক্তিমান, ওঠ! আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে-সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে না।’ অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার একমাত্র প্রার্থনা—নিজস্বরূপ-স্মরণ, সদা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের স্মরণ, তাঁহাকে সর্বদা অনন্ত সর্বশক্তিমান সদামঙ্গলময় বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর এই প্রার্থনা নিঃস্বার্থ বলিয়াই ভয়শূন্য ও শক্তিসম্পন্ন; কারণ স্বার্থ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের অন্য কোন কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? কোন্ বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে? মৃত্যু তাহাকে কী ভয় দেখাইতে পারে? অশুভ, বিপদ তাহাকে কী ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা অদ্বৈতবাদী হই, আমাদেরকে অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে যে, আমরা এই মুহূর্ত হইতেই মৃত। তখন আমাদের পুরাতন ব্যক্তিপরিচয় চলিয়া যায়, ও-গুলি কেবল

কুসংস্কারমাত্র; অবশিষ্ট থাকেন সেই নিত্যশুদ্ধ সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ-স্বরূপ এবং তখন সব ভয় চলিয়া যায়। সর্বব্যাপী ‘আমার’ অনিষ্ট কে করিতে পারে? এইরূপে আমার সমুদয় দুর্বলতা চলিয়া যায়, তখন অপর সকলের ভিতর এই ভাব জাগাইয়া তোলাই আমার কার্য হয়। আমি দেখিতেছি, সকলেই সেই আত্মস্বরূপ, কিন্তু সকলে তাহা জানে না। সুতরাং প্রত্যেককে ইহা শিখাইতে হইবে, সেই অনন্তশক্তির জাগরণে তাহাকে সহায়তা করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, জগতে এই ভাব প্রচার করাই বিশেষ প্রয়োজন। এই-সকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ অনেক পর্বত অপেক্ষা পুরাতন। সকল সত্যই সনাতন। সত্য কাহারও একার সম্পত্তি নয়। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই সত্যকে নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতে পারে না। সত্যই সকল আত্মার যথার্থ স্বরূপ। উহার উপর কে বিশেষ দাবি করিতে পারে? কিন্তু উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহা প্রচার করিতে হইবে, কারণ তোমরা দেখিবে—উচ্চতম সত্য অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে, যাহাতে ঐ ভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়, যাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনেরও অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা একই কালে উহা বুঝিতে পারে। এই-সকল ন্যায়ের কূটবিচার, দার্শনিক মতবাদ, এই-সকল দেবতাতত্ত্ব ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু এস আমরা একমনে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেকটি মানুষ উপাসক হইবে, আর প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যবস্তু উপাস্য হইবেন।